বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

সন্তোষ কুমার ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে

রাজা যায় বনবাসে

একটি জলের রেখা

সুখী রাজপুত্র

সমুদ্র মানুষ

ডাকবাংলো

বিদেশিনী

নীলতিমি

[illegible] ঈশ্বর

শেষ দৃশ্য

১

খরা, প্রচণ্ড খরা। কবে কোন বছরে একবার বৃষ্টি হয়েছিল এ অঞ্চলে, কবে কোন বছরে সবুজ শ্যামল মাঠ ছিল এ অঞ্চলে—মানুষেরা যেন সব তা ভুলে গেছে। গ্রাম মাঠ খা খা করছে। নদী-নালা সব হেজে মজে গেছে। শুকনো বাতাস আর মাঠে মাঠে শুধু ধুলো উড়ছে।

ফাল্গুন মাস, বৃষ্টি হচ্ছে না। মনে হয় কোন দিন আর বৃষ্টি হবে না, মাঠে শুধু ধুলো উড়ছিল। গরু-বাছুর নিয়ে দেশ ছেড়ে মানুষেরা সব চলে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষের মত ধান-চাল নেই, মাঠে শস্য নেই। দু'সাল হল দুর্ভিক্ষের মত চলেছে।

গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ সব জলবিহীন। নদী যেখানে গভীর ছিল সেখানে সামান্য মাটি খুঁড়ে গত সালেও জল পাওয়া যেত—এবার তাও নেই।

যা কিছু অবশিষ্ট মানুষ গ্রামে রয়েছে, নারী যুবক-যুবতী, ছেলে-বুড়ো সকলে মাটি খুঁড়ছিল নদীর ভিতর। ভিতর থেকে যদি সামান্য পরিমাণ জল পাওয়া যায়। সামান্য জল পেলে ওরা সংরক্ষণ করে রাখবে। অন্তত আগামী বর্ষা পর্যন্ত ওরা সেই জল নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটি সকলের আগে আগে কাজ করছিল। তার হাতে যেন গুপ্তধন আবিষ্কারের চাবিকাঠি। সে দাগ দিয়ে যাচ্ছিল লাঠি দিয়ে। বালির ওপর একটা করে গুপ্ত চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। আর প্রতিটি গুপ্ত চিহ্ন প্রায় ত্রিশ হাত থেকে চল্লিশ হাত দূরে, এঁকে-বেঁকে গেছে অনেকটা সাপের মত—কারণ কেউ জানে না নদী কোথায়

অন্তঃসলীলা। এ নদী যদি মরে যায়, মানুষরা তবে সব মরে যাবে। ওদের হাতে সামান্য শস্য--দু'সাল আগের সামান্য শস্য—সঞ্চিত শস্য এখন প্রায় নিঃশেষ, তবু এই জল পেলে তৃষ্ণার হাত থেকে বাঁচবে, জল পেলে পাতা ঘাস এবং অন্য যা কিছু আছে এ অঞ্চলে, পাহাড়ে, ছোট পাহাড় অঁঞ্চলে এখনও যেসব লতাগুল্ম রয়েছে, তার শিকড়-বাকড় আছে, বনআলু রয়েছে, জল পেলে যে কোনভাবে সিদ্ধ করা যাবে, খাওয়া যাবে, খেলে পরে এ বর্ষাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে।

এই মাটি, বাপ-পিতামহের মাটি। সোনার ফসল হত মাটিতে। সব ফসল হায় কোথায় এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বৃদ্ধ লোকটির হাতে লাঠি। সে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। নদীর দু'ধারে ছোট ছোট পাহাড়। ঝরনার জল আর নামছে না। গাছে গাছে কোন পাখির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই যেন মন্বন্তরের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে।

বৃদ্ধ হেঁটে যাচ্ছেন, মাটিতে ক্রস চিহ্ন এঁকে দিচ্ছেন। একজন করে মানুষ কেউ চিহ্নের ওপর বসে পড়ছে মাট খোঁড়ার জন্য। যেখানে জলের সন্ধান পাওয়া যাবে সেখানেই পরদিন জড় হবে সব অন্য মানুষেরা-- সারাদিন খেটে জল বের করবে। নিজেরা জল ভরে রাখবে ঘড়াতে। জলের জন্য ওরা প্রায় মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ মানুষটিকে মোজেসের মত মনে হচ্ছিল। লম্বা আলখেল্লার মত জামা গায়, পায়ে নাগরী জুতা, মাথায় ফেটি বাঁধা। উঁচু লম্বা মানুষ, চুল ছোট করে ছাঁটা, শক্ত চোয়াল মানুষটার। রোদে, জলে অথবা খরার সময়ে মুখে শক্ত সব রেখা—যেন দেখলেই মনে হয় মানুষটা আজ হোক কাল হোক এ অঞ্চলে জল নিয়ে আসবে।

গেরস্থের বৌরা, বিবিরা, যুবক যুবতীরা ছোট-বড় সকলে লম্বা লাইন দিয়ে এঁকে বেঁকে জলের জন্য মাটি খুঁড়তে বসে গেছে। বৃদ্ধ যেখানে পাহাড়ের ঢালু জায়গাটা ছিল, সেখানে উঠে দাঁড়ালে, পেছনে প্রায় দু-তিন মাইল পর্যন্ত শুধু নদীর বালি চোখে পড়ে—খরার জন্য, গ্রীষ্মের

জন্য বালি চিক্ চিক্ করছিল। নদীটাকে এখন মরা একটা সাপ মনে হয়। আবার মনে হয়—চিত হয়ে আছে অজগরটা। এক লম্বা অজগর—দু-তিন মাইল লম্বা, চার মাইল লম্বা, আরও কত লম্বা হবে কে জানে, দিগন্তের দিকে ছুটে গেছে—যেন নদীটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কারু জানা নেই।

পাহাড়ের পর পাহাড়, কোথাও সমতল মাঠ আবার পাহাড়, ছোট পাহাড়, কত রকমের লাল-নীল পাথর, পাহাড়ে কত রকমের গাছ-গাছালি, গুল্মলতা আর কত রকমের পাখি ছিল। সব পাখিরা উড়ে চলে গেছে। গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে। গাছগুলো মৃতের মত পাহাড়ময় দাঁড়িয়ে—সমতল ভূমিতে সব কুঁড়ে ঘর, খড়ের চাল। ঝোপে-জঙ্গলে শুধু শুকনো পাতার খস খস শব্দ। ঘাস আর নেই। মাটির নীচে ঘাসের শেকড় মরে যাচ্ছে। বৃদ্ধের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা।

ঠিক সামনেই বালুবেলাতে এই অঞ্চলের ছোট ছেলেটি বসে মাটি খুঁড়ছিল। বৃদ্ধ দেখল ছোট ছেলেটি সকলের শেষে মাটি খুঁড়তে বসেছে। ওর গায়ে লম্বা ঝুলের জামা। জামাটি ওর নয়, সুদিনে কি দুর্দিনে ওর বাবা হয়তো তৈরি করেছিল। পার্বণের দিনে ওর মা-বাপ একবার মেলায় গিয়েছিল এবং পরে, এই মাস দুই পরে হবে, ওলাওঠায় বাপ-মা দু'জনই গেছে। তখনও সামান্য জল ছিল পাতকুঁয়াতে, সামান্য জল তুলে রাখা যেত। এখন এই সামান্য বালক হাতে একটা খুরপি। পিঠের নীচে বাঁশের এক হাত লম্বা একটা চোঙ। ভিতরে কিছু যত্ন করে রেখে দিয়েছে মনে হয়। বালিমাটি খোঁড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই লম্বা চোঙ থেকে ম্যাজিকের মত ছোট একটা পাখি বের করে আনছিল এবং বোধ হয় শুকনো বটফল খাওয়াচ্ছিল। সে, এই বালক কাজে ফাঁকি দিচ্ছে দেখে পাহাড়ের ঢালু থেকে হেঁকে উঠল—হেই সুবল।

দূরে দূরে এই হাঁক ভেসে যাচ্ছিল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি হচ্ছিল।

সুবল তাড়াতাড়ি পাখিটাকে বাঁশের চোঙের ভেতর ভরে মুখটা সামান্য একটা ছোট্ট কাঠ দিয়ে ঢেকে দিল, তারপর আপন মনে এবং এক নাগাড়ে সে মাটি খুঁড়তে থাকল। দলের লোকেরা মাটি খুঁড়ছে। ওদের কোচড়ে শুকনো চানা ছিল। ক্ষুধার জন্য ওরা শুকনো চানা চিবিয়ে খাচ্ছিল। শুকনো চানা গালে এবং দাঁতের ফাঁকে সাদা অথবা হলুদ রঙের ফেনা তুলছে। দেখলেই বোঝা যায় ওরা জলের বিনিময়ে নিজের রক্ত চুষে তৃষ্ণা নিবারণ করছে। মানুষগুলোর মুখ, যুবতীর মুখ, বৌ-বিবিদের মুখ, মিঞা-মাতব্বরদের মুখ যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, বৃদ্ধের জন্য ওরা এখনও গ্রাম ছেড়ে পালায় নি, যেন একা বৃদ্ধ সকলকে আটকে রেখেছে। সকলকে বলছে—কোথাও না কোথাও নদীর অন্তঃস্তলে জল আছে, আমাদের এই জল অনুসন্ধান করে বের করতে হবে।

নদী অন্তঃসলীলা। বৃদ্ধ বড় একটা অর্জুন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভাবল, নদী অন্তঃসলীলা। নদী কোথাও না কোথাও এইসব লোকালয়ের জন্য জল সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছে। কি এমন পাপ ছিল, কি এমন জঘন্য অপরাধ ছিল মানুষের, যার জন্য হায়, ঈশ্বর বাধ সাধলেন। বৃদ্ধ ঈশ্বর বিশ্বাসী। ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি মানুষের দুঃখ অনন্তকাল ধরে সহ্য করেন না। তিনি নিশ্চয় সরল এবং গরীব এই মানুষগুলোর জন্য নদীর বালুগর্ভে জল সঞ্চয় করে রেখেছেন।

শুধু এখন প্রচেষ্টা। সমবেত প্রচেষ্টা। আজ প্রায় পনের দিন ধরে এই সমবেত প্রচেষ্টা—জলের জন্য সপ্তাহে যে মোষের গাড়ি তিনটি আসে, যারা জল আনতে বিশ ক্রোশ দূরে যায়—তাদেরও ক'দিন ধরে আর দেখা নেই। লোকগুলো জলের অভাবে মরে যাবে এবার।

শহর অনেক দূরে—শহরের দিকে যে গেছে সে আর ফেরে নি। ক্রমশ এক-দুই করে গ্রামের মানুষেরা সরে পড়ছে। বৃদ্ধের দু'চোখ জ্বালা এবং যন্ত্রণায় জ্বলছিল। মানুষগুলো বলে দিয়েছে আজই ওরা শেষ চেষ্টা করবে, জল না পেলে শহরের দিকে চলে যাবে। গ্রা

আর একজন মানুষও থাকবে না। মাঠ এবং নদী ভেঙ্গে ওরা সকলে শহরের দিকে চলে যাবে।

দুপুর পর্যন্ত জল পাওয়া গেল না। বালিয়াড়ি তেতে উঠেছে। উত্তপ্ত এই বালিয়াড়িতে মানুষগুলো বসে থাকতে পারছিল না। ওরা বালি খুঁড়ে খুঁড়ে আট-দশ-বারো হাত পর্যন্ত গর্ত করে ফেলেছে, ভিতরে ঠাণ্ডা ভাব, অথচ জলের কোন চিহ্ন নেই।

পাহাড়ের ওপারে রেল লাইন। দুপুরের গাড়ি চলে যাচ্ছে। পাহাড় এবং মাঠ অথবা দিগন্তের ওপারে ওই রেলের হুইসল ওদের বুকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যেন। ওরা এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল—এই ট্রেনে উঠলে অনেক দূরে এক শহর আছে, বড় শহর, বড় ইটের সব বাড়ি, আকাশ ছুঁয়ে আছে সেই সব উচু বাড়ি, কলকারখানা এবং নদীর ওপরে বড় জাহাজ, নদীতে কত জল, জলের জন্য বালি খুঁড়ে মরতে হয় না, সুতরাং সেই বড় শহরে চলে যাবার হাতছানি ওদের মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল।

বৃদ্ধ মানুষটি অর্জুনগাছের নীচে বসে দূরে, বহু দূরে যাদের এখান থেকে পিঁপড়ের মত মনে হচ্ছিল—লম্বা বালিয়াড়ি, দিগন্তে ভেসে গেছে এই নদী, সোজা, কোথাও সামান্য বেঁকে নদীর বালুবেলা সূর্যের উত্তাপে আগুনের মত ঝলসে যাচ্ছিল। মানুষগুলোকে কালো কালো কীট-পতঙ্গের মত মনে হচ্ছে। যেন একটা বড় পিঁপড়ের সারি নদীর মোহনা খোঁজার জন্য নদীর ঢালুতে নেমে যাচ্ছে। পাহাড় উঁচু বলে এবং এখানে সামান্য ছায়া রয়েছে বলে, ঝোপজঙ্গলের শেষ সুষমাটুকু নষ্ট হয় নি। বৃদ্ধ কোথায় এবং কোনদিকে গেলে বনআলু প্রচুর সংগ্রহ করা যেতে পারে—অর্থাৎ এই মানুষ যিনি আপ্রাণ তার মানুষের বেঁচে থাকার এলাদ সংগ্রহের জন্য ভেবে চলেছেন।

হা) কবে একবার এ-অঞ্চলে মহারানীর মত এক সম্রাজ্ঞী এসেছিল—অঞ্চল তিনি দেখে গেছেন। বড় বড় পরিকল্পনা হচ্ছে।

মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই—জল এ অঞ্চলে আজ হোক কাল হোক আসবে। মানুষগুলো সম্রাজ্ঞীর কথায় প্রাণের ভিতর জীবনধারণের আকুল ইচ্ছায় গ্রাম ছেড়ে পালায় নি। ওরা দিনের পর দিন জলের জন্য অপেক্ষা করছে। জল আসবে। এই গ্রীষ্মের খরা রোদ আজ হোক কাল হোক মরে যাবে। ওরা সকলে একবার আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাল, কোন দিগন্তে যদি সামান্য মেঘের আভাস চোখে পড়ে। কোথাও কোন মেঘের আভাস নেই। খালি আকাশ। নীল হরিদ্রাভ বর্ণ, যা শুধু মাঠের ওপর এবং ঘাসের ওপর আগুন ছড়াচ্ছে।

ঘাস নেই, শুকিয়ে কবে ধুলোবালির সঙ্গে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে অন্য কোন নদী অথবা মাঠের ছায়ার সঙ্গে যেন বাতাসে ভেসে চলে গেছে। মানুষগুলো এখন কোন মেষপালকের মত আজগুবি স্বপ্ন দেখছিল। কারণ দুপুরের রোদে, কবে একবার ওরা পেট পুরে তৃষ্ণার জল পান করছিল মনে নেই—মানুষগুলো সব ঝিমিয়ে পড়ছে। ওদের হাত অসাড় হয়ে পড়ছে। চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মাথা ঘুরছে। ওরা উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিল না। কারণ সারাদিন মাটি খুঁড়ে ওরা জলের সন্ধান পেল না। ওরা ক্লান্ত। এবং প্রায় হতচেতন। ওরা প্রায় কিছুই ভাবতে পারছিল না। ওরা বালি-য়াড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এবং এক আজগুবি স্বপ্ন সেই মেষ-পালকের মত। হাতে বড় এক শক্ত লাঠি মেষপালকের—আগুন, লাঠি তুললে আগুন। জল, লাঠি তুললে জল। অন্নবস্ত্র, লাঠি তুললে অন্নবস্ত্র। এমন এক মানুষ কি তাদের জন্য কোথাও অপেক্ষা করছে না! যে তাদের জন্য এই মাটিতে জল নিয়ে আসবে। অন্নবস্ত্র নিয়ে আসবে।

ঠিক তখনই অর্জুনগাছের নীচ থেকে বৃদ্ধ চিৎকার করে উঠল। বলল, তোমরা সকলে উঠে এস।

সেই শব্দ আবার পাহাড়ের সঙ্গে সমতল ভূমিতে এবং ঢালু

বালিয়াড়িতে প্রতিধ্বনি তুলে নেমে গেল। মানুষগুলো কোন স্বপ্ন-লব্ধ আদেশের মত সেই উঁচু পাহাড়ের দিকে যেতে থাকল।

সেই বালকটি তার পাখিটাকে চোঙের ভিতরে রেখে পিঠে ছোট্ট একটা হুক দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। তার সঙ্গে টিনের থালা-মগ ছিল একটা এবং সামান্য কাপড়জামা। কালো নোংরা পুঁটলিটা সে পিঠের বাঁ দিকে ঝুলিয়ে সকলের সঙ্গে উঠে যেতে লাগল পাহাড়ের দিকে।

বৃদ্ধ পাহাড়ের নীচে সামান্য এক সমতলভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে অনুসন্ধান করে এই স্থানটুকু আবিষ্কার করেছে। কিছু গুল্মলতা দেখে সে বুঝে নিয়েছিল এই মাটির নীচে রসাল এক রকমের শিকড় রয়েছে। সুতরাং খুঁড়ে খুঁড়ে এক পাহাড় রসাল শেকড় তুলে রেখেছে। তার শক্ত বাহু কাজ করার জন্য বড় বেশি পাথরের মত কঠিন মনে হচ্ছিল।

বৃদ্ধ সকলকে প্রায় সমানভাবে ভাগ করে দিল। এবং বলল, চুষে খাও। তোমাদের তেষ্টা নিবারণ হবে।

মানুষগুলোর কাছে এই বৃদ্ধ মোজেসের মত। এই দুর্দিনে এই একমাত্র মানুষ যে তাদের আশা দিয়ে বাঁচবার জন্য অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। তিনি কেবল বলছেন, জল হবে। এবার বর্ষায় জল হবে। জল হলে নদীর সব জল আমরা নেমে যেতে দেব না। বাঁধ দিয়ে আমরা জল আটকে রেখে দেব। সুদিনে দুর্দিনে জল আমাদের কাজে আসবে।

বৃদ্ধ আরও বলছিল, এই মাটি সোনার ফসল দেবে। এই মাটি ছেড়ে কোন শহরে চলে যাবি—ভিখারি বনে যাবি, এই মাটিতে জল হলে আমরা সকলে মিলে সোনার ফসল ফলাতে পারি। বৃদ্ধ এইটুকু বলে পিতামহের আমলের এক মন্বন্তরের গল্প শোনাল।

সুবল কান খাড়া করে রাখল। নানা রকমের বীভৎস দৃশ্য চোখের ওপর ভাসছিল সুবলের। বৃদ্ধ পুরাতন এক মন্বন্তরের গল্প শুনিয়ে

বলল, সংসারে এমন হয় মাঝে মাঝে। তাতে ভেঙ্গে পড়লে চলে না। মানুষ, গরু-বাছুর পথে-ঘাটে মরে পড়ে থাকে। ঘরের ভিতর মৃতের দুর্গন্ধ। মহামারী আসে। গ্রামের পর গ্রাম ক্রমশ খালি হয়ে যায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে ধুলোর ঝড় উঠেছে। ওরা দলবেঁধে হাঁটতে থাকল। ওরা জানতো, এই সামনের ঢালু বেয়ে নেমে গেলে বড় এক পাকা রাস্তা পাওয়া যাবে। তারপর দু'ক্রোশের মত হেঁটে গেলে রেল-লাইন, লাইনের ধারে লঙ্গরখানা খুলেছে সরকার, সেখানে পৌঁছুতে পারলে এক হাতা খিচুরি পাওয়া যাবে। এই সামান্য আহার সারা রাত্রির জন্য ওদের সামান্য শান্তি দেবে। তারপর ফের আগামীকাল নদীর ঢালুতে জলের সন্ধান চলবে। ক্রমশ এভাবে চলবে। কতদিন চলবে এভাবে ওদের জানা ছিল না। শুধু বৃদ্ধ আগে আগে হাঁটছে। হাতে লাঠি। সে মাঝে মাঝে হাতের লাঠি আকাশের দিকে তুলে দিচ্ছে, পথে-ঘাটে গরু-বাছুর মরে পড়ে ছিল, পচা দুর্গন্ধ। কোন গ্রামে ওরা মানুষের চিহ্ন দেখতে পেল না। কেবল দূরে ট্রেনের হুইসল শোনা যাচ্ছিল মাঝে মাঝে।

ওরা সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় রেল-লাইনের ধারে পৌঁছাল। গ্রামটাকে উৎসবের মত মনে হচ্ছিল। বড় বড় কড়াইয়ে খিচুরি রান্না হচ্ছে। দূর দূর গ্রাম থেকে সব মানুষেরা এসে বসে রয়েছে। বড় বড় অর্জুন গাছের নীচে খড়-বিচালি বিছিয়ে বৌ-বিবিরা শুয়ে আছে, খাবার হয়ে গেলে টিনের থালা এবং মগ নিয়ে সকলে লাইন দেবে। অবশ্য শিশুদের এবং বালক-বালিকাদের খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। ওরা খেলে খাবে বুড়ো-বুড়িরা, এবং বৌ-বিবিরা। তারপর যুবক এবং মরদ মানুষেরা।

উৎসবের মত এই গ্রাম। ব্যাজ পরা একদল মানুষ। বড় বড় তাঁবু খাটানো হচ্ছে। ডে-লাইট জ্বলছে, কোন পরিত্যক্ত ধনী গৃহস্থের

বাগানবাড়ি হবে এটা। প্রায় দশ-বারোটা উনুনে লোহার বড় বড় কড়াইয়ে খিচুরি ফুটছে। ত্রিপাল গোল করে মাটির গর্তে খিচুরি রাখা হচ্ছে। বড় বড় কাঠের হাতা নিয়ে বড় বড় বালতি নিয়ে ব্যাজ পরা মানুষগুলো ছুটোছুটি করছে। কিছু লোক কোথায় গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, একদল স্বেচ্ছাসেবক সেদিকে ছুটল। ওরা লুকিয়ে খাবার চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

বড় বড় মোষের গাড়িতে শহর থেকে জল এসেছে। বড় বড মাটির জালা জল ভর্তি ছিল, এখন সেই জল নিঃশেষ। কেউ খিচুরি খাবার পর এক ফোঁটা জল খেতে পারছে না। মানুষগুলোর মুখে বিরক্তির ছাপ এবং উত্তেজনা দেখা দিচ্ছে।

জল নেই, খাবার জল নেই। এই অঞ্চলে—পাঁচ-সাত ক্রোশ এমন কি দশ ক্রোশ হবে জল নেই—খাবার জল নেই, পাতকুঁয়াতে কোথায় সামান্য জল একজন গেরস্থ মানুষ লুকিয়ে রেখেছিল—সেখানে খণ্ডযুদ্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের। কারণ কে যেন বলছিল এই দুর্দিনে জল লুকিয়ে রাখতে নেই।

তখন তাঁবুতে তাঁবুতে সরকারের লোক সব ফিরে যাচ্ছিল। জলের কথা বললে ওরা না শুনি না শুনি করে পেতল-কাঁসা যা ছিল কিছু সামনে তা দিয়ে কান ঢেকে দিল। অর্থাৎ ওরা কিছু শুনতে চাইল না। উপরন্তু তাঁবু থেকে হ্যাট পরা মানুষটা বের হয়ে বলল, কাল থেকে লঙ্গরখানা বন্ধ। কতদিন বন্ধ থাকবে জানা নেই, গুদামখানায় চাল-ডালের মজুত শেষ। আবার কোথা থেকে গম আসছে, আসার যদি কথা থাকে তবে এখানে দু'চারদিন রুটি মিলতে পারে আবার নাও মিলতে পারে। সরকারের লোকটি নিজের দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে তাঁবুর ভিতর ঢুকে গেল।

মানুষগুলো, কত মানুষ হবে—প্রায় হাজার মানুষ, ছেলে-বৌ-বিবি নিয়ে হাজারের ওপর হতে পারে, বিশেষ করে সুবল, যার বাঁশের

ভেতর ময়না পাখির বাচ্চা, বাচ্চাটাকে সুবল একটা মরা গাছের নীচে কুড়িয়ে পেয়েছিল। কারণ পাখিরা পর্যন্ত ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে, জলের অভাবে, শস্যের অভাবে এখন আর কোন পাখি পর্যন্ত ডাকে না—সুবল সেই মরা গাছের ডালে একটা ভাঙা বাসা দেখেছিল। বোধ হয় পাখিটা বাসা থেকে পড়ে গেছে। পাখিটা জলের জন্য অথবা ক্ষুধায় দু' ঠোঁট ফাঁক করে দিচ্ছিল—সুবল পাখি নিয়ে ছুটে ছুটে ওর যে শেষ সামান্য সঞ্চিত জল ছোট কাঁচের শিশিতে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই জল থেকে প্রায় মধুর মত একটু একটু করে জল দিতেই পাখির বাচ্চাটা যেন প্রাণ ফিরে পেল। সুবল হাতে তালি বাজাল এবং এত বড় খরা চলেছে, মন্বন্তর এসে গেল দেশে—এই পাখি মিলে যাওয়ায় ওর ভয় যেন সব কেটে গেল। সেই সুবল যাকে দেখলে এখন ভিড়ের মধ্যে মনে হল বড় কাঙ্গাল, সরল সহজ—গোবেচারা সুবল পিঠে বাঁশের ভেতরে পাখি নিয়ে এগিয়ে গেল। বলল, আমরা খেতে না পেলে মরে যাব।

তাঁবুর ভিতরে বোধ হয় কি নিয়ে হাসি-মসকরা হচ্ছিল। ওরা খুব জোরে হাসছে। ওরা সুবলের কথা শুনতে পায় নি। সুতরাং সুবল পেছনের দিকে তাকাতেই দেখল সেই বৃদ্ধ লাঠি উঁচু করে রেখেছে। যেন এই লাঠিতে মোজেসের প্রাণ আছে। লাঠি এখন ওদের সব আশা পূরণ করবে। সে লাঠি তুলে ওপরে কি নির্দেশ করতেই সকলে বুঝে নিল, ওদের এবার এ স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। ওরা বৃদ্ধের কথামত পিছনে পিছনে চলতে থাকল। তাঁবুর চারিপাশে পুলিশ ছিল কিছু···ওদের হাতে বন্দুক ছিল, গ্রামের মানুষেরা হিংস্র, ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠছে অথচ এই বন্দুক দেখলে তাদের প্রাণ শুকিয়ে যায়—ওরা অর্থাৎ এই—এই মানুষেরা, যারা হা-অন্নের জন্য মাটি কামড়ে পড়ে থাকছে, তাদের নীরবে অন্ধকারে নেমে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকল না।

অন্ধকারে বৃদ্ধ বলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি সুবল ?

—জানি না কর্তা।

—আমরা কোথাও যাচ্ছি না। আমরা এই পাহাড়ের ওপর আগুন জ্বেলে দেব। সব পুড়িয়ে দেব। যখন মাটি এত নেমকহারাম ঈশ্বর এত বেইমান—যখন বৃষ্টি হচ্ছে না, যখন ঘাসমাটি পুড়ে গেল সব তখন আমরা আগুন জ্বেলে বাকি যা আছে সব পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাব শহরে।

কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন রুখে উঠল। বলল, আমরা জল খেতে চাই কর্তা। তুমি সারাদিন বালুর ভিতর পুরে রেখেছিলে জল দেবে বলে, কিন্তু জল কই ?

দলের ভিতর শিশুদের কান্না, জল খাব। ওদের সকলের ভয়ঙ্কর তেষ্টা। বৃদ্ধ নিজেও তেষ্টায় মরে যাচ্ছে। ভিতরে এক ভয়ঙ্কর হিংস্রতা কাজ করছে। ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধি পাল্টায়। মনে হয় এই মাটি সোনার ফসল দেবে, আবার মনে হয় জল বুঝি এখানে আর কোন দিন হবে না, মাটি আর সোনার ফসল দেবে না। সব শুকিয়ে যাবে তারপর একদিন এই অঞ্চল মরুভূমি গ্রাস করে নেবে।

তখন দূরে ট্রেনের হুইসল। বড় একটা ট্রেন বিদ্যুৎ বেগে ছুটে আসছে। কোথায় এক দিল্লী বলে শহর আছে, কোথায় এক কলকাতা বলে নগর আছে, সেখানে ট্রেনটা যাবে। দিল্লী থেকে কলকাতা। বৃদ্ধ এবার লাঠিটা শক্ত করে ধরে ফেলল। তারপর সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা এই লাইনের ওপর বসে যাও। শহর থেকে নগরে যাবার জন্য বড় ট্রেন আসছে। আজ আমরা ট্রেনটা থামিয়ে দেখব কি আছে, যদি ভিতরে জল থাকে, তবে আমরা জল নিয়ে চলে যাব। জলের জন্য অন্নের জন্য আমাদের এই দস্যুবৃত্তি। আমাদের কোন পাপ হবে না।

সুবলের ভয় ছিল, ট্রেনটা হুড়মুড় করে এসে ওপরে উঠে যেতে

পারে। সে ভয়ে ভয়ে বলল, কর্তা, আমরা যে তবে সব মরে যাব।

—মরে যাবে কেন?

—ট্রেনটা আমাদের ওপর দিয়ে চলে যাবে।

—আরে না, ট্রেন মানুষের ওপর দিয়ে যায় না। এতগুলো লোক দেখলেই ড্রাইভার ট্রেন থামিয়ে দেবে।

কর্তামানুষ এই বৃদ্ধ, এ অঞ্চলের পুরোহিত মানুষ, বিদ্যায় বুদ্ধিতে সকলের চেয়ে প্রবল সুতরাং সুবলের আর কোন ভয় থাকল না। সে তার পাখি পিঠে রেখে দিল, সে তার ঝোলাঝুলি, বগলের নীচে ঝুলিয়ে রাখল। সুবল অন্ধকারে টিপে টিপে দেখল ঝোলাঝুলিতে ওর সংগ্রহ করা পোকামাকড়গুলো রয়েছে কিনা। কারণ সে খুব ভোরে উঠে পোকামাকড় সংগ্রহ করে রেখেছে পাখিটার জন্য। খুব ভোরে উঠে সে পাখিটাকে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা করেছে। কারণ তখন প্রবল খরা থাকে না, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব থাকে, এবং খুব ভোরেই পাখিটা যেন সামান্য সতেজ থাকে। তারপর সূর্য ওঠার সঙ্গে পাখিটা গরমে ছটফট করতে থাকে। সুবলের মনে হয় তখন সে পাখিটাকে আর বুঝি বাঁচাতে পারবে না। সে যখনই সামান্য অবসর পায় পাখিটাকে বাঁশের চোঙ থেকে তুলে এনে হাতের ওপর বসিয়ে রাখে। এবং নিজে সূর্যের দিকে পিঠ রেখে পাখিটাকে ছায়া দেয়। যদি ফুরফুরে হাওয়া থাকে তবে পাখিটাকে হাওয়া লাগাবার জন্য হাতের কব্জিতে বসিয়ে সে আপন মনে শিষ দিতে থাকে এবং গ্রাম্য কোন সঙ্গীত অথবা লোকগাথা সে কবিতার মত উচ্চারণ করতে করতে এই প্রবল খরা, মন্বন্তর আসছে, দুর্ভিক্ষ সারা দেশে, আবার ওলাওঠা মহামারীর আকারে দেখা দিচ্ছে, সুবল পাখিটাকে রক্ষা করার জন্য সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে এখন সে অন্য কোথাও পালাতে পারলে বাঁচে।

ভয়ঙ্কর অন্ধকার। এতগুলো মানুষ নিঃশব্দে হাঁটছে। শুকনো পাতার শুধু খস খস শব্দ উঠছিল। ওরা প্রায় সকলেই বনবেরালের মত চুপি চুপি রেল-লাইনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিশুদের কান্না মাঝে মাঝে বড় ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছিল।

শাল গাছের জঙ্গল সামনে। জঙ্গল পার হলে রেল-লাইন। শাল গাছগুলো প্রায় মৃতের মত দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে গাছের ডাল-পালাগুলোকে খুব ভূতুড়ে মনে হচ্ছিল। কোথাও কোন আলো জ্বলছে না। কোন গ্রাম থেকে একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। মাঝে মাঝে শেয়ালের চিৎকার রাতের অন্ধকারকে তীক্ষ্ণ খোঁচা মারছিল—কারণ দূরে অথবা আশে-পাশে শেয়ালের চিৎকার—আর এক ঝিল্লির ডাক, মনে হয় এই সংসারে জীবনধারণের উপযোগী আর কিছু থাকল না, কোন আলো অথবা হাওয়া, সর্বত্র ভয়াবহ মৃতের গন্ধ শুধু।

বৃদ্ধ পুরোহিত রেল-লাইনে ওঠার আগে বললেন, বিবি-বৌদের এবং শিশুদের আলাদা রেখে দাও। ওরা বড় কড়ুই গাছের নীচে বসে থাকুক।

বৃদ্ধ এবার যুবকদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমরা হাতে সামান্য কাপড় নাও। ট্রেনের আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাত ওপরে তুলে গাড়ি থামাবার নির্দেশ দেবে। বৃদ্ধ পুরোহিত এইসব বলে রেলের লাইনে কি নুয়ে যেন দেখল। তারপর সে সকলের আগে হাতে সেই লাঠি, পুরোহিত নিজের হাতে লাঠি নিয়ে সামান্য সময় স্থির হয়ে দাঁড়াল। অপলক সে যেন কিছু দেখছে,—অন্ধকার, না এই জগৎ-সংসার, না পূর্বস্মৃতি তার কাজ করছিল। কি ছিল এই অঞ্চলে। বড় মাঠে সোনার ফসল ছিল, বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, গোয়ালে বড় বড় গরু, মোষ ছিল, শীতের সময়ে রামায়ণ-গান ছিল, আর গ্রীষ্মকালে ঢোলের বাজনা ছিল, রামাহই রামাহই গান ছিল। এখন

সব নিঃশেষ। কেবল ভয়, যা কিছু সামান্য মানুষ আছে তারাও চলে যাবে সব বাড়ি ছেড়ে। ভয়, মহামারী, মন্বন্তর এসে গেল। সামান্য খয়রাতি সাহায্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে আর কি থাকল মানুষগুলোর, কি জন্য আর অপেক্ষা করা। এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে মানুষগুলো বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বৃদ্ধ পুরোহিত অন্ধকারের ভিতর কোন আলোর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না।

ট্রেনটা বোধ হয় তখন নদী পার হচ্ছিল, কোন বড় সেতু পাব হচ্ছিল, অথবা বাঁকের মুখে কোন পাহাড়ের ভিতর ট্রেনটা ঢুকে যাচ্ছে—সুতরাং গম গম, খুব দূর থেকে গম গম শব্দ, মনে হয় খুব দূর থেকে ভেসে আসছে শব্দ, যেন হাওয়ায় ভর করে শব্দটা কানেব পাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তারপর সেই আলো, ট্রেনের আলো, দূর থেকে ওরা ট্রেনেব আলো দেখতে পেল। ট্রেনটা যত দ্রুত এগিয়ে আসছে তত ওদের বুক ভয়ে দুরু দুরু করছিল। তত ওরা মরিয়া হয়ে উঠছে। যেন ওরা কোন দীর্ঘ মরুভূমি পার হবে এখন—সুতরাং সকলের মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই, সকলের রক্তে এক অমানুষিক উত্তাপ সঞ্চিত হচ্ছে।

হাড়গোড় বের করা মানুষগুলোর দিকে এখন আর তাকানো যাচ্ছে না। লাইনের ওপর যেন শত শত কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষদের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, স্নান না করার জন্য চুল শনের মত হয়ে গেছে, গায়ে খড়ি ওঠা, পেটের ভিতর যন্ত্রণা, ক্ষুধার যন্ত্রণা। সামান্য লঙ্গরখানার দান এই সামান্য পথটুকু অতিক্রম করতেই হজম হয়ে গেছে।

ওরা সকলে আলোটা দেখে ভয় পাচ্ছে। ওরা এই ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। ওরা অন্ধকারে পরস্পর মুখের দিকে তাকাল। বৃদ্ধ পুরোহিত পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন। দৈত্যের মত ঝড়ের বেগে ট্রেনটা ছুটে আসছে, পাহাড়ের

ওপর পড়লে রক্ষা থাকছে না। সব মানুষগুলোর রক্তে এই লাইন ভেসে যাবে, শকুনের আর্তনাদ শোনা যাবে দূরে—বৃদ্ধ ভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন ডেকে উঠল, জল চাই, আমরা জল চাই।

সঙ্গে সঙ্গে সুবল ওর পাখিটাকে বুকের কাছে এনে বলল, হ্যাঁ, আমরা জল চাই, জল চাই।

যুবক-যুবতীরা বলল, জল চাই, জল চাই।

কড়ুই গাছের নীচ থেকে বৌ-বিবিরা চিৎকার করে উঠল, জল চাই, জল চাই।

ভূতের ভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেন ওই মানুষগুলো জল চাই, জল চাই বলে হরি নামের মত মন্ত্র উচ্চারণ করছে। এই উচ্চারণ কেবল দীর্ঘ মাঠে শব বহনকারী মানুষের কান্নার মত শোনাচ্ছে। বড় মাঠ সামনে, লাইনের পাশে বড় পাহাড়, শাল গাছের মাথায় ভাঙ্গা চাঁদের আবছা অন্ধকার, এতগুলো মানুষের ভয়াবহ কণ্ঠ চারপাশের পরিবেশকে খুব বিষণ্ণ করে তুলছে।

ট্রেনটা হুইসল দিচ্ছে, ড্রাইভার টের পেয়ে গেছে বুঝি। আবছা আবছা কি যেন দেখা যাচ্ছে লাইনের ওপর। প্রথম কুয়াশার মত মনে হচ্ছে, তারপর মনে হচ্ছে মরীচিকার মত হাজার সরল রেখা পুতুল নাচের দড়িতে ঝুলছে।

ড্রাইভার চোখ মুছে নিল। এই অঞ্চলে ভয়ঙ্কর খরা চলছে, এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল বৃষ্টিপাত নেই এবং এই অঞ্চলে মহামারী আরম্ভ হয়ে গেছে—ড্রাইভার চোখ মুছে ভাল করে দেখে নিল। কিছুদিন আগে ড্রাইভার দেখেছে দূরের মাঠে সব মৃত গরু-বাছুর-মোষ, হাজার হবে প্রায়, লাইনের ধারে ধারে মরে আছে। মাঝে মাঝে সে মৃত মানুষের মুখও দেখেছে। লোকালয়ে আর কোন লোক নেই, সকলে শহরে গঞ্জে চা-বাগানে এবং দূরদেশে চলে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর দুর্দিন মানুষের।

আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা বাঁক নিলে ড্রাইভার টের পেল, শত শত কঙ্কাল যেন লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ভূতের মত নৃত্য করছে। সে এবার প্রাণপণে রড চেপে ধরল, প্রাণপণে সে হুইসল বাজাতে থাকল। এরা সব মানুষের কঙ্কাল, চোখ-মুখ কোটরাগত, লাইন থেকে একটা প্রাণী সরছে না এবং ড্রাইভার ভূতের ভয়ে প্রথম ভাবল যদি ওরা যথার্থই মানুষের অভুক্ত আত্মা হয় তবে আর ট্রেন থামিয়ে কি হবে, বরং সে জোরে বের হয়ে যাবে, ট্রেন থামালে মৃত আত্মারা ওর ট্রেনটাকে এই নির্জন মাঠে আটকে দিতে পারে। সুতরাং ফের চাকা ঘুরিয়ে দিতে গেলে—ফায়ারম্যান শক্ত হাতে বাধা দিল, বলল, না। ওগুলো ভূত নয় দাদা। ওগুলো মানুষ। সে ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ট্রেনটা থামিয়ে দিল।

মানুষগুলো কোলাহল করতে থাকল, জল চাই, জল চাই। মানুষগুলো কামরায় কামরায় উঠে গেল। বলল, জল চাই, জল চাই।

ভিতরের যাত্রীরা ভয় পেয়ে গেছে। সব কঙ্কালের মত মানুষের চেহারা, ক্ষুধার্ত, চোখ কোটরাগত, হাত-পা শীর্ণ, ক্লান্ত এবং অবসন্ন এই সব মানুষের শরীরে জীর্ণ-বাস, ময়লার জন্য দুর্গন্ধ, ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ, যাত্রীরা সকলে নাকে কাপড় দিচ্ছে। ভয়ে ওরা কথা বলতে পারছে না। যেন শয়তানের প্রতীক এইসব মানুষেরা। যাত্রীদের সুন্দর সুদৃশ্য কামরার প্রাচুর্য ওদের পৈশাচিক করে তুলছে। ওরা প্রেতের মত ভিতরে ঢুকে দু' হাত ওপরে তুলে জলের জন্য, জল চাই, জল চাই, বলে নাম কীর্তনের মত নাচতে থাকল।

যাত্রীদের মনে হল, ক্ষুধার্ত সব রাক্ষস অথবা ডাইনীর মত মানুষগুলো আকাশে বাতাসে দুঃখের খবর পাঠাচ্ছে, ওরা ভিতরে ঢুকে সব তছনছ করে দিচ্ছিল। জল কোথায়, জলের জন্য ওরা ওদের মগ থালা এবং চামড়ার ব্যাগ খুলে রেখেছে, অথচ জল কোথায়, বৃদ্ধ

পুরোহিত শুধু জানতেন জল কোথায়, তিনি সকলকে দু' হাত তুলে শান্ত থাকতে বলেছেন, সামান্য জলটুকু সকলকে সমান ভাগ করে দিতে হবে। তিনি প্রতি কামরায় একজন করে যুবককে জলের কল দেখিয়ে দিলেন, কি করে খুলতে হবে বন্ধ করতে হবে দেখিয়ে দিলেন, প্রত্যেককে লাইন দিয়ে যেমন মানুষগুলো সরকারের লঙ্গরখানাতে লাইন দিয়ে খাদ্যবস্তু থালায় নিত তেমন লাইন দিয়ে সামান্য জলটুকু সকলকে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে বললেন।

সুবলের কামরায় খুব অল্প মানুষ। সুখী মানুষ, তাঁর স্ত্রী এবং রুগ্ন এক বালিকা নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে। এতবড় কামরা—রিজার্ভ প্রথম শ্রেণীর কামরা, মাত্র তিনজন মানুষ। রুগ্ন বালিকা মোমের মত সাদা। সাদা চাদরে শরীর ঢেকে রেখেছে। মাথায় আলো জ্বলছিল। খুব অনুজ্জ্বল আলো। ওরা সকলে ভয়ে কেমন চোখ-মুখ সাদা করে রেখেছে। বালিকাটি পর্যন্ত মুখ নাক দেখে আঁৎকে উঠেছে। সুবলের পিছনে বড় বড় সব মানুষ। মানুষ বলে চেনা যায় না। যেন বড় এক রাজপুরী। সুন্দর সব বাদামী রঙের গাছ। গাছে হীরে-পান্নার ফুল। নীচে রাজকন্যা আঙুর খেতে খেতে কোন রাজপুত্রের জন্য অন্যমনস্ক। অথবা এও হতে পারে রাজকন্যার জানা ছিল না, রাজ্যের কোথাও দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। জানা ছিল না, রাজ্যের রাজা বনের হরিণ অনুসন্ধানে মত্ত। রাজা, রাজ্যের খবর রাখছে না। হাজার হাজার গ্রামে মড়ক লেগেছে। অনাবৃষ্টির জন্য ফসল ফলছে না। অল্প বৃষ্টির জন্য মাটি ক্রমশ মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। হায়, তখনও রাজা মনোরম রাজপ্রাসাদে নূতন অরণ্যের সৃষ্টি করছে। কারণ ওর প্রিয় হরিণটি এই বনের ভিতর হারিয়ে যাবে। সে সেই হরিণের জন্য শুধু ব্যস্ত থাকবে। রাজকার্যের জন্য বনের হরিণটি ওর বড় প্রিয়। মরীচিকার পেছনে ছোটার মত রাজা শুধু ছুটছেন। তখন রাজকন্যা দেখতে পেল হাজার

হাজার কঙ্কালপ্রায় মানুষ তাকে ঘিরে ফেলেছে, হাউ মাউ কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ—এই সব কথা বলছে।

সুবল হাতের ইশারা করলে সকলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুখী মানুষটি প্রথম খুব চেঁচামেচি করছিল, পুলিশের ভয় দেখাচ্ছিল, কিন্তু এত বড় নির্জন মাঠ, এক দিকে দীর্ঘ পাহাড়, অন্যদিকে এক মরা নদী, নদীতে মানুষগুলো জলের জন্য দিন নেই, রাত নেই মাটি খুঁড়ে চলেছিল, অথচ জল নেই, জল নেই, হাহাকার জলের জন্য। সুতরাং সামান্য পুলিশের ভয় সুবল অথবা এইসব কঙ্কালপ্রায় মানুষদের এতটুকু বিচলিত করতে পারল না।

বরং মানুষগুলো, সুদৃশ্য এই কামরা, আসবাবপত্র দেখে কৌতুক বোধ করতে থাকল। ওরা সুবলকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছে। অথবা সুবলকে অনুনয়ে বলছে, ওরা এই কামরার ক্ষতি করবে না। শুধু ঢুকে দেখবে, মোটা গদী, এবং আলোর কাছে হাত রেখে দেখবে —কেমন ভিতরে অনুভূতি জন্মায়। সুবল ওদের এক এক করে জল খেতে দিচ্ছে, আর এক এক জন কামরার ভিতর ঢুকে দেওয়ালে হাত রাখল, অথবা একটু আরাম করে গদিতে বসে শুয়ে কেমন লাগে দেখতে থাকল। বা বেশ তো, ওদের কেউ কেউ যেন চোখ বুজে আরামটুকু অনুভব করছে। বাংকের ওপর বসে, হাঁটু মুড়ে বসে শুধু চারিদিকের দৃশ্য,—জানালা দিয়ে শুধু অন্ধকার মাঠ, পেছনের করিডোরে মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে, কোলাহল করছে। গার্ডের লালবাতি, যেন মাঠ, মরা নদী অথবা শুকনো পাহাড়ের উদ্দেশ্যে লাল বাতি জ্বেলে গার্ড বসে আছে।

কামরায় ভিতর সুখী মানুষ, তাঁর স্ত্রী এবং রুগ্ন বালিকা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, ওরা ভয়ে কামরার এক পাশে, যেন ভয়ঙ্কর কোন দুর্ঘটনার অপেক্ষায় আছে ওরা।

ড্রাইভার নিচে নেমে দেখল, পিপীলিকার মত মানুষগুলো কামরায় কামরায়, ছাদের ওপরে উঠে হৈ-হুল্লড় করছে। শিশুদের মত চিৎকার, যেন এই ট্রেন ওদের কাছে খেলনার মত অথবা যুদ্ধে প্রতিপক্ষের পরিত্যক্ত কামান, কামানের গোলাগুলি শেষ, গ্রামের দুষ্ট বালকবালিকারা কামানটা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার যাত্রীদের পার হয়ে গার্ডের ঘরে গিয়ে দেখছে, ভয়ে গার্ড সাহেব লালবাতি জ্বেলে বসে রয়েছে।

এবার ড্রাইভার মরিয়া হয়ে বলল, এবার নীলবাতি জ্বালুন, ট্রেন ছেড়ে দিই, একটা মানুষও লাইনের ওপর আর নেই। শালা সকলকে নিয়ে এবার স্টেশনে নিয়ে ফেলি।

ড্রাইভারের চিৎকারে গার্ডসাহেব ভয়ে তিরিঙ তিরিঙ করতে থাকল। ঘুরে ফিরে কেমন মাতালের মত কিছুক্ষণ নেচে বেড়াল। ড্রাইভার বুঝল গার্ডসাহেব ভয়ে ভিরমি খেয়েছে। সে বলল, গার্ড-সাহেব, বেশি দেরি করলে বয়লার থেকে জল ঢেলে নেবে। ট্রেন তবে আর চলবে না।

গার্ডসাহেব কি যেন ভাবলেন।—এদের এত তেষ্টা?

—তেষ্টা, কি যে জল খাচ্ছে! কেবল জল খাচ্ছে।

—কেবল জল খাচ্ছে?

—কেবল জল খাচ্ছে। জল খাচ্ছে। জল খাচ্ছে। কেবল জল খাচ্ছে।

—অন্য কিছু না?

—না, কিছু না। কোন দিকে আর ভ্রূক্ষেপ নেই। বড় সজ্জন।

—তবে এবার শালা সজ্জনদের চল শহরে নিয়ে তুলি। বলে তিনি বসে টুক করে লাল বাতিটাকে নীল করে দিলেন।

ড্রাইভার নামার সময় বলে এল, আপনি সাব হুইসল বাজাবেন না। আমি সেকেণ্ডে এমন গতি বাড়িয়ে দেব না, শালা একটাকেও নামতে

দেব না। বলে ড্রাইভার অন্ধকারের ভিতর নিচু হয়ে হাঁটতে থাকল। এবং দেখল ট্রেনের নীচে আবার কেউ বসে রয়েছে কিনা। সে কোন মানুষ দেখতে পেল না। কেবল মনে হল নীচে ঠিক বড় একটা গাছের অন্ধকারে একজন আলখেল্লা পরা মানুষ দাঁড়িয়ে দুঃখী লোকদের যেন জলপান দেখছে।

ড্রাইভার বলল, শালা, তুমি লিডার আছে। তোমাকে ফেলে দেখ শালা, কেমন সব ফাঁক করে দিই! তুমি শালা এখানে পড়ে পড়ে এবার ঘাস খাও। মুরগী খাও। মুরগীর নাম মনে হতেই ড্রাইভারের জিভে জল এসে গেল।

ওদের এত জলতেষ্টা যে, কোথায় ড্রাইভার, কোথায় ফায়ারম্যান দেখবার ফুরসত নেই। আর এতগুলো মানুষ একসঙ্গে ট্রেনে উঠে পড়বে সেও, কেউ ভাবে নি।

বৃদ্ধ পুরোহিত ওদের জল খেতে দেখে, ওদের হৈ চৈ দেখে খুব খুশি। দীর্ঘদিন পর জল পান, তৃষ্ণার জল কতদিন পর পান করা গেল! তিনি নিজেও জল এনে গাছের নীচে পান করছেন। মনে হচ্ছিল পেটে আর জায়গা নেই, তবু মনে হচ্ছিল জলের অপর এক নাম জীবন, এই জল এবং জীবনকে চেটে চেটে খাবার জন্য তিনি কিছুক্ষণ পর পরই গলায় জল ঢেলে দিচ্ছেন, এবং জল খাবার সময় যেন অন্ধকারে টের পেলেন, ট্রেনটা নড়ছে, ট্রেনটা সহসা এত গতি বাড়িয়ে দিল যে, তিনি অনুমানই করতে পারলেন না কি করে চোখের পলকে এতগুলো লোক নিয়ে ট্রেনটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিনি চিৎকার করতে করতে ট্রেনটার পিছনে ছুট দিলেন। তিনি অন্ধকারেও দেখতে পেলেন সেইসব দুঃখী মানুষদের হাত—ওরা যেন বলছিল, দেখ দেখ, কেমন বেইমান এই ট্রেন, আমাদের নিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি শুধু চিৎকার করছিলেন, তোরা সব নেমে পড়। তোদের নিয়ে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে, তোরা লাফিয়ে পড।

কিন্তু সুবল ট্রেনের ভেতর জানালাতে সামান্য সময়ের জন্য উঁকি দিয়েছিল। অন্ধকারে গাছপালা আবছা আবছা, সে কোন মানুষকে কোন বড় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নি। সে ভেবেছিল হয়তো দু-একজন পড়ে থাকল—আর সকলকে নিয়েই ট্রেনটা মোটামুটি শহরে পৌঁছে যাবে। কারণ এই মন্বন্তর মানুষের আত্মবিশ্বাস হরণ করে নিয়েছে। ট্রেন ছেড়ে দিলে কেউ লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেনি। সকলে যেন মোটামুটি ভিতরে ভিতরে খুশি।

ট্রেনটা ওদেরকে কোন না কোন শহরে পৌঁছে দেবে। অন্ন জল এবং বস্ত্রের অভাব হবে না। একবার শুধু পৌঁছে যাওয়া। সেখানে পুলিশের ভয় সামান্য থাকবে। সুতরাং ওরা সকলেই প্রায় ভদ্রলোকের মত কামরায় কামরায় টিকিটবিহীন যাত্রীর মত বসে থাকল। ওরা আর কিছু তছনছ করছে না। যাত্রীদের মনে সাহস ফিরে এসেছে। ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে বড় নিস্তেজ মনে হচ্ছিল। শরীর শক্তিবিহীন। অনেকের ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ঘুম পাচ্ছিল।

সুবল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর ঘরে এক কোণায় চুপচাপ বসে থাকল। সাদা মোমের মত বালিকার মুখ। চোখ বড় বড়। সুবলকে বালিকাটি দেখছে। ঘরে অন্য যারা ছিল তারা জল খেয়ে চলে গেছে।

এই কামরায় অবশিষ্ট জলটুকু নিঃশেষ। প্রৌঢ় মানুষটি কি যেন বই পড়ছিলেন। তাকে এখন আর উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে না। এমন কি তিনি যেন ভেবে নিয়েছেন, এইসব দেহাতি মানুষেরা কোন কিছু আর অনিষ্ট করবে না। ফাঁক বুঝে জলের জন্য ট্রেন আক্রমণ করতে এসে ট্রেনে চড়ে শহরে চলে যাচ্ছে। এক ঢিলে দুই পাখি। রথও দেখা হল, কলাও বেচা হল। সুবলের মুখ দেখে তাই মনে হয়।

সুবল এখন ট্রেনে চড়ে কোথাও চলে যেতে পারছে ভেবে খুশি। অন্ততঃ জলের জন্য আর মাঠ-ঘাঠ ঘুরে মরতে হবে না। সুবলের মুখ দেখলে তাই মনে হয়। বালিকাটি অসুস্থ। সাদা মোমের মত মুখে

শুধু চোখ দুটোই অবশিষ্ট। চোয়ালে সামান্য মাংস। হাত-পা বড় শীর্ণ। শুধু মুখে সামান্য সতেজ ভাব। চোখ দুটো বড় টল টল করছিল : সুবলের আশ্চর্য লাগছে—এই মুখ, সুন্দর সতেজ মুখ রুগ্ন এবং পীড়িত। ভিতরে ভিতরে অসামান্য কষ্ট। শিয়রে বসে আছেন যিনি—বালিকাটির মা হবে নিশ্চয়ই। তিনি বুক পর্যন্ত সিল্কের চাদরটা মাঝে মাঝে টেনে দিচ্ছেন। যারা পরে তৃষ্ণার জল খেতে এসেছিল—অবশিষ্ট জল, এমন কি এই রুগ্ন বালিকার জন্য যে মাটির জারে অল্প জল ছিল, জলের স্বাদ পেয়ে সবটুকু জল খেয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছিল, বালিকার এখন তৃষ্ণা পেয়েছে। বালিকা তৃষ্ণায় জলের জন্য ঠোঁট চাটছে। শিয়রে মা বসে। তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে বললেন, টুকুন জল খেতে চাইছে।

প্রৌঢ় মানুষটি উঠে বসলেন, তিনি দেখলেন জল কোথাও নেই। দরজার গোড়ায় সুবল বসে বসে ঝিমুচ্ছে। এখন আর স্টেশন না এলে জল পাওয়া যাবে না। কোন বয়কে ডেকে অথবা খাবার ঘরে অনুসন্ধান করলে হয়। তিনি সুবলকে অতিক্রম করে বাইরে বের হতেই দেখলেন বারান্দায় সেইসব দেহাতী মানুষেরা ক্লান্তিতে শুয়ে পড়েছে। কোথাও এতটুকু স্থান নেই যে, তিনি পা ফেলে তাদের অতিক্রম করে যাবেন। এবং এইসব দেহাতী মানুষদের দেখেই মনে হল, জল কোথাও আর অবশিষ্ট নেই। শুধু এনজিনে জল আছে এবং তিনি ঈশ্বরের নিকট কেমন অন্যমনস্কভাবে হাত জোড় করে ফেললেন। বললেন, ঈশ্বর, এই নির্জন মাঠে ট্রেন ফের থেমে পড়লে মেয়েটাকে আর জল দিতে পারব না। জল না পেলে বড় ছটফট করবে।

সুবল ঝিমুচ্ছিল। সহসা আর্তনাদে সুবলের ঘুম ভাবটা কেটে গেল। সুবল দেখল সেই সুন্দর সতেজ মুখ বালিকার, অথচ চিৎকার করছে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কোথাও চলে যাব, কষ্ট

আর সহ্য হয় না মা! কি যে এক ভীষণ রোগ মেয়ের, মা পর্যন্ত তার দুঃখে আর্তনাদ করছিলেন।

বড় শহরে যাচ্ছে মা-বাবা, মেয়েকে নিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছে। অথবা মনে হচ্ছিল এই মেয়ের জন্যই মা বাবা প্রবাস ছেড়ে নিজের দেশে চলেছেন। অনেক ডাক্তার দেখানো হল। জলবায়ু পরিবর্তন করা হল। কত টোটকা, কবিরাজী কি-না করেছেন প্রৌঢ় মানুষটি, হায়, মনের অসুখ মেয়ের, কেউ কিছু করতে পারছে না। ক্ষণে ক্ষণে বালিকার শুধু জলতেষ্টা পায়।

ছেঁড়া জামা সুবলের গায়ে। সুবলের পরনে প্রায় নেংটির মত একটু কাপড়। জামাটা হাঁটু পর্যন্ত সুবলের ফুলে-ফেঁপে ছিল। দেখলে মনে হবে, দুটো সুবলকে ভিতরে পুরে রাখা যায়।

সুবল উঠে দাঁড়াল এবং ওর মাথায় লম্বা টিকি দেখে মেয়েটি প্রথমে চিৎকার থামিয়ে দিল। সুবলের বড় বড় চুল, প্রায় চুলে মুখ ঢেকে যাচ্ছে, সুবলের শরীরে ঘাম এবং ময়লায় অথবা বলা যেতে পারে অপরিচ্ছন্নতার গন্ধ। সুবলকে দেখে মেয়েটি এবার ভয়ে যেন গুটিয়ে যাচ্ছে ফের। সে সন্তর্পণে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

সুবল বলল, মা, আমার একটু জল আছে। জলটা ওকে দিতে পারি মা। ওর খুব তেষ্টা পেয়েছে।

মা বললেন, তুমি জল দেবে কি বাছা! জল তোমার কোথায়? *

সুবল বলল, এই যে। সে একটা বাঁশের চোঙ বের করে দেখালো।

—এই চোঙায় জল আছে মা। আমার একটা পাখি আছে মা! পাখির জন্য একটু জল নিয়েছি মা

মা বললেন, না বাছা। জল তোমার বড় নোংরা।

সুবল কোন কথা বলল না। সে তার পাখিটাকে পাশের পকেট

থেকে তুলে এনে হাতের কব্জিতে বসাল। নিচে ছোট ছোট পুঁটলী সুবলের। সংসার বলতে যা-কিছু সবই শেষদিকে সুবলের সঙ্গে সঙ্গে থাকত। কারণ ওদের কোন ঠিক ছিল না কখন কোথায় ওরা থাকবে। বৃদ্ধ পুরোহিত মানুষটি তাদের সকলকে নিয়ে স্থানে স্থানে জলের জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন। বৃদ্ধের কথা মনে হতেই অন্য একটা চোঙে পাখিটাকে পুরে রাখল। পোকামাকড় যা-কিছু পাখিটার জন্য, পোঁটলা খুলে দেখলো। পোঁটলা খুলতেই পোকামাকড়গুলো পর পর ছড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধের কথা মনে পড়ছে, কামরায় কামরায় খুঁজে দেখলে হয়, কোন কামরায় তিনি হয়তো আছেন। কারণ সুবল ভেবেছে ভিড়ের সঙ্গে তিনি নিশ্চয়ই উঠে এসেছেন। কিন্তু পোকামাকড়গুলো ছড়াতেই যাত্রী তিনজন, বিশেষ করে রুগ্ন মেয়েটি হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল ভয়ে।

পোকামাকড়গুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে। আলোর ভিতর ওরা চোখে দেখতে পাচ্ছে না—বালিকার অথবা প্রৌঢ় ব্যক্তিটির পিঠে শরীরে মুখে বেয়ে বেয়ে উঠে যাচ্ছে। সুবল ভয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এমনটা হবে জানা ছিল না। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে হাত থেকে পোঁটলা খসে পড়বে এবং ঘরময় কীটপতঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে ভাবতে পারে নি সুবল।

ট্রেন বেগে চলছে, মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইসল্ কানে বড় বেশি বাজছে! পাখিটা সুবলের মাথায় হাতে এবং ঘাড়ে উড়ে উড়ে বসছে। পাখিটাকে দেখে মেয়েটি ওর সব দুঃখ যেন ভুলে যাচ্ছে। এমন কি এই যে কীটপতঙ্গ মেঝের ওপর, দেয়ালে দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। কি সুন্দর পাখি, সোনার রঙের ঠোঁট, পায়ে সবুজ ঘাসের রঙ, পাখা কালো, গলার নীচে লাল রিবন যেন বাঁধা, নরম এবং কোমল পাখি। সুবলকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখে পাখিটা, পাখিটার বয়স আর কত, পাখিটা উড়ে উড়ে দেয়ালের দিকে চলে যেতে

থাকল এবং একটা একটা করে কীটপতঙ্গ ধরে এনে সুবলের জেব ভরে দিতে থাকল।

সুবল দেখল, তার পোষা পাখিটা বড় তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছে। সে যেন ইচ্ছা করলে এই পাখি নিয়ে সকলকে এখন খেলা দেখাতে পারে।

সুতরাং এখন কামরায় চার জন। বিশেষ করে মা-বাবা এই পাখিয়ালা সুবলকে আর ঘৃণার চোখে দেখতে পারছে না। মেয়েটা এই যে এতক্ষণ কেবল ছটফট করছিল—আমার কিছু ভাল লাগছে না মা, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কোথাও চলে যাব মা, মা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? এইসব দুঃখকর কথা আর বলছে না। একটা পাখি, সাধারণ পাখি আর এক পাখিয়ালা, কোথাকার এক পাখিয়ালা, ময়লা, বিশীর্ণ চেহারা, দেহাতী—কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু যেন এই পাখি বেঁচে থাক, পাখি থাকলেই সব থাকল, পাখির খেলা দেখিয়ে সে সকলকে বুঝি মুগ্ধ করতে চায়।

টুকুন বলল, এই পাখিয়ালা।

সুবল চোখ তুলে তাকাল।

—পাখিয়ালা, দেখ এখানে একটা লম্বা গঙ্গাফড়িঙ।

পাখি কি দেখল, সুবল পাখিকে কি বলল বোঝা গেল না। পাখি উড়ে গিয়ে ফড়িঙটাকে ঠোঁটে ঠেসে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে টুকুন অতীব আনন্দে হাততালি দিতে থাকল। আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল এসে গেল। যেন বলতে চাইল—পাখিয়ালা, তুমি জাদুকর, জাদু তোমার হাতের খেলনা। এই মেয়ে কতকাল তার হাসি ভুলে ছিল, কতকাল এই মেয়ে আমার হাততালি দেয় না, আনন্দ করে না। পাখিয়ালা, তুমি আমার এই মেয়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছ, তুমি বুঝি জাদুকর!

এই করে এখন আর কোন বেদনার চিহ্ন আঁকা নেই। কোন জলতেষ্টা নেই।

টুকুন বলল, পাখিয়ালা, তুমি এই পাখি কোথায় পেলে?

—গাছের নীচে দিদিমণি।

—কি গাছ ছিল ওটা?

—একটা শিরিস গাছ ছিল।

—পাখিটার বুঝি কেউ ছিল না?

—কেউ ছিল না। ওর মা-বাবা ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে। কী খরা আমাদের দেশে! কী রোদ ছিল, কী দুঃখ! আমাদের লোকগুলো টুকুন দিদিমণি, তোমাকে কি বলব, আমাদের লোকগুলো সতেরো আঠারো দিন জল খেতে পায় নি।

বাবা বললেন, সুবল, তোমাদের কোন সরকারী সাহায্য মেলে নি?

সুবল কি বলবে ভেবে পেল না, কিছুদিন কিছু লোক বড় বড় গাড়ি করে পাহাড়ী অঞ্চলে ঘুরেফিরে গেছে, বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলে গেছে। ঐ সব পরিকল্পনার কথা সুবল বোঝে না। বড় বড় নেতাগোছের মানুষ এসেছিল। দেশের জননী এসেছিলেন। তিনি খিচুড়ি মুখে দিয়ে কেমন খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে সকলকে, তার স্বাদ চেখে গেছেন। কিন্তু মানুষের বুঝি তেষ্টা দেখে যান নি।

হায়, সুবল যেন বলতে পারত, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো আর। গরু-ভেড়া নিয়ে মানুষেরা চলে যাচ্ছে, মাটি ফেটে গেছে, শুকনো উত্তাপ, লু বইছে এবং গাছে মৃত ডাল শুধু, মাঝে মাঝে কোন পাহাড়ের গায়ে দাবানল জ্বলতে দেখা গেছে। এক বুড়ো ঠাকুর সেই দাবানল দেখে বলেছে, দেশের পাপ, এত পাপ আর ধরণী সহ্য করবেন না। পাপে পাপে দেশ ছেয়ে গেছে, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, মরুভূমির মত হাহাকার করছে গোটা দেশ। বুড়ো ঠাকুর

এই বলতে বলতে একটা গাছের ডালে নিজের বস্ত্র বেঁধে আত্মহত্যা করেছিল।

আর কি দেখেছিল! দেখেছিল সেই চৌবেজীর বৌকে। বৌটা এমন খরা দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। অভাব দেখে চৌবেজীর বৌ অন্ন-বস্ত্রেব সব আশা ত্যাগ করা যায় কিনা তার পরীক্ষা করত। সে অন্ন পেলে বলত, বিষ্ঠা খেতে নেই, জল পেলে বলত, বিষ, বিষ খেতে নেই। কাপড় পরতে দিলে বলত, আগুন, আগুন পরতে নেই। চৌবেজীর বৌটা রাতে মাঠে নেমে উলঙ্গ হয়ে নাচত। ভয়ে বিস্ময়ে সকলে একদিন দেখেছে, চৌবেজীর বৌ শরীরে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সবই অভাবের জন্য এবং অন্নের জন্য। সারা গ্রামময় যখন ওলাওঠা, তখন মহাবীর মা শীতলার একটা মূর্তি বানিয়ে দিনরাত অশত্থ গাছটার নীচে বসে থাকত। মূর্তিটাকে সে সবসময় বগলের নীচে চেপে রাখত। যেন বগল থেকে ছেড়ে দিলে তার শরীরে মায়ের দয়া হবে। বগল থেকে ছেড়ে দিলেই মা শীতলা ওর ভিতরে ঢুকে ওলাওঠা বানিয়ে দেবে।

বস্তুত মহাবীর অভাবের জন্য, অন্নের জন্য, এবং এমন অনাবৃষ্টি আর আকাল দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে সেই খড়ের তৈরি মা শীতলাকে বগলে চেপে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকত। বিড় বিড় করে বকত। তারপর একদিন সকলে দেখল মহাবীর মাথায় পাগড়ী বেঁধে মা শীতলাকে বগল তলায় রেখে উত্তরের দিকে চলে যাচ্ছে। লোকটা আর এ-অঞ্চলে ফিরে এল না। লোকটা অভাবের জন্য, খরার জন্য পাগল হয়ে গেল, নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

সুবল খুব নিবিষ্টমনে পোঁটলা'টা বাঁধছে। এখন আর একটাও পোকামাকড় কামরার ভিতর উড়ে বেড়াচ্ছে না। পাখিটা উড়ে উড়ে

সব ক'টি পোকামাকড় ধরে দিয়েছে সুবলকে। তারপর বড় জেবের ভিতর ফুর ফুর করে উড়তে উড়তে ঢুকে গেছে।

ট্রেন চলছিল। বেগে চলছিল। জানালা খুলে সুবল দেখল সারা মাঠে শুধু অন্ধকার। মাঝে মাঝে কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে। বোধহয় দূরে কোথাও অন্য ট্রেন লাইন আছে। দূরে একটা ট্রেন বাঁক নিচ্ছে। ঠিক একটা আলোর মালা, সুবলের এই আলোর মালা দেখতে বড় ভাল লাগছিল।

ওর ঘুম পাচ্ছে, মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস মনে হচ্ছিল ভিতরে ঢুকছে—বোধহয় রাত শেষ হয়ে আসছে। এই শেষ রাতটুকুতে মনেই হয় না কোথাও কোন অঞ্চল এখন জলাভাবে পুড়ে যেতে পারে। সুবলের চোখে ঘুম এসে গেল। জেবের ভিতর পাখিটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

২

অতর্কিতে এই ট্রেনটা চলে যাওয়া—যেন নিমেষে এক বড় সংসার নিয়ে ট্রেনটা উধাও হয়ে গেল। পুরোহিত মানুষটি কি করবেন ভেবে পেলেন না। তিনি ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে উঠে যেতে থাকলেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন মানুষ অথবা পরিবারকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন আশার কথা শোনাতেন, হা অন্নের জন্য, জলের জন্য এবং অনাবৃষ্টির জন্য যখন মন্বন্তর আসে তখন হাজার হাজার লোক মরে যায়, মহামারী দেখা দেয়, গরু-বাছুর সব বিক্রি করে দিতে হয়, শুধু সামান্য কুঁড়েঘর পড়ে থাকে অবশিষ্ট—কিন্তু তারপর ঈশ্বর মঙ্গলময়, তারপর সব পাপের সংসার আগুনে পুড়ে গেলে ঘন বৃষ্টি। বৃষ্টি হলেই নতুন গাছগাছালি, মাঠে সবুজ ঘাস দেখা দেয়, কোথা থেকে সব পাখি উড়ে আসে তখন। কোথা থেকে সব বন্য প্রাণী নেমে আসে। এবং ধীরে ধীরে অঞ্চলটা তপোবনের মত হয়ে যায়। তখন আর পাপ থাকে না, শুধু পুণ্য পড়ে থাকে, এই পুণ্যের জন্য আবার শতবর্ষ ধরে ফসল ফলাও, ঘরে উৎসব, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। তারপর ফের পাপ, ফের হা অন্নের সম্মুখীন হওয়া।

বস্তুত এই বৃদ্ধ পুরোহিত ভোর হলেই আকাশ দেখতেন, তিনি প্রায় সব সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একটু মেঘ দেখলে চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠত। বুঝি আজই বৃষ্টি হবে। কিন্তু তারপর কোথায় বৃষ্টি, সামান্য মেঘটুকু ফুসমন্তরে আকাশের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেত। তিনি তখন ফের অন্য এক টুকরো মেঘের সন্ধানে পাহাড়ের টিলাতে উঠে যেতেন। যেন মৃত সব গাছগাছালি, কুঁড়েঘর অথবা

উত্তর-পশ্চিমের পাহাড় যাবতীয় মেঘকে তার দৃষ্টির আড়ালে রেখে দিয়েছে।

তিনি ভেবেছিলেন মানুষের অসীম দুঃখ-কষ্টের দিন শেষ হয়ে আসছে। এবার এ অঞ্চলে ঈশ্বরের করুণার ধারা দ্রুত নেমে এসে মাঠ-ঘাট ভাসিয়ে দেবে। তিনি সেই আশায় পাহাড়ের টিলাতে দাঁড়িয়ে দিগন্তে সামান্য মেঘের অনুসন্ধান করতেন।

অথচ এক ট্রেন এসে এ অঞ্চলের সব লোকজন নিয়ে চলে গেল। শহরের দিকে ট্রেন চলে গেছে। জলের জন্য ট্রেন ধরতে আসা, আর সেই ট্রেনে চড়ে মানুষজনেরা সব চলে গেল!

পাহাড়ের উৎরাই ভেঙ্গে উঠতে ভীষণ কষ্ট। পথ, অন্ধকারে স্পষ্ট নয়। চাঁদের ম্লান আলোটুকু নিভে গেছে। ইতস্তত: কিছু কুঁড়েঘরে ছোট ছোট পাহাড়ী-উপত্যকা—তিনি পাহাড়ী-উপত্যকায় নেমে গেলেন। পথের দু'ধারে শূন্য সব কুঁড়েঘর। একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না। অন্ধকার এবং মৃত অরণ্য কেবল ভয়ের সঞ্চার করছে। তিনি চলতে চলতে কিছু কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাচ্ছিলেন। ওরা সামান্য জীব মাত্র, এত বড় লোকালয় এখন একেবারে জনহীন।

তিনি হাঁটতে হাঁটতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কে বা কারা সারাক্ষণ পাহাড়ের নীচে দৌড়াচ্ছে মনে হল। যেন কোন বন্য জন্তুর দল ক্লপ ক্লপ শব্দ তুলে খুরে, অনবরত সমতল মাঠে ছুটছে। তিনি দ্রুত পাহাড়ের ঢালুতে নেমে এলেন, মনে হল ভোরের হাওয়া বইছে। মনে হল এবার পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। আর মনে হল শান্ত এক ভাব ধরণীর কোলে। এইসব মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ রেখে বসে পড়লেন। তাঁর ঘুম এসে গেল।

সুবল কিসের শব্দে জেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত জেবের ভিতর, পাখিটা পোষা এবং ভালবাসার পাখিটা কি করছে দেখতে থাকল। চারিদিকে কোলাহল। ট্রেন বড় একটা স্টেশনে থেমে আছে। কেবল ফুঁসছে ট্রেনটা, সে জানালাতে মুখ রাখতেই দেখল, দেহাতী মানুষগুলো সারা রাস্তায় ট্রেন আটকে জল শুষে নিয়েছে, সেই মানুষগুলো স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পাগলের মত ছোটাছুটি করছে। গোটা স্টেশনে একদল পুলিশ। দেখলে মনে হবে না ওদের এই মানুষগুলো সম্পর্কে কোন কৌতূহল আছে। নির্বিকার ভাবে যেন একদল বন্য মানুষকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সবাই পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু হাতে বন্দুক, কিছু ফাঁকা আওয়াজ ওদের সন্ত্রস্ত করছিল।

সুবল এবার দ্রুত নেমে যাবার জন্য দরজা টানতেই দেখল দরজা খুলছে না। সে এবার কামরার ভিতরটা দেখল। এত কোলাহলের ভিতরও টুকুন এবং টুকুনের মা-বাবা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সে ভেবে পেল না এখন কি করবে! সে পুলিশের ভয়ে, নিশ্চয়ই ওরা এসে দরজা খুলে ওকে ধরে নিয়ে যাবে, সে কি করবে ভেবে পেল না। নিশ্চয়ই ওরা এসে ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নামাবে। ওর ভয়ে কান্না পাচ্ছিল প্রায়।

ঠিক তখন টুকুন জেগে গেছে। এই সব শব্দে, টুকুন জেগে দেখল সুবল দরজা খুলতে পারছে না। টুকুন বাবাকে দেখেছিল দরজা লক করে দিতে। সুতরাং সুবল দরজা খুলতে পারছে না। সে সুবলকে কিছু বলার জন্য উঠে বসতেই জানালায় দেখতে পেল একজন পুলিশ ওদের কামরার দিকে ছুটে আসছে। প্ল্যাটফরমে হৈ-চৈ। মানুষের ছোটাছুটি, এবং কান্না। যারা জল চুরি করেছিল অথবা লুট করেছিল তাদের এখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টুকুন ব্যাপারটা বুঝতে

পেয়েই ডাকল, সুবল, সুবল। দরজা খুলবে না। দরজা খুললে ওরা ঢুকে পড়বে ঘরে।

সুবল বলল, আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে!

টুকুন বলল, তাড়াতাড়ি এদিকে এস সুবল। বলে, সে বাংকের নিচে সুবলকে ঢুকিয়ে দিল। তারপর লম্বা চাদর দিয়ে পর্দার মত একটা আড়াল সৃষ্টি করে সুবলকে অদৃশ্য করে দিল।

সুবল সব পোঁটলাগুলো শিয়রের দিকে রেখে দিল। জেবের ভিতর পাখিটা আছে, সুতরাং সুবল পাখিটাকে একটু আলগা করে রেখে দিল পাশে। পাখিটা এখন প্রায় জড় পদার্থের মত যেন শীতে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে অথবা পাখিটার ঘুম পাচ্ছিল বোধহয়—খুব জড়সড় হয়ে সুবলের শিয়রে বসে রয়েছে। টুকুন তার বিছানার চাদরটা নিচে ঝুলিয়ে দিয়েছে। টুকুন রুগ্ন এবং দুর্বল। টুকুন কোন রকমে উঠে বসল এবং চাদর ঠিক মেঝের সঙ্গে মিলে আছে কিনা, সুবলের হাত-পা এবং অন্য কোন অংশ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা দেখবার জন্য উঠে দাঁড়াল। টুকুন বড় দুর্বল, ক্ষীণকায়। সিল্কের দামী ফ্রক গায়ে ঢল ঢল করছে। শুধু সামান্য মুখে সতেজ সুন্দর চোখ কালো জলের মত গভীর মনে হয়, বেদনার চিহ্ন এই চোখে। দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। টুকুন কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মা এবং বাবা শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাসটুকু পেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সুতরাং টুকুন নিজে ধীরে ধীরে উঠে গেল এবং দরজা খুলে দিল— লম্বা এক পুলিশের মুখ, গোটা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টুকুন খুব আস্তে আস্তে বলল, কেউ নেই।

—কেউ তোমাদের কামরায় ঢুকে লুকিয়ে নেই তো?

—না।

—বড় জ্বালাতন করছে এইসব দেহাতী মানুষগুলো।

টুকুন কোন জবাব দিল না। কারণ সে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে

পারছে না। তার শরীর এত দুর্বল যে, মনে হচ্ছিল মাথা ঘুরে নিচে পড়ে যাবে। সে পুলিশের কথা প্রায় শুনতে পাচ্ছিল না। এটা প্রথম শ্রেণী, ওরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। পুলিশের গার্ড এসেছিল, স্টেশন মাস্টার এসেছিল, ওদের কামরাতে এইসব দেহাতী মানুষগুলো উপদ্রব করে গেছে কিনা, অথবা কোন দুর্ঘটনার জন্য এই দেহাতী মানুষগুলো দায়ী কিনা অনুসন্ধানের চেষ্টায় আছে।

টুকুন এবার শক্ত গলায় বলল, এ ঘরে কেউ আসে নি গার্ডসাহেব। বলে, সে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বাংকে কোনক্রমে ছুটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর অবাক টুকুন, কি বিস্ময় টুকুনের, আজ প্রথম কতদিন পর সে নিজে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে পেরেছে। সে কতদিন পর নিজের পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পেরেছে। সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মা-বাবা ঘুমুচ্ছেন। মা-বাবা দেখতে পেলেন না টুকুন নিজে উঠে বসেছে এবং নিজে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। দরজা বন্ধ করেছে।

সে মা-বাবাকে ডাকে নি, কারণ মা-বাবা হয়তো ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দিয়ে সব বলে দিতেন। হ্যাঁ, এসেছিল, সুবল এক পাখিয়ালা, সেই পাখিয়ালা এসেছিল দলবল নিয়ে, সে তার দলবল নিয়ে এই ঘরের শেষ জলটুকু নিঃশেষ করে গেছে। মাকে হয়তো বোঝাতেই পারত না, সুবল এক পাখিয়ালা এসে টুকুন নামে এক রুগ্ন স্থবির বালিকার পায়ে শক্তি সঞ্চার করতে সাহায্য করেছে। টুকুন মাকে বাবাকে তার এই বিস্ময় দেখানোর জন্য ডাকল, মা, মা!

সে ডাকল, বাবা, বাবা!

ট্রেন চলছে। ভোর হয়ে আসছে। জানালা দিয়ে আবার বড় মাঠ দেখা যাচ্ছে। ট্রেনের তার দেখা যাচ্ছে। পাখিরা ভোরের আলোতে উড়ে যাচ্ছিল। এই মাঠ দেখলে এখন আর কোন জলকষ্টের কথা মনে পড়ছে না। কিছুটা সবুজ আভা এখন দেখা যাচ্ছে। গ্রামে

মানুষের চালাঘর, গরুবাছুর এবং মাঠে সামান্য শস্য দেখা যাচ্ছিল। টুকুন খুব ধীরে ধীরে তখনও ডাকছে, মা, বাবা, দেখো দেখো। মা, বাবা, ওঠো ওঠো। দেখো তোমরা, তোমরা দেখো, টুকুন শুয়ে নিজের মায়ের ওপর কোমল হাত রাখল।

সুবল বাংকের নিচে চুপ মেরে শুয়ে আছে। এখন বের হলে যে কোন, আর ভয় নেই সে তা ধরতে পারছে না। ওর ধারণা পুলিশ এখনও এই ট্রেনে দলবল নিয়ে ঘুরছে। সে এতটুকু নড়ছিল না। সে পাখিটাকে পর্যন্ত হাতের ইশারাতে দুষ্টুমি করতে বারণ করে দিল। কারণ ভোর হয়ে গেছে বোধহয় আর খরা অঞ্চলের ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে না। সে ট্রেনে শুয়ে শস্যের গন্ধ পেল। এই শস্যের গন্ধ পেয়ে পাখিটা কেমন শক্তি পাচ্ছে ভিতরে। ওর ফুর ফুর করে উড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল। সে এত উত্তেজিত যে বাংকের নিচেই দু'বার ফুর ফুর করে উড়ে মাথায়-মুখে এসে সুবলের বসে পড়ল।

সুবল এতটুকু নড়ছিল না। সে পাখিটার দুষ্টুমি ধরতে পেরে বাঁশের অন্য একটা চোঙ টেনে আনল সন্তর্পণে। তারপর পাখিটাকে চোঙের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। এবং মুখ বন্ধ করে বলল, বড় বজ্জাত পাজি তুই। বড় শহরে না গেলে তোমাকে আর ছেড়ে দিচ্ছি না।

টুকুন নিজের পায়ের ওপর চোখ রেখেছিল বিস্ময়ে। মা-বাবা উঠে গেছেন। টুকুন ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, মা, আমি উঠে দরজা পর্যন্ত গেছি, দরজা খুলে দিয়েছি।

মা এত বিস্মিত যে কথা বলতে পারছিলেন না। বোধহয় টুকুন স্বপ্নের কথা বলছে।

—বাবা, পুলিশ এসেছিল।

বাবা টুকুনকে দেখতে থাকলেন। কথা বলতে পারছিলেন না।

—বাবা, সত্যি আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। ওরা সুবলকে ধরতে এসেছিল। আমি বলেছি এখানে কেউ নেই।

বাবা এবার দরজার দিকে চোখ তুলে দেখলেন, দরজা তেমনি লক্ করা আছে। তিনি ভাবলেন টুকুন হয়তো কোন স্বপ্ন দেখেছে। টুকুন স্বপ্ন দেখেছে কোন মাঠ অথবা ওর প্রিয় লেবুতলায় সে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। ওর শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শুকিয়ে আসছে। পায়ের কোথাও আর কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই। কেমন ক্রমশঃ টুকুন স্থবির হয়ে যাচ্ছিল। কোথাও কোন জায়গা নেই, বড় ডাক্তার নেই যেখানে তিনি টুকুনকে নিয়ে না গেছেন। হতাশা এখন সম্বল। মেয়েটা ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে যাবে তারপর সতেজ মুখে আর কোন বিষণ্ণ ছবি ঝুলে থাকবে না। টুকুন মরে যাবে। বাবা তার এই স্বপ্নটুকু ভেঙ্গে দিতে চাইলেন না।—বাঃ, বেশতো টুকুন, তুমি হেঁটে গিয়েছ, বাঃ, বেশতো। আমিতো বলেছি, তুমি আজ হোক কাল হোক হাঁটতে পারবে। তুমি হেঁটে হেঁটে কোথাও না কোথাও চলে যেতে পারবে।

—বাবা, আমি হেঁটে হেঁটে এই বাংকে এসে শুয়ে পড়েছি। আমি সুবলকে পর্দার আড়ালে রেখে দিয়েছি, সব আমি বাবা নিজের হাতে করেছি। আমি পায়ে হেঁটে করেছি। বলে টুকুন ফের উঠে বাবাকে দেখাতে চাইল, আমি হাঁটতে পারি, মাকে দেখাতে চাইল, এই দেখ আমার পায়ে কেমন শক্তি, কিন্তু হায়, টুকুন শত চেষ্টা করেও পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারল না, অতীব আশার উত্তেজনা ওকে বড় অসহায় করে তুলছে। তবে কি সব ভোজবাজির মত হয়ে গেল! টুকুন কত চেষ্টা করল। কতভাবে চেষ্টা করল। প্রাণে সকল আবেগ ঢেলে চেষ্টা করল, কিন্তু হায়, টুকুন কিছুতেই আর নিজের চেষ্টায় উঠে বসতে পারল না। টুকুন ভয়ঙ্কর হতাশায় ফের কেঁদে ফেলল, মা, আমার কিছু ভাল লাগে না, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, কোথাও আমি চলে যাব।

হায়, মেয়েটার দিকে এখন আর তাকানো যাচ্ছে না। সতেজ মুখে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। সাদা জামা, চোখের জলে ভিজে গেল।

সারাজীবন ধরে কান্না। কি এক দুরারোগ্য ব্যাধি, কি এক অসীম হতাশা এই পরিবারকে ক্রমশঃ গ্রাস করছে। টুকুন ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। হাত-পা অচল হয়ে যাচ্ছে। ভিতরের শিরা-উপশিরা শুকিয়ে যাচ্ছে, রোগের কোন কারণ নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

ট্রেন চলছিল। পাখি উড়ছিল আকাশে। লাইনের তারে কিছু শালিখ পাখি দেখতে পেল ওরা। কত গ্রাম-মাঠ ফেলে ট্রেন ছুটছে। জানালায় ছোট ছোট কুঁড়েঘর, বড় দীঘি, কালো জল, সবুজ মাঠ ভেসে উঠছিল। যত ট্রেন বড শহরের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে, তত লোকালয়, ইট-কাঠের বাড়ি, কারখানার চিমনি এবং লোহার পুল। সুবল বাংকের নিচে থেকে উঠে এলে দেখতে পেত সব। বোধহয় সুবল ফের ঘুমিয়ে পড়েছে বাংকের নিচে। সুবলকে ঘুমোতে দেখে পাখিটা চোঙের ভিতর কিচ্‌মিচ্‌ করছিল। ছটফট করছিল ভিতরে। ফুর ফুর করে ওড়বার ইচ্ছা পাখির, পাখি কেন আর এখন চোঙের ভিতর থাকবে দুষ্টু পাখি সুবলের কানের কাছে চোঙের ভেতর থেকে বের হবার জন্য কিচ্‌ মিচ্‌ করে প্রায় কোলাহল জুড়ে দিল।

বোধহয় সুবল পুলিশের ভয়ে ঘাপটি মেরে আছে। নড়ছে না। পাখিটা চোঙের ভেতর থেকে ভাবছে সুবল ঘুমোচ্ছে। টুকুন ভাবছে সুবল ঘুমোচ্ছে। মা-বাবা এ-ঘরে সুবল আছে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। কারণ ওঁরা সুবলকে দেখতে পাচ্ছেন না। চাদরটা মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সুবলের হাত-পা-মুখ কিছু দেখা যাচ্ছে না। সবটাই স্বপ্ন টুকুনের। সুবল, পাখিয়ালা সুবল চলে গেছে।

আর ঠিক তক্ষুনি সুবল চাদর ফাঁক করে কচ্ছপের মত মুখ বার করে বলল, মা, পুলিশ দরজায় দাঁড়িয়ে নেই তো। মা, আমরা আর কতক্ষণ ট্রেনে? পুলিশ আমাকে ধরবে না তো!

টুকুন শুয়ে শুয়ে বলল, তুমি কতদূর যাবে সুবল?

—আমি কলকাতা যাব দিদিমণি।

—সেখানে কে আছে সুবল ?

—আপন বলতে কেউ নেই। বলে সুবল হামাগুড়ি দিয়ে চাদরটা সরিয়ে বের হয়ে এল। নোংরা জামাকাপড় বলে সে এক কোণায় মেঝের ওপর জবুথবু হয়ে বসল। সে দু'হাত জোড় করে বলল, মা, পাখিটা আমার বের হতে চাইছে। বের করব ? পাখিটা একটু উড়তে চাইছে।

পাখিটা হেগে-মুতে দিতে পারে এই ভয়ে প্রৌঢ় মানুষটি কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করছিলেন। নোংরা সুবলকে সহ্য করতে পারছিলেন না। যেখানে সুবল বসছে ঠিক সেখানেই নোংরা লাগাচ্ছে। কিন্তু টুকুন পাখির নাম শুনেই বলল, সুবল, তুমি এখন পাখি ছেড়ে দিলে মাঠে উড়ে যাবে ?

—না দিদিমণি। পাখি আমার পোষা। পাখির মা নেই বাবা নেই, আমার মত পাখির কেউ নেই। আমাকে ফেলে পাখি আর কোথাও যাবে না দিদিমণি।

—দেখি, কেমন যায় না !

—কেন দিদিমণি, তুমি দেখ নি পাখিটা আমাকে কেমন সব পোকা-মাকড় ধরে দিয়েছে ?

—তা দিয়েছে তোমার পাখি।

—তবে এই দেখ। বলে চোঙের মুখ খুলে দিল সুবল। সেই পাখি সোনার ঠোঁটে কিচমিচ করে উঠল। পেটের দিকে সাদা রঙ, পাখা কালো আর ঘন সবুজ রঙ পাখির পায়ে। পাখিটা প্রায় নেচে নেচে বেড়াল সারা কামরাময়। পাখিটা দেয়ালে উড়ে গিয়ে বসল, ওপরের বাংকে বসে উঁকি দিয়ে যেন গাছের ডালে বসে উঁকি দিচ্ছে তেমনি পাখিটা নিচে টুকুনকে দেখল। টুকুন পাখিটাকে দেখল, মাঠের ভিতর খোলা আকাশের নিচে এই পাখি কত সুন্দর দেখাত—সুবল এক পাখিয়ালা কলকাতা যাচ্ছে, যেন বলছে, দেখো দেখো, খেলা দেখো,

পাখি আমার খেলা দেখাবে, নাচবে, গাইবে, হাওয়ায় উড়বে, ষাঁড় গরুর মত, ভালুক অথবা বাঁদর নাচের মত, সুবল এক পাখিয়ালা কলকাতা নগরীতে অন্নসংস্থানের জন্য যাচ্ছে।

পাখিটা জানালায় বসল, পাখিটা টুকুনের শিয়রে বসে লেজ নাড়ল। আর পাখিটাকে টুকুন সামান্য আপেলের টুকরো দিল খেতে। শিয়রে বসে টুকুনের হাত থেকে পাখিটা ফলের নরম অংশ ঠুকরে ঠুকরে খেল।

তখন সুবল বসেছিল নিচে। ওর পোঁটলার ভিতর লুকনো বটফল, এক মুঠো ফল মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে থাকল। প্রায় যখন ফেনা উঠে গেছে মুখে তখন দলাটা কোঁৎ করে গিলে ফেলল সুবল। ফের এক মুঠো, ফের ফেনা ওঠা পিষ্টক সে খেয়ে সামান্য পাখিটার জন্য রেখে দিল হাতে।

সুবলের এই নোংরা স্বভাব দেখে টুকুনের মা ঘৃণায় মুখ কোঁচকাল, ঘৃণায় একবার চেকারবাবুকে ডেকে বলবে কিনা ভাবল, এখন তো আর খরা অঞ্চল নেই, এখন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের ভয় কি! সুতরাং এবার প্রায় টুকুনের মা ধমক দিয়ে বলল, সামনের স্টেশনে তুমি বাপু নেমে যাবে।

সুবল বলল, তাই যাব মা। স্টেশনের কি নাম?

—স্টেশনের নাম ব্যাণ্ডেল।

—যাব মা। সেখান থেকে কলকাতা কতদূর মা?

অত কথা শুনতে ভাল লাগল না। কোথাকার কোন এক মানুষ, উটকো মানুষ মা মা বলে একেবারে কামরাটাকে কদাকার করে তুলছে। সে বলল, মা, আমি তো আপনাদের কোন অনিষ্ট করছি না।

টুকুন শুনছিল সব। সে দেখল সুবল ভয়ে কেমন চুপ মেরে গেছে। সুবল ওর সব সম্বল নিয়ে এসেছে বলে পোঁটলা খুলে দেখল, ছোট ছোট পোঁটলার কোনটায় চন্দনের বীচি, কোনটাতে পুঁতির মালা।

তার মা একবার মেলা থেকে একটা পুঁতির মালা কিনে দিয়েছিল

আর রঙ-বেরঙের সব পাথর, সে সেইসব পাথর পাহাড়ের নুড়িপাথর থেকে সংগ্রহ করেছে। সে কিছুই ফেলে না। যা ভাল লাগে, যা কিছু ভাল লাগে—সবই সঞ্চয়ের সামিল এই ভেবে সব সে সঞ্চয়ের ঝুড়িতে জমা রেখে দিত। চন্দনের বীচি, কুঁচফল এবং ভিন্ন ভিন্ন পাথরের উজ্জ্বল রঙ টুকুনকে পুলকিত করছিল। টুকুন মাকে ভয় পায়, মা সুবলকে নেমে যেতে বলেছেন, টুকুনের কষ্ট হচ্ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছিল টুকুনের, কারণ সুবলের কেউ নেই—কত আর বয়েস সুবলের, সে সময় পেলে পাখির খেলা দেখায়। অথবা কোন কোন সময় ঋষি-পুত্রের মত মনে হয় যেন সুবলকে, সবচেয়ে বড় আশ্চর্য, সুবলের জন্য টুকুন দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পেরেছিল। যেন এক দৈবশক্তি ভর করেছিল টুকুনের পায়ে। অথবা সুবল মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে টুকুনকে হাঁটতে সাহায্য করেছে। এই সুবল চলে গেলে সে সত্যই পঙ্গু হয়ে যাবে। আর কোনদিন সে হেঁটে গিয়ে জানালায় দাঁড়াতে পারবে না, কোন-দিন সে খোলা আকাশের নিচে আর দৌড়তে পারবে না।

৩

তখন খোলা আকাশের নিচে একটা গাছ, কি গাছ হবে, চডুই গাছ অথবা অর্জুন গাছ হতে পারে। গাছে পাতা নেই, রোদ এসে মুখের ওপর পড়ছে, প্রথমে মনে হচ্ছিল কেউ অন্ধকার রাতে ওর সামনে আলো বহন করে এনেছে, সে সচকিত হয়ে চোখ খুলল, মাথার ওপর প্রখর রোদ, সামনে খোলা মাঠ, শুধু ধূ ধূ করছে মাঠের রোদ। ঝিল্লীর আঁকা-বাঁকা রেখা দিগন্তে পাখির মত উড়ে উড়ে যাচ্ছে। মরিচীকার মত মনে হচ্ছিল। বৃদ্ধ পুরোহিত প্রথমে শরীরের আলখেল্লা খুলে ফেললেন। মরিচীকার মত এই জলের চিহ্ন তিনি দেখতে পাচ্ছেন, মাঠ পার হয়ে হয়তো আকাশের নিচে কোথাও কোন মেঘের টুকরো উঠে আসছে, তিনি জলের সন্ধানে এই মরুভূমির মত প্রান্তরে ছুটতে থাকলেন। তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। তিনি প্রায় পাগলের মত ছুটে চলেছেন, যদি কোথাও কোন জলের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

আর তিনি ঠিক নিচে এসে যেখানে গতকাল মানুষেরা নদীর ঢালুতে জল অনুসন্ধান করে গেছে, সেখানে থমকে দাঁড়ালেন। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে একটি ছোট্ট পাহাড়ের শিরা বের হয়ে এসেছে। দু'দিকে পাহাড়ের উপত্যকা গিরিখাতের মত সৃষ্টি করেছে। তারই নিচে ছোট পাতকোর মত গর্ত। বালুর পাহাড় চারধারে। একের পর এক এই সব গর্ত গতকাল তার দলের মানুষেরা করে গেছে। কোন গর্তেই জল নেই, তিনি তা জানতেন। শুধু দূরে দেখলেন তিনটি ছোট ছোট প্রাণী একটা গর্তের চারধারে কেবল ঘুরছে। এই খরা অঞ্চলে, জলের অভাবের জন্য যেখানে কোন পাখপাখালি পর্যন্ত নেই, যেখানে কোন [illegible] পর্যন্ত ডাকছে না, সেখানে এমন তিনটি প্রাণী দেখে বিস্মিত

পৌঁ৮

তা

তিনি যত এগুচ্ছিলেন তত এইসব ছোট ছোট প্রাণীগুলোকে কেমন চঞ্চল দেখাচ্ছিল। কাছে গেলে বুঝতে পারলেন দুটো হরিণ শিশু জলের জন্য পাশের সংরক্ষিত বন থেকে এখানে ছুটে এসেছে। ওঁকে দেখে তারা ছুটে পালাল না! শুধু সামান্য লাফ দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। তিনি গর্তের পাশে দাঁড়ালে আরও বিস্মিত হলেন—একটা বড় হরিণ গর্তের ভিতর পড়ে গেছে, হরিণটার হাঁটু পর্যন্ত জল, সে তার শিশুদের জল দেবার জন্য নিচে লাফিয়ে পড়েছে। আর উঠতে পারছে না। কেবল ভিতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। বৃদ্ধকে দেখে কেমন কঁকিয়ে কঁকিয়ে একটু শব্দ করল তারপর বৃদ্ধকে অপলক দেখতে থাকল।

তিনি এবার হরিণ শিশুদের অতিক্রম করে সেই গর্তে নেমে গেলেন। নিচে নেমে হরিণটাকে পাড়ে উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর আলখেল্লাটা জলে ভেজালেন। হরিণী একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাচ্চাগুলোর জন্য অপেক্ষা করছে। জলের পিপাসা ওদের এত বেশি যে, ওরা জল খাবার জন্য ঝুঁকে পড়ছিল গর্তে। প্রাণের মায়া ছিল না। বৃদ্ধ আলখেল্লা ভিজিয়ে জল তুলে আনলেন। একটু একটু করে তিনি সেই তিনটি শিশুকে আলখেল্লা চিপে জল খেতে দিলেন। ওরা জল খেল, লাফাল, তারপর হরিণীর সঙ্গে সেই বনের দিকে ছুটে যাবার জন্য পাহাড়ের কোলে উঠে গেল।

যতক্ষণ না ওরা তিনজন হারিয়ে গেল ততক্ষণ বৃদ্ধ সেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এখন আর যেন কিছু করণীয় নেই। বালির নিচে চোরা স্রোত, এই স্রোতের সন্ধান যদি তিনি গতকাল পেতেন তবে বুঝি এইসব অঞ্চলের অন্তত: কিছু কিছু মানুষকে শস্য এবং সুদিনের আশ্বাস দিয়ে ধরে রাখতে পারতেন। কিন্তু হায়, ওরা এখন সব বিবাগী। ওদের ছোট ছোট কুঁড়েঘর পড়ে আছে। পাহাড়ী উপত্যকাতে এই সময় অন্যান্য বছর যখন বর্ষার জলে মাটি ভিজতে থাকে তখন এক মেলা হয়, উৎসব হয়, উৎসবে তিনি প্রধান মানুষ।

এই উৎসব শস্যের জন্য, সম্পদের জন্য, কতকাল থেকে পৈতৃক এই ব্যবসা তাঁর। সকলের বিশ্বাস এখন তিনিই একমাত্র মানুষ যার মন্ত্রের উচ্চারণে আর তেমন শক্তি নেই। হোমে তিনি যে বিল্বপত্র দান করেন এখন তা আর তেমন পবিত্র নয়—নিশ্চয় কোথাও না কোথাও তিনি তাঁর পবিত্র জীবন থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। মানুষের বিশ্বাসভঙ্গের দায়ভাগ তাঁর ওপর।

বৃদ্ধ পুরোহিতের নাম জনার্দন চক্রবর্তী। তিনি জলের ভিতর তাঁর মুখ দেখে আঁৎকে উঠলেন। চোখে-মুখে অবসাদ, বড় বড় দাড়িতে মুখ ঢেকে গেছে, তিনি ক্রমশঃ কেমন বন্য জীবের মত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে বনমানুষের মত মনে হচ্ছে। তিনি রোদের জন্য ওপরে দাঁড়াতে পারছিলেন না। তিনি উলঙ্গ হলেন এবং সেই হাঁটুজলে নেমে শরীরে মুখে জল ঢেলে দিলেন। সমস্ত ক্লান্তি এবং অবসাদ শরীরের ক্রমশঃ কেমন উবে যাচ্ছিল। দীর্ঘদিন পর ঠাণ্ডা জলের এই স্নান তাঁকে সুখী এবং তাজা যুবকের মত ফের সেই পুরানো মন্দিরে উঠে যেতে প্রেরণা দিচ্ছে। তাঁর সেই স্বপ্নের কথা মনে হল, জলের জন্য অনুসন্ধান, স্বপ্নে কে যেন বলল—অনুসন্ধান কর, কোথাও না কোথাও নদীর ঢালুতে চোরা স্রোত রয়েছে, তুমি তাই খুঁজে বের কর।

সে আবার চিৎকার করে উঠল, মা সুবচনী, তোর জয় হোক। কিন্তু মা তোর মনে কি এই ছিল? তোর মাটিতে মা ফসল ফলে না, তোর মাটিতে মা আর পালা-পার্বণ নেই, সব খা খা করছে, সব জনহীন প্রাণীহীন মা, আমি এখন এই জলে কি করব মা। তোর জলে তুই ডুবে মর। তুই ডাইনী। সকলের হাড়-মাংস খেয়ে তুই সুবচনী এখন ধেই ধেই করে নাচছিস।

জনার্দন পারে উঠে আলখেল্লা এবং পরনের কাপড়টা কাঁধে ফেলে একবার চারিদিকে তাকালেন। কবে সব মানুষজনদের নিয়ে তিনি জলের সন্ধানে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে চলে এসেছিলেন, এখন যেন

আর তা মনে পড়ছে না। ভালবাসার মাটি সকলে ছেড়ে চলে গেলে কি আর থাকল। জনার্দন, এই মাটি ছেড়ে সকলে কোথাও চলে যাবে ভাবতেই জলের জন্যে হতাশ হয়ে মরছিল। পারে উঠে দেখল—তাঁর আবাস অনেক দূর। এত দূর তিনি হেঁটে যেতে পারবেন না, বিশেষ করে এই খরার রোদে। তিনি বালুর ওপর আর পা রাখতে পারছিলেন না, সূর্য যত ওপরে উঠে আসছে তত পায়ের নিচের উত্তাপ প্রখর মনে হচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি কোন নিকটবর্তী গ্রামে উঠে যাবার জন্য প্রায় ছুটে চললেন। পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে এখন অন্ততঃ সময়টা কাটিয়ে বেলা পড়ে এলে পর ছোট পাহাড়ে চলে যাবেন।

গ্রামের ভিতর ঢুকতেই জনার্দনের বুকটা ছাঁাৎ করে উঠল। এখন আর এখানে মানুষের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। প্রিয় কদমফুল গাছটা মরে গেছে। পুকুরের মাটি ফেটে গেছে। সব কেমন জ্বলে-পুড়ে খা খা করছিল। কোথা থেকে পচা দুর্গন্ধ আসছিল। জনার্দন ছোট একটা কুঁড়েঘর দেখে ভিতরে ঢুকে গেলেন। বস্তুত জনার্দন ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন দরজার পাশে একটা ছেঁড়া গামছা ঝুলছে এবং বাতাসে গামছাটা নড়ছিল। জনার্দন ভয়ে দরজা বন্ধ করে বসে পড়লেন। মনে মনে বললেন, মা সুবচনী, এত ভয় কেন প্রাণের জন্য। কিসের ভয় মা। আর তো কেউ নেই মা। আমি পুত্র-কন্যাবিহীন। শুধু এক অহঙ্কার ছিল মা। অহঙ্কার আমার এই উপবীতের। তিনি তাঁর উপবীতে হাত রাখলেন। পুরুষানুক্রমিক এই উপবীত, উপবীতের অহঙ্কার, কে যেন হেঁকে গেল মাঠে, ঠাকুরমশাই, মেয়ের বিয়ে কোন মাসে দেব, ঠাকুরমশাই মাথা চুলকে কি দেখলেন, তারপর বইয়ের পাতায় কি পড়লেন, শেষে বলে দিলেন, সাতাশে শ্রাবণ। সন্তানের কি নাম হবে, তিনি নাম বলে দিতেন, পুত্র হবে না কন্যা হবে, তিনি বলে দিতেন, জমিতে ধান চাষ হবে—তিনি বলে দিতেন, কালবৈশাখীর ঝড় থেকে রক্ষার জন্য ভৈরব ঠাকুরের পূজা দিতেন। বৃষ্টি না হলে হোম-

করতেন। সময়ে অসময়ে বৃষ্টি ঝরে পড়ত। জলে ভেসে যেত মাটি। লাঙ্গল কাঁধে তুলে সুবচনীর মন্দিরে চাষী মানুষেরা যেত, তিনি লাঙ্গলের ফলাতে সুবচনীর তেল-সিঁদুর মেখে দিতেন, গৃহস্থগণ চাষ করে আপন ঘরে সম্বৎসর সোনার ফসল তুলত।

জনার্দন ঘর অন্ধকার করে বসে থাকলেন। ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ, ঘরের ভিতর একটা ছেঁড়া বালিশ—তিনি তার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। দিনের বেলাতে আর বের হওয়া যাবে না বোধ হয়, চারিদিকে লু বইছে। মাথায় মুখে কাপড় জড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। তিনি স্থির করলেন, দিনের বেলাতে সুবচনীর মন্দিরে নিদ্রা যাবেন, রাতের বেলাতে উঠে খাদ্য অন্বেষণ এবং অন্যান্য কাজ, কি করে এই মাটিকে ফের উর্বর করা যায়, কি করে ফের মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়, সে সবের চেষ্টা।

কারণ জনার্দন ঠাকুরের মন্ত্রের ওপর বড় বিশ্বাস ছিল। এই অঞ্চলের দেবী সুবচনী, এই অঞ্চলের রক্ষার দায়িত্ব তাঁর। আর জনার্দন ঠাকুর পুরুষানুক্রমিক দেবীর সেবাইত। পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস, অঞ্চলের মানুষদের বিষয় সম্পর্কে জনার্দন ঠাকুর—প্রায় যেন ঈশ্বরের কাছের মানুষ। অশিক্ষিত গ্রাম্য এবং পূর্ণিয়া অথবা বিহার-বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ এরা। কিছু পাহাড়ী আদিবাসী। কিছু বাঙ্গালী। ভাষা, বিহার-বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের। বড় গরীব মানুষগুলো। যা ফসল ফলত মাঠে, ওরা সোনার ফসল ভেবে নিত। এ-ভাবে ওদের বছরের পর বছর কেটে গেছে। জলের কষ্ট ছিল, কিন্তু জলের অভাবে গরু-বাছুর মরে যায় নি, অন্নের কষ্ট ছিল মানুষের—কিন্তু কেউ অনাহারে থাকে না। মা সুবচনী, বড় জাগ্রত, বড় লক্ষ্য তাঁর সন্তানের ওপর।

বিস্তীর্ণ পাহাড় আছে, শাল-শিমুলের গাছ আছে, বনে পাখি আছে, হরিণ আছে, আর কত রকমের মূল আছে গাছের যা তুলে ক্ষুধায় খেলে

অন্নকষ্ট দূর হয়, শরীরে শক্তি সঞ্চার হয়। গৃহস্থের সোনার ফসল, গরীবের মুনীষ খেটে খাওয়া, কাজ না থাকলে, বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াও সকল অন্নকষ্ট দূর হয়ে যাবে। তেমন অঞ্চলে পর পর তিন বছর খরা গেল—সকলে দুঃস্বপ্ন দেখল—বুঝি এই অঞ্চল মরুভূমি গ্রাস করে খাচ্ছে।

সুতরাং মানুষেরা যাদের সহায়-সম্বল আছে তারা শহরে চলে গেল, মড়কে কিছু লোক সাফ হয়ে গেল আর বাকি যারা ছিল এতদিন তাদের জনার্দন ঠাকুর নানা রকম আশ্বাস দিয়ে ধরে রেখেছিলেন, কিন্তু হায়, কোথাকার এক ট্রেন এসে তাদেরও নিয়ে চলে গেল। জনার্দন দুঃখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। তবু হায়, জনার্দন ঠাকুরের এই মাটির জন্য আশ্চর্য এক ভালবাসা। এমন মাটি, ভালবাসার মাটি, কোথাও যেন তাঁর নেই। তিনি এখানে রাজার মত ছিলেন, মানুষের কাছে তিনি এখানে পীরের মত। সেই মানুষেরা চলে গেছে। সেই সব ভালবাসার মানুষেরা চলে গেছে। তিনি তাদের আর কিছুতেই বুঝি ফেরাতে পারবেন না। তাঁর বাপ-পিতামহের গল্প, দেবীর সব পৌরাণিক ইতিহাস, এবং যা চমকপ্রদ, ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রবাদ এই মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। কেউ আর স্মরণ করবে না, জনার্দন ঠাকুরের পরিবার দশ পুরুষ আগে পূর্ববাংলার কোন প্রত্যঙ্গ অঞ্চল থেকে এসে এখানে সুবচনী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন এত লোকালয় ছিল না, দেবীর আশীর্বাদ পাবার লোভে মানুষেরা এই পাহাড়ের নিচে বসতি স্থাপন করেছিল। তারপর থেকে এই জনার্দন এবং তাঁর পরিবার পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাসের মত।

জনার্দন ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে ফের উপবীতে হাত রেখে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়ালেন, যেন তিনি শপথ করছেন। কিসের শপথ স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবু তাঁকে দেখলে মনে হল আমৃত্যু এই মাটির সঙ্গে তাঁর লড়াই। দেবীর সঙ্গে তাঁর লড়াই। ঊষর এই দেশকে উর্বর করে তোলার জন্য তাঁর সংগ্রামকে বড় স্বাস্থ্যকর মনে হবে।

কিন্তু তাঁর মুখের ছবি, চোখের দৃঢ়তা এবং উপবীতের অহঙ্কার তাঁকে যেন বড় এক লম্বা দৈত্যের মত বড় করে ফেলেছে! ভয়ঙ্কর খরা, বাইরের লু আর ঊষর প্রকৃতি তাঁকে নিরস্ত করতে পারল না।

শরীর-মন-প্রাণ শক্ত করার জন্য তিনি বিড়বিড় করে দেবী সুবচনীর পাঁচালী পড়তে থাকলেন, সুবচনী মায়গ বাড়ি বাড়ি যায়, বাড়ি বাড়ি গেলে মায়গ ধান-দূর্বা পায়। আরও কি বলার ইচ্ছা যেন। যেন বলার ইচ্ছা মা, তোর এত ছেলে আছে, আর তুই তোর মাটির ছেলেদের সব একসঙ্গে গ্রাস করে ফেললি! জনার্দন চিৎকার করে উঠলেন, সুবচনী মায়গ আমার বড় দয়াময়, ছেলে কোলে লইয়া ঘোরে পাড়াময়। জনার্দন আবছা অন্ধকারের ভিতর উঠে বসলেন, বললেন, তুই যদি দয়াময়ী হস মা তবে তোর এই রাক্ষুসী মুখ দেখতে পাচ্ছি কেন?

তখন সারা মাঠ খা খা করছিল। চিতার মত জ্বলছে গ্রাম-মাঠ গাছ-গাছালি। জনার্দন পরিত্যক্ত এক কুঁড়েঘরে বসে আছেন। তিনি ভিজা আলখেল্লাটা গায়ের ওপর রেখে দিয়েছিলেন, এখন সেই আলখেল্লা এবং কাপড় দুই-ই শুকিয়ে প্রায় শক্ত কাঠ।

তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। বিশ-ত্রিশ ক্রোশ হেঁটে শহরের দিকে চলে যাবেন—কিন্তু যা খবর সেখানেও লোক নেই। লোক সব শহর-গঞ্জ ছেড়ে দিচ্ছে। সরকার থেকে যা সামান্য সাহায্য আসছে তাও বন্ধ। সরকার থেকে যে পাতকুঁয়ো গ্রামের মাঠে কাটা হয়েছিল, তাতে জল নেই। সুতরাং জনার্দন ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছেন। ওঁর প্রবল আবেগ, ঊষর জমি উর্বর করে তোলার আবেগ ক্রমশঃ মরে যাচ্ছিল। কারণ সর্বত্র এই হাহাকারের দৃশ্য—জনার্দন এবার পাগলের মত দরজা খুলে দিলেন এবং তপ্ত মাঠের ওপর দিয়ে লুএর ভিতর দিয়ে শ্মশানের মত এক সাম্রাজ্য শুধু চারিদিকে—জনার্দন চোখ-মুখ বন্ধ করে উর্ধ্বশ্বাসে সেই পাহাড়ের উদ্দেশে ছুটছেন।

৪

তখন ট্রেনটা ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে ছাড়ব ছাড়ব করছে। সুবল কামরা থেকে নেমে গিয়েছিল, নেমে গিয়ে দেখল বড় একটা চোঙ দিয়ে আকাশ ফুঁড়ে যেন জল পড়ছে। এত জল! সে অবাক হয়ে তাকাল পশ্চিমের দিকে, সেখানেও বড় একটা চোঙ থেকে জল পড়ছে আকাশ থেকে। এত জল! সুবল দেখল নিচে ছোট ছোট টিপকল, কেবল জল আর জল। সে তাড়াতাড়ি পোঁটলাপুঁটলি রেখে জলে স্নান করে নিল। জল আর জল। চোখে-মুখে জল পড়তেই শরীরের সব অবসাদ কেটে গেল। যেন সমস্ত শরীরে ঈশ্বর তাঁর ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ দিচ্ছেন। সে কলের নিচে শুয়ে বসে লাফিয়ে স্নান করল। ওঃ, কি ঠাণ্ডা জল! ওঃ, কি আরাম!

কিন্তু একজন নীল উর্দিপরা লোক এসে হেঁকে উঠতেই সে ভয়ে ভয়ে কলের নিচ থেকে বের হয়ে গা-শরীর মুছে যখন প্ল্যাটফরম ধরে হাঁটছিল তখনও ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। জেবের ভিতর পাখিটা আছে কিনা দেখে নিল সুবল, তারপর ছুটে গিয়ে সেই কামরার জানালায় দাঁড়িয়ে হাঁকল, টুকুন দিদিমণি, আমি স্নানটা সেরে নিলাম।

সুবলের মুখ কি সতেজ, আর কি এক গ্রাম্য সরলতা—আশ্চর্য সরল চোখ সুবলের। স্নান করার জন্য চুল থেকে এখনও টুপটাপ জলের ফোঁটা মুখে শরীরে পড়ছে। সেই লম্বা জামা গায়ে, পোঁটলা-পুঁটলি কাঁধের দু'ধারে ঝোলানো—প্রায় তীর্থযাত্রীর মত দেখতে। একটা শুকনো ডাল হাতে এবং বাঁশের চোঙটা পিঠের ডানদিকে ঝুলছিল।

টুকুন ওর সরল গ্রাম্য চোখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, সুবল, তুমি কলকাতায় গেলে আমাদের বাড়িতে এস।

—যাব দিদিমণি।

—তোমার পাখিটা কোথায় সুবল ?

—পাখিটা জেবের ভিতর বটফল খাচ্ছে দিদিমণি।

—তোমার পাখিটা আর একবার উড়বে না ?

—উড়বে না কেন ? বলে সে হাত দিল পকেটে। তারপর পাখিটাকে কাঁধে বসিয়ে দিল। তারপর এই প্ল্যাটফরমে পাখিটা সুবলের মাথার চার পাশে ঘুরে ঘুরে ফের জেবের ভিতর ঢুকে গেল।

টুকুন বলল, তুমি আমাদের বাড়িতে গেলে আমি আবার পাখির খেলা দেখব। বলতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল। সুবল একটু সময় গাড়িটার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে গেল। সুবল, টুকুন দিদিমণিকে একটা চন্দনের বীচি, একটি পাথর এবং সেই দুর্মূল্য কুঁচফল দেবে ভেবেছিল, এত তাড়াতাড়ি ট্রেন ছেড়ে দেবে তার মনে হয় নি। সে পোঁটলা খুলে দিতে গিয়ে দেখল ট্রেনটা সামান্য চলছে! সে দাঁড়িয়ে থাকল। চারিদিকে অপরিচিত জন, পাখিটা জেবের ভিতর খুঁটে খুঁটে কেবল ছোলা খাচ্ছে, আর একটা ট্রেন এসে এই মাত্র থামল প্ল্যাটফরমে। সব মানুষেরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামছে কিন্তু বড় নির্জন মনে হল জায়গাটা। যেন সেই পরিত্যক্ত মাঠ এবং পাহাড়ের মত এই প্ল্যাটফরমে শুধু হাহাকারের দৃশ্য। কোথাকার একটা ট্রেন তার প্রিয় দিদিমণিকে নিয়ে চলে গেল।

সুবলের দীর্ঘদিন পর আজ মা'র কথা মনে হল। মেলার কথা মনে হল। সুবচনী দেবীর মন্দিরে ফসল ঘরে এনে যে উৎসব হত তার কথা মনে হল—সেই মেলায় বিদেশ থেকে কত লোক আসত, বাজীকর আসত, সাপের পেটে মানুষের মুখ, একটা মানুষের তিনটে মুখ, তিনটে মানুষের একটা মুখ, বড় বড় কাঁচের বৈয়াম, আর তার ভিতর বিভুত কিমাকার সব মানুষ, অথবা মাঠের শেষ দিকে বড় তাঁবু, সার্কাসের খেলা, হাতি, বাঘ, সিংহ, একটা মেয়ে তারে ঝুলে

খেলা দেখাত। একটা ট্রেন গাড়ি তার টুকুন দিদিমণিকে নিয়ে চলে গেল—এ-সব দৃশ্য চোখের ওপর ভাসতে থাকল সুবলের। আর একটা ট্রেন এসে থেমেছে। ট্রেন চলে যাবে এবার। সুবল ধীরে ধীরে প্ল্যাটফরমে বসে ওর পোঁটলাগুলো ফের বেঁধে নিল। তারপর যাকে সামনে পেল তাকেই শুধাল, এই ট্রেন, কর্তা, কলকাতা যাবে না?

কে যেন বলল, যাবে।

সে সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে উঠে গেল। ট্রেনটা নীল রঙের। বড় হাতল ঝুলছে। সুবল বয়েস অনুযায়ী লম্বা এবং পায়ের পেশী পাহাড়ে ওঠা-নামার জন্য বড় শক্ত। সে এক পাশে ভিড়ের ভিতর একটা হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন আর মনে কোন গ্লানি নেই। ট্রেনটা ওকে কলকাতা নিয়ে গেলে সে টুকুন দিদিমণির কাছে চলে যেতে পারবে।

আর এ-সময়ই সুবলের মনে হল ভীষণ ক্ষুধা পেটে। সে তার সঙ্গের শুকনো বটফল থেকে একটা দুটো করে মুখে পুরে দিতে থাকল। সে বটফল চিবুচ্ছে আর দু' পাশের বড় বড় কলকারখানা দেখে কেবল বিস্মিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে যেন কোন এক রাজার দেশে চলে এসেছে। যেন এখানে অন্নের অভাব নেই। অন্ন চাইলেই অন্ন! জলের অভাব নেই, জল চাইলেই জল। আর ভালবাসার অভাব নেই, টুকুন দিদিমণি রাজ্যের সব ভালবাসা তার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে। তার মনে হল, কলকাতায় পা দিলেই সে রাজা বনে যাবে।

সুবল দেখল তার গাড়ি আশ্চর্য এক নগরীর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। সে চোখ মেলে যত দেখছে তত বিস্মিত হচ্ছে। বড় আশ্চর্য এক নগরী—চারিদিকে বড় বড় প্রাসাদের মত বাড়ি, সেই সুপনের রাজবাড়ির মত, কবে একবার বাবা তাকে রাজবাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, কবে একবার সে ছোটবেলায় গল্পের বইয়ে রাজবাড়ির গল্প পড়েছিল, চারিদিকে বড় বড় অট্টালিকা, চারিদিকে বাঁধানো রাস্তা।

বড় বড় দেবদারু গাছ, গাছে গাছে রূপোর পাতা, সোনার ফল, নীচে বনের ভিতর সোনার হরিণ—এ যেন সেই রাজার দেশ, লাইনের ওপর তার, আর আশ্চর্য এক লম্বা ঘরের ভিতর তার গাড়ি ঢুকে গেছে, নানারকমের নীল-লাল রঙের বাতি, বেগুনী রঙের বাতি, কত হাজার হাজার লোক, সব রাজবাড়ির রাজপুত্রদের মত ফিটফাট, কোথাও কোন অপরিচ্ছন্নতা নেই, ঝক ঝক করছে সবকিছু।

অথচ কেউ দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত গল্প করছে না, সকলে নিজের মত হেঁটে যাচ্ছে। সকলে ব্যস্ত। সকলে যেন কোথাও কোন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে। অথবা কোথাও বড় এক রাজবাড়ি আছে, সকলে সেই রাজবাড়ির উদ্দেশে ছুটছে।

সুবল ভিড়ের ভিতর দেখল ডান পাশের লোহার গেটে চেকারবাবু কার সঙ্গে পয়সার হিসাব করছেন গোপনে, মনে হল, চেকারবাবুর হাতে কে পয়সা গুঁজে দিল। সুবল দাঁড়িয়ে থাকল। ওর কাছে পয়সা নেই, টিকিট নেই। এখন টুকুন দিদিমণি নেই যে ওকে গেট পার করে দেবে। এই লোহার দরজাটার কাছে এসেই সুবলের ভয়ে পা সরছিল না। সে একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, ভিড় কমলে চেকারবাবুকে বলবে, বাবু আমার পয়সা নেই, আমার কিছু বটফল আছে, কিছু পাথর আছে আর আছে এক পাখি। আমি বাবু আমার পাখির খেলা দেখাতে পারি। বাবু পাখির খেলা দেখলে আপনি খুশি হবেন। খুশি হলে বাবু ওকে ছেড়ে দেবে এই ভেবে সুবল একটু পেছনের দিকে সরে তাকাতেই দেখল—ট্রেন, মেলা ট্রেন, কেবল ভোঁস ভোঁস করছে ট্রেন। মানুষ আর লটবহর চারিদিকে। লোহার রেলিং পার হলে ফলের দোকান। চারিদিকে এত প্রাচুর্য, এত সম্পদ, এত মানুষ, এত জল—সুবল ক্রমশঃ কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ছে।

তখন চেকারবাবু ডাকলেন, এই ছোকরা, ওখানে কি হচ্ছে। টিকিট কোথায়?

—বাবু টিকিট নেই।

চেকারবাবু দেখলেন সুবলকে এবং চেহারা দেখে না হেসে পারলেন না। ভিখারীর মত জামাকাপড় গায়ে কতরকমের পোঁটলা ঝুলছে কাঁধে, হাতে লাঠি এবং পিঠে বাঁশের চোঙ। একেবারে বহুরূপী।

অন্য চেকারবাবু বললেন, ঠিক শালা খরা অঞ্চলের লোক। উপদ্রব বাড়ছে।

—কি করে হবে! ওরা তো সব দল বেঁধে আসছে। এ তো একা।

—দল ছুট। দেখে বুঝতে পারছ না?

সুবল দেখল বাবু হু'জন ওকে দেখে খুব হাসাহাসি করছে। সুবল যেন সাহস পেল এবার। কাছে গিয়ে বলল, বাবু আমাকে ছেড়ে দিন। আমার পয়সা নেই। এই দেখুন বলে সে তার জেব উল্টে দেখাতে গেলে পাখিটা উড়ে এসে ওর মাথার ওপর বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে চেকারবাবু হু'জন বলল, শালা ভোজবাজি জানে। জেব উল্টে পয়সা নেই দেখাতে গেল আর শালার জেব থেকে পাখি উড়ে এসে মাথায় বসল। পয়সার বদলে পাখি!

চেকারবাবু বললেন, খুব তো ভোজবাজি শিখেছ।

—না কর্তা। কোন ভোজবাজি নেই। পাখি আমার পোষা। ও জেবের ভিতর থাকে। খুব নাছোড়বান্দা না হলে চোঙের ভিতর ভরে রাখি না। বলে সে পিঠ থেকে বাঁশের চোঙা এনে উল্টে দেখাল। তারপর একটু হেসে খুব বিনীতভাবে বলল, যাব কর্তা? শুকনো বটফল ছিল পোঁটলাতে, কথা বলতে বলতে হুটো একটা বটফল মুখে পুরে দিচ্ছিল।

এখন যথার্থই যেন সুবলের কোন ভয় ছিল না। কোন ডর ছিল না। চেকারবাবুরা ওকে কোন আর ভয়ও দেখাচ্ছে না, কেমন আল্লা করে পথ ছেড়ে দিলেন। সুবল পাখির খেলা দেখানোর জন্ত চেকারবাবু হু'জন বোধহয় খুশি। সে প্রায় চুপি চুপি বের হয়ে সোজা স্টেশনের

কাউন্টার পর্যন্ত হেঁটে এল। প্রায় মুক্ত এখন সুবল। সে ঘুরে ফিরে এত বড় স্টেশন দেখতে থাকল। চারিদিকের এই প্রাচুর্য ওকে জীবন যাপন সম্পর্কে আর কোন ভয় উদ্রেক করতে পারল না। যখন এত প্রাচুর্য, এত জল আর এত সুখী মানুষের ভিড় তখন সামান্য এক সুবলের আহারের জন্য ভাবনা কি। সে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে থাকল, ঘুরতে থাকল এবং ছবির মত, রাজারানীর মত আর নদীর জলের মত পরিচ্ছন্ন এই স্টেশনের চারিদিকটা দেখতে পেয়ে সে আনন্দে প্রায় শিস দিয়ে উঠল।

কোন গ্রাম্য সঙ্গীত ও শিসে বাজাচ্ছিল। আর ওর মুখের শিস শুনে পাখি পর্যন্ত আত্মহারা। পাখি এবং সুবল এমন একটা দেশে চলে এসেছে—এমন প্রাচুর্যের দেশ, ভাবল সে। বাইরে বের হতেই দেখল বড় বড় দোতালা সব বাসগাড়ি, ট্রামগাড়ি দৈত্যের মত—সেই যেন আলাদীনের প্রদীপ, যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। আলাদীনের পোষা দৈত্যের মত সব ট্রামগাড়ি। বাসগাড়ি সুবলের জন্য এবং ওর পাখির জন্য প্রতীক্ষা করছে। সুবল বলল, বোস। আমরা আসছি। কারণ ডানদিকে কিছুদূর হেঁটে গেলে জল, টিপকল থেকে কেবল জল পড়ছে।

সে জলের নীচে ফের ছুটে গিয়ে দাঁড়াল। পাখিকে জল খাওয়াল, স্নান করাল। এবং শান্তশিষ্ট বালকের মত সে তার ভিজা নেংটি কাপড়, জামা সব রেলিঙে শুকোতে দিলে।

এখন নদীর জলের ওপর সব বড় জাহাজ ভাসছে, কোথাও আকাশের নীচে লম্বা ম্যাচ বাক্সের মত বাড়ি, ডানদিকে বড় এক পুল, মাথায় সারি সারি সব পাখি বসে রয়েছে আর সব ঠেলাগাড়িতে আলু, কপি, ফুলকপি, শাকসব্জি হরেক রকমের কত তরমুজ এবং ফল যাচ্ছে। সে অপলক দেখতে দেখতে সেই বৃদ্ধ পুরোহিতের কথা ভাবল। তিনি সামান্য জলের জন্য কি না-করেছেন। পাগলের মত পাহাড়ের নীচে,

সমতলভূমিতে, নদীর ঢালু অঞ্চলে এবং পাহাড়ের গিরিপথে জলের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। হায়, যদি মানুষরা কলকাতার এত প্রাচুর্যের কথা জানতে পারত। তা হলে বুঝি তিনি সব ফেলে, তাঁর সুবচনী মন্দিরে তেলসিঁদুর ধান-দূর্বা ফেলে এখানে চলে আসতেন।

ঠিক তক্ষুনি এক বৃদ্ধ যেন সেই জনার্দন চক্রবর্তী, সে কাছে গিয়ে ভাল করে দেখাব চেষ্টা করল—না, জনার্দন ঠাকুর নয়, অন্য মানুষ, তেমনি লম্বা জোয়ান মানুষ, মাথায় সাদা চুল, চোখ বড় বড়, পায়ে হরেক রকমের রং-বেরঙের কানি বাঁধা, হাতে পায়ে গলায়! ঠিক ফকির দরবেশের মত মুখ—কেবল হেঁকে যাচ্ছে। কি হাঁকছিল বোঝা যাচ্ছে না—খুব সন্তর্পণে কান পাতলে ওর অস্পষ্ট কথা ধরা যাচ্ছে। সে দু' হাত ওপরে তুলে নাচছিল, গাইছিল এবং মাঝে মাঝে কলকাতা শহরকে যেন সে জরীপ করছে—একটা ফিতা ছিল হাতে, সে ফিতা দিয়ে কি যেন কেবল মাপছে মাঝে মাঝে। সুবল বুঝল মানুষটা তবে জনার্দন চক্রবর্তী নয়। সুবল রেলিঙ থেকে ওর জামাকাপড় তুলে নিল। তারপর এক অনির্দিষ্ট যাত্রা। এই শহর এত বড় শহর ঘুরে ঘুরে দেখা। কিছু আহারের ব্যবস্থা করতে হয়। সুবল আহার সংস্থানের নিমিত্ত চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাঁটতে থাকল।

তখন টুকুন হাসপাতালের এক ঘরে শুয়ে ছিল। জানালার পাশে টুকুনের বিছানা। স্প্রিঙের খাট। মাথার দিকটা একটু ওপরের দিকে তোলা। টুকুন সামনের জানালা দিয়ে মাঠ দেখতে পাচ্ছিল। জানালার নীচে পথ, পথের ওপর এক ফুচকাওয়ালা ফুচকা বিক্রি করছে। বড় গরম চারিদিকে। বৃষ্টি নেই, টুকুন গরমে হাঁসফাঁস করছিল দুপুর থেকে।

এখন বিকেল সুতরাং এখন ফুচকাওয়ালা ফুচকা নিয়ে বের হয়েছে। এখন বিকেল সুতরাং মাঠে মাঠে খেলার দৃশ্য আর পার্কের ভিতরে ছোট বড় ছেলেমেয়ে সব খেলতে এসেছে। ওরা ঘাসের ওপর ছুটাছুটি করছিল।

টুকুন জানালা থেকে সব দেখতে পাচ্ছে। একটা গাছে কিছু ফুল ফুটে আছে—কি ফুল হবে, বোধহয় নাগেশ্বর ফুল, ফুলের সৌরভে সব পার্কটা কেমন আমোদিত এবং বোধ হয় এই সব ফুলের সৌরভের জন্য নানা রকমের পাখি উড়ে এসেছে, পাখিগুলো উড়ছিল, পাতা উড়ছিল, পাখিগুলো উড়ে উড়ে ডালে বসছে, ঠিক যেন সব সুবলের পাখি! সুবল, এক পাখিওয়ালা সুবল এই শহরে এসে নানা জাতের সব পাখি ছেড়ে দিয়েছে আকাশে।

কিন্তু রাস্তার অন্য দৃশ্য। রাস্তার ওপর বড় মিছিল। মিছিলের আগে একটা মানুষ লাঠি হাতে হেঁটে যাচ্ছে। পেছন একদল মানুষ, ওদের হাতে নানা রঙের ফেস্টুন, ভিন্ন ভিন্ন লেখা, বাঁচার মত খাদ্য দিতে হবে, চোরাকারবারী বন্ধ করতে হবে, অথবা যেন বলার ইচ্ছা সকলের, আমাদের দাবী মানতে হবে, না মানলে সংসারে সব আগুন লাগিয়ে দেব।

অযথা টুকুন মাঝে মাঝে এমন সব দৃশ্য দেখতে পায় যা মনকে ব্যথিত করে। সামনে একটা—বোধ হয় ওটা শাল-শিমুল জাতীয় গাছ, গাছের নীচে প্রায় উলঙ্গ সব কাচ্চাবাচ্চা, প্রায় নগ্ন সব যুবক যুবতী রাতে শুয়ে থাকে। ভোর হলেই ওরা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। আর টুকুনের চোখে ঘুম নেই বলে, শেষ রাতের দিকে কেবল মনে হয় ঘোড়ার গাড়িতে অথবা গরুর গাড়িতে কারা যেন শহরে কেবল কি সব ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে আসছে চুরি করে। অথবা মাঝে মাঝে রাত গভীরে শহরের সব অলিগলিতে কিসের যেন ফিসফিস শব্দ, ওরা যেন এক ষড়যন্ত্র করছে।

ভোর হলেই টুকুন দেখতে পায় এক ছোট্ট বালক কাঁধে মই নিয়ে দেয়ালে দেয়ালে কেবল পোস্টার মেরে যাচ্ছে। ওর একদিন বলতে ইচ্ছা—এই পোস্টারয়ালা, তোমার পোস্টারে কি লেখা আছে?

হয়তো সেই পোস্টারয়ালা জবাব দেবে—কি করে বাঁচতে হয় তার কথা লেখা আছে।

আমার পায়ে শক্তি নেই, আমার শরীর ক্ষীণ হয়ে আসছে, আমি আর বাঁচব না বুঝি। পোস্টারয়ালা, তোমার পোস্টারে আমার বাঁচার কথা লেখা নেই ? টুকুনের আরও যেন কি সব প্রশ্ন করার ইচ্ছা। শাল-শিমুলের নীচে যুবক-যুবতীরা কেন রাতে শুয়ে থাকে, অন্ধ গলিতে রাতে কারা ফিসফিস করে কথা বলে, কত রকমের ভোজ্যদ্রব্য চুরি যাচ্ছে শহরে, গ্রামে, কেবল মানুষেরা আপন স্বার্থের জন্য সঞ্চয় করে যাচ্ছে, অন্যের জন্য ভাবনা নেই, এমন কেন হয়, টুকুনের ঘুম আসে না রাতে, কেবল দুঃস্বপ্ন।

মা-বাবা বিকালে আসেন, ওঁদের মুখ বড় করুণ, বাবা সারাদিন অফিস করেন, কত হাজার টাকা বাবা রোজগার করেন, বাবা টুকুনের কাছে বীরপুরুষের মত, মা বাবাকে আদৌ সমীহ করেন না, মা কেমন গোমরামুখো অথবা বাবা টুকুনকে এই যে নানা রকমের খেলনা কিনে দিয়ে যাচ্ছে— গোটা ঘর ভর্তি খেলনা, রাতে ওরা টুকুনের সঙ্গে কেবল কথা বলতে চায়, কিন্তু টুকুন সামান্য তাজা মুখ নিয়ে টুকুন যখন কথা বলতে থাকে তখন বড় বেড়ালটা মিউ মিউ করে কাঁদে। টুকুনের রাগ হয়। তুমি কাঁদবে না, কাঁদলে তোমাকে বাছা জলে ফেলে দেব।

গোটা ঘর ভর্তি খেলনা। টুকুনের মাঝে মাঝে মনে হয় খেলনা-গুলো সব নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। হাসি-মসকরা করছে। যেন টুকুনই এখন ওদের খেলনা হয়ে গেছে। কারণ টুকুন বিছানা ছেড়ে ওদের কাছে যেতে পারে না, হাঁটতে পারে না। দিনের বেলায় শুধু জানালা দিয়ে সামনের মাঠ দেখে, এবং মাঠ, গাছ, পাখি আর পথের বিচিত্র সব মানুষদের দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়। ওর তখন সব ছেড়েছুঁড়ে ছুটতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু হায়, পায়ে একেবারে শক্তি পাচ্ছে না। হায়, সেই পাখিয়ালা যে টুকুনকে হাসিয়েছিল, যার জন্য টুকুন জানি

বাজিয়েছিল এবং যে মানুষের জন্য টুকুন দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পেরেছিল, সেই মানুষের আর দেখা নেই।

টুকুনের বাঁ-দিকে বড় একটা পুতুল ছিল, টুকুন দেখল পুতুলটা যেন ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। সামান্য গোঁফের রেখা আছে পুতুলটার মুখে, পুতুলটার নামও আছে একটা, টুকুন চীৎকার করে উঠল, রাজা, এক থাপ্‌পর মারব। খুব হাসা হচ্ছে! সব খেলনাগুলো ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেল।

টুকুন সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বালিশের নীচ থেকে চন্দনের বিচি, পাথর এবং কুঁচ ফল বের করে দেখাল রাজাকে এবং অন্যান্য পুতুলগুলিও ওর দিকে যেন চন্দনের বিচি, লাল-নীল পাথর, কুঁচ ফল দেখার জন্য এগিয়ে এল। টুকুন এবার বলল, বুঝলি রাজা আমি মিথ্যা বলি না। এই দেখ, সুবল আমাকে কত কিছু দিয়েছে। সুবলকে পুলিশ ধরতে এসেছিল, আমি নিজে পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে রাজা এবং কুতুমাসী বিড়াল সকলের হয়ে আদাব দিল টুকুনকে। তারপর টুকুন তাচ্ছিল্যভরে ওদের শোনাল, দেখিস সুবল এলে আমি তোদের হেঁটে দেখাব। সুবল জাদুকর, সে জাদুর পাখি রেখেছে কাঁধে। সে পাখি উড়িয়ে দিলেই আমি তোদের কাছে হেঁটে চলে যেতে পারব।

৮

সেই এক জাদুকরের জন্য জনার্দন চক্রবর্তীও ঘুরছে। মাঠময় ঘুরছে। একা নিঃসঙ্গ মাঠে জনার্দন চক্রবর্তী রাতের অন্ধকারে অথবা ভোররাতের দিকে ঘুরছে। খরা থেকে এই মাটিকে রক্ষা করার জন্য ঘুরছে। এক প্রচণ্ড অহমিকা জনার্দনের। সুবচনী দেবীর মন্দিরে মাথা কুটছে, মা জল দাও। জল দাও। মা, জলে তুমি মাটি ভাসিয়ে দাও। মা, তোমার সন্তানেরা সব দেশ ছেড়ে চলে গেল। কেউ আর ফিরে এল না, আমি মরে গেলে তোকে কে আর ফুল-জল দেবে! কিন্তু নিষ্ঠুর সুবচনী দেবী, করালবদনী ডাইনী মুখ ব্যাদান করে আছে। লম্বা জিভে যেন জনার্দনকে ভেংচি কাটছে। শ্মশানের মত মন্দিরের চার পাশে শুধু আগুনের মত রোদ।

জনার্দন মাঝে মাঝে দেবীর কপালে হাত রাখত, কপাল ঘামছে কিনা দেখত, কপাল ঘামলে দেবী প্রসন্না হবেন।

সে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য এক রাতে হাজার বিল্বপত্র সংগ্রহের জন্য বের হয়ে দেখল, গাছে কোন বিল্বপত্র নেই। সে দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য জল তুলে আনল নদীর গর্ত থেকে কিন্তু এমন মরুভূমির মত স্থান যে জলের রঙ ক্রমশ গাঢ় হয়ে রক্তবর্ণ ধারণ করল। দেবী হা হা করে হেসে উঠে যেন ভয় দেখালেন জনার্দনকে। জনার্দন ক্ষেপে গিয়ে বলল, বল মাগি, কবে বৃষ্টি হবে, তোর কোন মরদকে ধরে আনতে হবে বল, বলে সেই নগ্ন সন্ন্যাসী অথবা কাপালিকের মত চেহারা যে জনার্দন মুখে বড় দাড়ি, নাসিকা লম্বা, আর কোটরাগত চোখ থেকে আগুন ঝরছে, সেই জনার্দন হা হা করে লাঠি তুলে তেড়ে গেল দেবীর কাছে এবং চীৎকার করে উঠল, জল, জল চাই, জল না হলে শালী তোর

একদিন কি আমার একদিন। এই ছাখ, বলে সে বড় শক্ত বাঁশের লাঠি ঘরের কোণে তুলে রাখল, জল না হলে তোর মাথা দু' ভাগ করে দেব। তোর ছেইলা কোলে নিয়া বেড়ানোর সখ ভেঙ্গে দেব।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। সুতরাং ভিতরে উত্তাপ কম। প্রায় সারাটা দিন এই মন্দিরে জনার্দন পড়ে থাকে। প্রায় সারাটা দিন জনার্দন দেবীর সঙ্গে বচসা করে, কথা বলে, মার্জনা ভিক্ষা করে, অথবা উপবীতের অহঙ্কার দেখায়। পাথরের দেয়াল বলে এবং জায়গাটা পাহাড়ের গুহার ভিতর বলে ওর চীৎকার অথবা মার্জনা ভিক্ষা কোন কাকপক্ষী পর্যন্ত টের পায় না। কোন লোক চলাচল আর নেই এ অঞ্চলে।

সে মাঝে মাঝে পাহাড়ের ওপরে উঠে দূরে ট্রেনের শব্দ শোনার চেষ্টা করে অথবা কখনও দেবীর গায়ের কাছে পড়ে থেকে মা মা বলে কাঁদতে থাকে—মা, সোনার দেশে ফসল ফলাবি না মা? কোন পাপে মাগো তোর মাটিতে আর ফসল ফলে না, বৃষ্টি হয় না।

দেবীর মুখ তেমনি নির্বিকার। ছেলের মুখ দেবীর স্তনের কাছে। কালো পাথরের মূর্তি। এক ফুটের মত লম্বা। পায়ে কপালে এত সিঁদুর যে এখন আর মুখ এবং স্তনের প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। নীচে বেদী। বেদীমূলে কিছু ধান-দূর্বা, শুকনো ধান-দূর্বা, শংখ কোষাকুসি, ঢোল ঢাক, বড় কাঁসি আর বাঘের কি হরিণের চামড়া, ব্যবহারে সব লোম উঠে গেছে, সুতরাং বাঘ অথবা হরিণ না অন্য জীব-জন্তুর চামড়ায় তৈরি এই আসন বোঝা যায় না। তেল-সিঁদুরের জন্য দেবীর মুখ সব সময়ই চক চক করছে।

জনার্দন তিক্ত হয়ে দেবীর মুখে দুটো বুড়ো আঙ্গুল ঠেসে ধরল। বলল, খা, কাঁচকলা খা। বস্তুত জনার্দন পেটে ক্ষিধে থাকলে এমন করতে থাকে। কোন খাদ্যদ্রব্য নেই। সে গত রাত্রে বনের ভিতর বন-আলুর মত লতার সন্ধানে ছিল, সে কিছু খুঁজে পায় নি। লতার

সন্ধান পেলে সে মাটি খুঁড়ে অনেক নীচ থেকে বড় থামের মত আলু তুলে আনতে পারত।

সে সুতরাং সারাদিন উপোসী থেকে দেবীর ওপর তিক্ত হয়ে পড়ছে। নিজের উপবাসই দেবীর উপবাস। নিজের দুঃখই দেবীর দুঃখ।—কি আর খাবি মা। হয়তো কিছু বটফল সংগ্রহ করেছে জনার্দন, তাই মুখে ফেলে বলল, খা মাগো, খা, এই খেয়ে পেট ভরে ফেল। কেমন লাগে মা খেতে! সে নিজে বটফল চিবিয়ে বলত, কেমন লাগে! ভাল লাগে! খা, ভাল লাগলে অমৃত বলে খেয়ে নে। সে কোঁৎ করে একটা ঢোঁক গিলত তারপর। তারপরে দেবীর মুখেব দিকে ফ্যাকাসে চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকত কিছুক্ষণ, একসময়ে হা হা করে হেসে উঠত ফের।—কেমন লাগে, অন্ন নেই, জল নেই, মানুষ নেই, জন নেই, ফুল বেলপাতা, দুর্বা-ধান কিছু নেই, কেমন লাগে! ছেইলা কোলে লৈয়া বৈসা থাকতে কেমন লাগে। চেষ্টা নেই, সাধনার ধন মা না দিলে ফসল ফলে না। বলে জনার্দন দরজাটা ফাঁক করে দেখল, বেলা পড়ে গেছে। সূর্য পাহাড়ের অন্য মাথায় নেমে গেছে।

এবার তার ফের বের হবার পালা। এখন বের হলে সব ঘুরে, পাহাড়ময় ঘুরে মাঠময় ছুটে নদীর গর্ত থেকে ভোরের দিকে সামান্য জল নিয়ে ফের সুবচনীর মন্দিরে উঠে আসা যাবে। জল তোলার আগে তেমনি সেই হরিণী তার দুই শিশু নিয়ে এসে বসে থাকতে পারে। জলের জন্য পারে সে বসে থাকত। জনার্দন উঠে আসার মুখে ওদের জল দেবে খেতে। জীবের জন্য মায়া। যেন জীব বলতে সামান্য এই হরিণ, তার দুই শিশু, কচিৎ দুটো একটা পাখি উড়ে যেতে দেখা যায়।

জনার্দন আকাশের দিকে চোখ তুলে অনেকক্ষণ পাখির আকাশে ওড়া দেখে, কোথায় কোন টুকরো মেঘ আকাশের কোলে ভেসে আসছে কিনা দেখে, আর হা-অন্নের জন্য দু'হাত তুলে যেন হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়, একটি ম'ল জলে ডুবে রইল বাকি নয়, জনার্দন

ডুবে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া ছেলের মত মাঠময় পাহাড়ময় শুধু নদীর কোথায় জল সঞ্চয় করে রাখলে সম্বৎসর এই অঞ্চল জলে ভরে থাকবে, তাই অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

সুতরাং রাতের বেলায় জনার্দনকে চেনা যায় না। মানুষ বলে চেনা যায় না। এক দৈত্য আলখেল্লা পরে অথবা এক কাপালিক মাথায় পাগড়ী বেঁধে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জল, মাগো জল চাই। এমন এক অঞ্চল মা, জলের ব্যবস্থা থাকলে আর কোনকালে এখানে দুর্ভিক্ষ হবে না, সময়ে জল চাই ফসলের গোড়ায়।

নদীর নীচে জমি, বাঁধ দিলে জল থাকে, এমন এক জায়গার সন্ধানে ছিল জনার্দন যেখানে অল্প আয়াসে বাঁধ দিলে সব জল বর্ষায় নেমে যাবে না, কিঞ্চিৎ জল থেকে গেলেই এ অঞ্চলের খরা নিভে যাবে। সেজন্য জনার্দন প্রায় পাগলের মত পাহাড়ের ঢালুতে, বাদে এবং নদীর উৎরাইয়ে রাতের অন্ধকারে অথবা যখন জোৎস্না থাকত, চাঁদের মরা আলোতে জনহীন প্রান্তর ভীষণ মনে হত তখন জনার্দন দাগ কেটে আপন উদ্যম, সফল উদ্যম মিলিয়ে নদীর তটে বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিত। বটফল, বন আলু এবং ক্বচিৎ কোথাও মৃত পাখি অথবা জীব মিলে গেলে তার মাংস জনার্দনের খাদ্যবস্তু ছিল।

জনার্দন মাঠময় ঘুরে পাহাড়ময় ঘুরে বুঝি সেই স্থান সেই সংযোগ-স্থলের সন্ধান খুঁজে পেয়েছিল। সে রাত হলেই বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিত, নদী এখানে বড় সরু পথ কেটে নেমে গেছে। দু'ধারে পাহাড়, উঁচু মত পাহাড়, জল নেমে গেলে পাহাড়ের ভিতর হ্রদের মত জল ধরে রাখবে, শুধু খাদে বড় কিছু পাথর ফেলে দিতে হবে, হাজার পাথর, লক্ষ পাথর। জনার্দন শিশু বয়সের কবিতা আওড়াত—উদ্যম-বিহনে কিবা পূরে মনোরথ। শুধু উদ্যম চাই, সফল উদ্যম।

সে একটা পাথর টেনে আনত আর বলত উদ্যম চাই, উদ্যম। মা, মাগো, শক্তি দে। সে আবার পাহাড়ের মাথায় পাথর দোলাত,

তারপর পাথরটা নীচে ফেলে দিত, মাগো উদ্যম চাই, উদ্যম। সে সারারাত এই করে ভোরের দিকে হরিণ শিশুদের জলের ব্যবস্থা করে, নিজের জন্য সামান্য জল তুলে সুবচনীর মন্দিরে উঠে যেত। ওঠার সময় শুনত, মা-ও যেন বলছেন, উদ্যম চাই জনার্দন, আমরা বড় উদ্যমবিহীন হয়ে পড়েছি।

টুকুনের ঘরেও সেই এক কথা। ডাক্তারবাবু, নার্স, টুকুনের বাবা এবং মা বসেছিলেন। টুকুন এই সময়টাতে একটু হাত-পা মেলে বসার চেষ্টা করে। মা-বাবাকে দেখলে কেমন যেন মনটা নরম হয়। ডাক্তারবাবু ভালবাসার হাত রাখেন টুকুনের মাথায়।

নার্স, টুকুনের বেণী বেঁধে দেবার সময় নানা রকমের পাখির গল্প করে থাকে। ফুলপরী, জলপরী, স্থলপরী, দেবস্থানে এক রকমের পরী থাকে, ভগবানের কাছে অন্যরকমের পরী, আর ডাক্তারবাবু বলছিলেন, সব পাখির এক কথা টুকুন, উদ্যম চাই, বাঁচার উদ্যম। ডাক্তারবাবু টুকুনের বাবাকে বলেছিলেন, মেয়েটার সব উদ্যম শেষ হয়ে গেছে যেন। বেঁচে থাকার স্পৃহা জন্মানো দরকার ওর ভেতরে। নতুবা একদিন শুকিয়ে মেয়েটা কাঠ হয়ে যাবে। কিছুতেই বাঁচানো যাবে না।

সুতরাং এক বাঁচার উদ্যম এই সংসারকে নিয়ত গতিশীল করে রেখেছে। টুকুনের বাবা বললেন, মা, তোমার জন্য আমরা আর কি কি করতে পারি!

টুকুন বলল, বাবা, আমার জন্য একটি ফুলপরী কিনে আনবে।

বাবা টুকুনকে ফুলপরী এনে দিয়েছিলেন।

টুকুন বলল, বাবা, আমাকে একটা খরগোস কিনে দেবে।

বাবা তাই কিনে দিলেন। আর এভাবেই টুকুনের ঘরটা খেলনায় ভরে গেল। কি নেই এখন টুকুনের ঘরে, জলপরী আছে, ফুলপরী আছে, রাজা আর কুট্টমাসী বিড়াল এবং সেই এক বন্দুকধারী সিপাই। টুকুনের বাবা টুকুনের জন্য কোন অভাব রাখে নি। যা চেয়েছে টুকুন,

বাবা সব এনে দিয়েছেন। যেন এখন শুধু টুকুনের জন্য এক রাজপুত্র ধরে আনা বাকি। এনে দিলেই টুকুন এই ঘরের ভিতর স্বর্গরাজ্য তৈরি করে ফেলবে। কারণ টুকুন যেন কি করে জেনে ফেলেছিল—সে মরে যাবে। মরে গেলে মানুষ কি হয়। টুকুনের কি হবে অথবা মৃত্যুর পর টুকুন নিশ্চয় এমন এক স্বর্গরাজ্যের ভিতর প্রবেশ করবে যেখানে তার এই জগৎ থাকবে আর কে থাকবে! সেই সুবল নিশ্চয়ই থাকবে, পাখিয়ালা সুবল, কাঁধে পাখি নিয়ে। বড় পাঁচিল থাকবে একটা, কারণ যারা নরকে যায় তাদের জন্য পাঁচিলের ওপাশে যমপুরী। যমপুরীতে ভূতপ্রেত থাকে। সুবল পাঁচিলের ধারে এসে উঁকি মারলে সে হাত ধরে-তাকে তুলে নেবে। তখন বাবা-মা কিছু বলতে পারবে না। সুবল এলেই প্রায় যেন সবকিছু ওর হয়ে যায়। সে হেঁটে চলতে ফিরতে পারবে। সুবলের জন্য তার ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছিল।

টুকুন বলল, বাবা, সুবল বলেছিল কলকাতায় আসবে?

বাবা বললেন, কে সুবল?

—বা, তুমি দেখ নি, ট্রেনে যখন ফিরছিলাম, সেই সুবল, পাখিয়ালা সুবল, আমাদের সঙ্গে আসছিল। মা ওকে একটা স্টেশনে নামিয়ে দিলেন!

টুকুনের বাবা এতক্ষণে মনে করতে পারল!

ডাক্তারবাবু বললেন, কি ব্যাপার সুরেশবাবু?

—আর বলবেন না। আমরা ফিরছিলাম সিমলা থেকে। ট্রেনটা যখন বাংলায় ঢুকছে, রাতের বেলা, কোথাকার সব কতগুলি লোক, কংকালসার চেহারা, আমাদের ট্রেনটাকে আটকে দিল। বলল, জল চাই, জল চাই। বোধহয় খবরটা পত্রিকায়ও পড়ে থাকবেন।

—হাঁ, সেই খরার খবর! জল নেই নাকি দেশটাতে।

—ওরা ট্রেনে উঠে কল খুলে সব জল খেয়ে নিচ্ছিল।

—তারপর!

—তারপর আর কি। ড্রাইভার ভীষণ চালাক। লোকগুলি সব জল যখন চেটে চেটে খাচ্ছিল, সে মশাই জল খাওয়া দেখলে আপনি ভয় পেয়ে যেতেন, জল এভাবে খায় আমার জানা ছিল না, যেন অমৃত পান করছে অসুরেরা। জলের অপর নাম জীবন, সেদিন ট্রেনে প্রথম বুঝেছিলাম। ড্রাইভার দেখল জলের নেশায় পাগল, ড্রাইভার বুদ্ধি করে ট্রেন সহসা ছেড়ে দিল। ব্যস।

—সব নিয়ে রওনা হলেন ?

—হ্যাঁ, প্রায় তাই। দলের মধ্যে সুবল ছিল। সুবল আমাদের কামরায় ছিল। ওর একটা পাখি ছিল সঙ্গে, কিছু কীটপতঙ্গ ছিল, শুকনো বটফল ছিল পুঁটলিতে, সে তার পোষমানা পাখি উড়িয়ে দিয়েছিল, পাখিটা উড়লে টুকুনকে আমরা হাততালি দিতে দেখেছিলাম।

ডাক্তাবাবু বললেন, সে এখন কোথায় ?

—জানি না। ব্যাণ্ডেল স্টেশনে দেখি সে নেই।

টুকুন বলল, মা ওকে নামিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, আপনারা দেখেছেন টুকুন হাততালি দিয়েছে ?

—হ্যাঁ, আমাদের চোখের সামনে।

—তুমি সে কথাটা বল। টুকুনের মা টুকুন যে স্বপ্ন দেখেছিল তার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা ডাক্তারবাবু, ট্রেনে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সুবল দরজার এককোণায় পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বসেছিল। অন্য স্টেশনে ট্রেন এলে পুলিশ তাড়া করেছিল লোকগুলিকে। সুবল আমাদের কামরায় আছে, টুকুন বলছিল, সে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। এটা স্বপ্নের মত ঘটনা, হয়তো টুকুন স্বপ্ন দেখেছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, ওর সে সময় বাসনা, তীব্র বাসনা, বাঁচার তীব্র বাসনা, জীবনের সুখ-সম্পদে কি কোথায় জীবনের তৃষ্ণা রয়েছে সামান্য সময়ের জন্য বোধহয় ভিতরে ওর সেই তৃষ্ণা জেগেছিল। এই

তৃষ্ণা কি করে ফের জাগানো যায়। বেঁচে থাকার তৃষ্ণা, রক্তের ভিতরে তুফান, বুঝলেন সুরেশবাবু, সেই তুফানের কথাই বলছি, রক্তের ভেতরে তুফান তুলে দিতে হবে, ঢেউ, যাকে আমরা তরঙ্গ বলি, বেঁচে থাকার জন্য এই তরঙ্গ তুলে দিতে পারলে আবার টুকুনকে বাঁচাতে পারব। সুবল সেই পাখিয়ালা হয়তো সেই রক্তে সামান্য দোলা দিতে পেরেছিল ; ডাক্তারবাবু প্রায় সব কথাই বিশেষ করে রুগী সম্পর্কে কথা এলে ইংরেজিতে বলেছিলেন। সুতরাং টুকুন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল, সে স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছে না। সে শুধু বলল, মা, আমি জল খাব।

—সেই এক উদ্যমের কথাই বলছি ডাক্তারবাবু। কথাটা বলে ফের কেমন অন্যমনস্ক হলেন। এবং নিজেকেই নিজে বললেন, আমরা বড় উদ্যমবিহীন হয়ে পড়ছি, সুরেশবাবু।

বিকাল মরে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু ওপারে উঠে গেলেন। সুরেশবাবু এবং টুকুনের মা চলে গেল। নার্স সামান্য দুধ গরম করার জন্য কিচেনের দিকে গেছে। বাইরে আলো জ্বলে উঠল। ঘরে হলুদ রঙের আলো, এখন এই ঘরের চারপাশে সব পুতুল, জলপরী, স্থলপরী। আর কেউ থাকবে না এখন সুতরাং পুতুল এবং এইসব পরীরা সন্ধ্যার পর টুকুনের সঙ্গে ঘর-সংসার আরম্ভ করে দেয়। টুকুন আপন মনে কথা বলে চলে, এই রাজ্যে তখন টুকুন রানী অথবা রাজকন্যার মত। সব পরীদের, সে জলপরী অথবা স্থলপরী হোক, সে রাজা অথবা কুহুমাসী বিড়ালই হোক টুকুনের কথায় উঠতে বসতে হবে। এদিক ওদিক হলে রক্ষা থাকবে না। পরদিন ভোরে নার্সকে বলবে, মাসি বেড়ালটাকে ঘরের বার করে দাও। সারারাত ওটা আমাকে ঘুমুতে দেয়নি, কেবল জ্বালাতন করেছে।

সুবল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলল, পাখি তুমি বড় জ্বালাতন করছ। উড়ে গেলে আসতে চাও না।

পাখিটা সুবলের মাথায় মুখে ঘুরতে থাকল। যেন পাখিটা সুবলের অভিমান ধরতে পেরেছে। অভিমান ভাঙ্গানোর জন্য নানা-ভাবে সে সুবলকে খুশী করার চেষ্টা করছিল উড়ে উড়ে।

সুবলকে এখন দেখলে প্রায় চেনা যায় না। সে কি করে ইতিমধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে ফেলেছে। ওর বাঁ হাতে ছোট কাঠের বাক্স, বাক্সের ভিতর জুতোর ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের কালি, ব্রাস, ক্রিম এবং ছোট একটা তোয়ালে। ওর চুল আর বড় নেই, টিকি এখন আরও ছোট করে ছাঁটা। বড় লম্বা জামা আর শরীরে ঢল ঢল করছে না, সুবল প্যাণ্ট পরছে একটা, গেঞ্জি গায়ে দিয়ে সমস্ত সকালে জুতো পালিশ করে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। সে গাছের নীচে শুয়েছিল। পাখিটা ঘাসের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। সে কিছু চানা কিনে নিজে খেয়েছে, পাখিটাকে খাইয়েছে।

পথের ওপাশে বড় বড় প্রাসাদের মত বাড়ি। সে ঘাসের উপর শুয়ে বড় সব বাড়ি দেখছিল। জানালায় কত সুন্দর মুখ, সুন্দর মুখ দেখলেই টুকুন দিদিমণির কথা মনে হয়। সে প্রথম ভেবেছিল। কলকাতা গেলেই টুকুনদিদিকে পাওয়া যাবে, সে সেই ডাবয়ালাকে অর্থাৎ সুবল কতদিন সেই ডাবয়ালার ডাব নৌকা থেকে তুলে এনেছে পারে, ডাবয়ালা খুশী হয়ে পয়সা দিয়েছে, তাকে একবার বলেছিল, তুমি জান ডাবয়ালা টুকুনদিদিমণি কোথায় থাকে? লোকটা রাস্তার নাম এবং নম্বর চাইতেই বুঝেছিল সুবল, টুকুনদিদিমণিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, এত বড় সহরে টুকুনদিদিমণি হারিয়ে গেল।

এত বড় সহর দেখে সুবলের বিস্ময়ের আর সীমা ছিলনা। মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন জনার্দন চক্রবর্তী ওদের প্রিয় পুরোহিত, গ্রামের এবং অঞ্চলের বাঞ্ছিত পুরুষ যিনি প্রায় সব ধর্মের নিয়ামক, তেমন কোন অসীম এবং অপরিমেয় শক্তিশালী মানুষ, অথবা সে যাদুকর হতে পারে, পীর পয়গম্বর হতে পারে যিনি এই সহরকে চালাচ্ছেন। মোড়ে মোড়ে

পুলিশ, প্রাসাদে-প্রাসাদে উর্দিপরা দারোয়ান, হাওয়াই গাড়ি, ট্রাম এবং স্রোতের মত মানুষের মিছিল। সন্ধ্যা হলে রাস্তার সব আ'লো জ্বলে উঠছে। গাড়িগুলো মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আবার চলতে সুরু করেছে এতটুকু ফাঁকা জায়গা পড়ে নেই। কেবল বড় বড় অট্টালিকা আর গম্বুজের মত রহস্যজনক মীনার সুবলকে বড় বেশী আবেগধর্মী করে তুলছে।

আর মনে হত এই সহরে টুকুনদিদিমণি আছে। এই সহরের কোথাও না কোথাও টুকুনদিদিমণি আছে। সুতরাং সুবল যখনই সময় পেত, পথ ধরে হেঁটে যেত, গাড়ি দেখলে এবং ফ্রক পরা মেয়ে দেখলে চোখ তুলে তাকাত যদি টুকুনদিদিমণি হয়, যদি টুকুন তার জন্য কোন জানালায় মুখ বার করে রাখে। সে ভোরের দিকে কাজ করত, সুবল একা মানুষ। কোন আত্মীয় নেই, বন্ধু-বান্ধবহীন সুবলের আয় থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় হলে সে বাসে উঠতে পারছে, সে ঘুরে ঘুরে কাজ করছে।

সে কখনও এক জায়গায় বসছে না, প্রায় সহরটাই যখন মেলার মত, প্রায় সহরটাই যখন উৎসবের মত সেজে আছে, এবং যেখানে বসা যায় সেখানেই দু'পয়সা সংগ্রহ হচ্ছে তখন এক জায়গায় বসে কি লাভ। এই ঘোরা, কাজের জন্য ঘোরা এবং টুকুনদিদিমণির জন্য ঘোরা সুবলের একটা বাই হয়ে গেল। শুধু দুপুর হলে সে গড়ের মাঠে চলে আসত। এ সময় সুবলের প্রিয় পাখি আকাশে উড়তে চায়। পাখিটা না উড়লে ওর পা স্থবির হয়ে যাবে, পাখি স্থবির হয়ে যাবে ভেবেই সুবল ঠিক দুপুরে, যখন রোদে খা খা করছে সারা মাঠ, যখন দুর্গের উপর কবুতর ওড়ে এবং যখন প্রায় পাখিরা দুপুরের অবসাদে গাছের ডালে অথবা অন্য কোন ছায়ায় চুপটি মেরে ঠোঁট পালকে গুঁজে পড়ে থাকে তখন সুবল আকাশে পাখিটাকে উড়িয়ে দেয়। পাখিটা উড়তে উড়তে কোথায় যেন চলে যায়। আর দেখা যায় না।

রোদের জন্য আকাশের দিকে বেশীক্ষণ চোখ তুলে তাকাতে পারেনা সুবল। সে পাখিটার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। ওর এক হাতে বাক্সটা তখন খোলা, অন্য হাতের মুঠোয় সে রোদের ভিতর আনেকটা ঠিক আকবর বাদসার মত হাতের মুঠোয় পাখি রাখার জন্য গর্বে আত্মহারা। অথবা পাখী উড়ে উড়ে যখন ক্লান্ত হয়, পাখি যখন সুবলের কাছে ফের ফিরে আসে এবং মুঠোয় বসে চারিদিক তাকায় তখন সুবলের এক প্রশ্ন, টুকুন দিদিমণিকে পেলি ?

পাখি পাখা ঝাপটাল, ফের উড়তে চাইল। সুবল বুঝল, না টুকুন দিদিমণিকে পাখিটা খুঁজে পায়নি। সুতরাং সে বলত, বেশ হয়েছে বাপু, এবার চল চুপটি করে আমার কাঁধে বসে থাকবে। এখন আর রোদে রোদে তোমার ঘুরতে হবে না।

এই পাখি যেন সব বোঝে। সুবলের দুঃখের দিনে এ পাখি ছিল, সুখের দিনেও এই পাখি। সে বলল, টুকুন দিদিমণি কোথায় যে গেল!

পাখি বলল, কিচ কিচ। পাখি সুবলের সঙ্গে কথা বলতে চাইল।

সুতরাং সুবলের এখন এক কাজ। টুকুনকে খুঁজে বের করতে হবে। কোন ঠিকানা নেই টুকুনের। এত বড় শহর তবু সুবল হার মানল না। সকালের দিকে দুজনের মত রোজগার হয়ে গেলেই সুবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। জানালায় জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে, পার্কের ভিতর ফ্রক পরা মেয়ে দেখলে টুকুন দিদিমণি যদি হয়, সে প্রায় পাগলের মত এই শহরে টুকুনকে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে, পার্কে, বড় রাজপথ, গঙ্গার ধারে, এবং বড় বড় বাড়িতে উঠে যেত কাজ নিয়ে। সে কাজের ফাঁকে শুধু কিসের প্রত্যাশা করত যেন।

সুবল ওর পাখিকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল অনুসন্ধানের জন্য। যখন ওর শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ত, যখন অবসাদে শরীর চলতে চাইত না, সুবল ওর পাখিকে ছেড়ে দিত, দেখ যদি তুই কোথাও টুকুনকে খুঁজে পাস। সুবল এক সরল বালক, পাখি এক অবলা জীব, শহরের

মানুষেরা সুবলকে দেখলে এবং ওর পাখি দেখলে কৌতুক বোধ করত। সুতরাং সুবল পাখিটার জন্য একটা দাঁড় কিনে নিয়েছে। পাখিটা চড়ে বসে থাকত। সুবল মাঝে মাঝে যখন হাতে কাজ থাকত না আর ঘুরে ঘুরে আর শরীরও যখন দিচ্ছে না, তখন বলত, পাখি তুই আগে ছিলি কার?

পাখি বলত, কি বলত—সরল না হলে বোঝা যায় না, পাখি বলত বুঝি রাজার।

সুবল মনে মনে এবার বলত, এখন কার?

—এখন তোমার।

—হ্যাঁ তবে দেখ উড়ে, সেই দিদিমণি আমাদের কোথায়! তারপর পাখি উড়তে থাকত। দেওয়ালের পাশে, জানালায়, অথবা সদর পথে এক সোনার পাখি উড়ে যেত। পাখির সরল চোখ জানালায়, ঘরের ভেতর এবং রুগ্ন যুবক যুবতী অথবা ছোট মেয়ে দেখলে শিয়রে বসে দেখত সেই টুকুন কিনা। সুবলের পাখি, ভালবাসার পাখি হয়ে শহরময় উড়ে বেড়াচ্ছে। পাখি, উড়ে উড়ে কত দৃশ্য দেখতে পেল, শহরের বড় লাল বাড়িতে কারা যেন জড় হয়েছে, রাস্তায় মানুষের কি ভিড়, আর পুলের উপরে সম্রাট সিজার যেন মিশর দেশ জয় করে ফিরছেন, এক অলৌকিক ঘটনার মত, পাখী এসে দাঁড়ে বসে গেল এবং কিচ কিচ করে উঠল।

সুবল বলল, পেলি না।

পাখি কিচ কিচ করে উঠল।

—না পেলে আর কি করবি।

সুবল বলল, টেরিটি বাজার থেকে তোর জন্য কীট পতঙ্গ কিনে এনেছি। খা। বলে সুবল দাঁড়ের উপর ছোট পেতলের বাটিতে কীট পতঙ্গগুলো রেখে দিল।

আর তখনই মনে হল শহরের উপর দিয়ে দলে দলে লোক ছুটছে,

ওদের কণ্ঠে চীৎকার, অন্ন চাই, বস্ত্র চাই। সুবলের মনে হচ্ছিল ওরা সব বলছে সকলে, শুধু বলছে না, উদ্যম চাই। আমরা কেমন যেন উদ্যমবিহীন হয়ে পড়ছি, একথা কেউ বলছে না।

সুবলের ইচ্ছা হল চীৎকার করতে, বলুন আপনারা উদ্যম চাই। উদ্যম। উদ্যম বিহনে কিবা পূরে মনোরথ। পাঠশালায় জনার্দন ঠাকুর ওদের পড়াতো, উদ্যম বিহনে কিবা পূরে মনোরথ।

সুবলের এই করে শহরটা প্রায় ঘোরা হয়ে গেল ক্রমশ। শহরের সর্বত্র সে এক উদ্যমবিহীন জীবন দেখতে পেল যেন। অফিসে, কাছারীতে, মাঠে ময়দানে এবং সব নেতা গোছেব মানুষদের মুখেও সব কথার উল্লেখ আছে, শুধু উদ্যমবিহীন হয়ে পড়েছি, এ-কথা কেউ বলছে না। অফিসে কাছারীতে এবং বড পার্কের ভিতব মানুষের কথাবার্তা থেকে এ সব ধরতে পারত।

সকলের কথায় কি এক আক্রোশ যেন, কেউ সুখী নয়, এত বড় কলকাতা শহর দেখে সে যা ভেবেছিল, সুখের নগবী, দুঃখ নেই, অভাব নেই, জল, অন্ন-বস্ত্র সব কিছু আছে যখন, যখন আলোময় এই শহর, যখন বড় বড় গীর্জাব হলঘরের মত হোটেল ঘর, দেব দেবীর মন্দির রয়েছে, মানুষের দুঃখ তখন থাকার কথা নয়।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এখানে শুধু দুঃখই আছে, ফুটপাতে মানুষের দৈন্য, পাগলের প্রাদুর্ভাব বড় বেশী শহরে। এই দুঃখের নগরীতে সুবলের যেন আজকাল আর ভাল লাগছে না। ওর মনে হল সেই সব বর্ষিেব দিন, মাঠে মাঠে ধান, গোয়ালে গরু, সে গরু নিয়ে মোষ নিয়ে বের হয়ে গেছে মাঠে, মাঠে মাঠে ফসলের দিনগুলি অথবা আদিগন্ত সবুজ মাঠ শুধু, সে দৌড়ে বেড়াত, মাঠের ভিতর কেবল কি যেন এক রহস্য। গ্রামের অন্য রাখাল বালকের সঙ্গে গুলি খেলা, কোন বড় অর্জুন গাছের নীচে বসে থাকা, অথবা বুড়ো মানুষ হরিপদর মুখে—অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যাওয়া—হায়

সেই দেশে কি করে এমন খরা এসে মরুভূমির মত হয়ে গেল, সুবল চোখ বুজে বলল, মা সুবচনী জল দে। যদি জল হয়, যদি খাদ্য হয়, যদি মাঠে মাঠে ফের গরু মোষ নিয়ে বের হওয়া যায়, কিন্তু কে খবর দেবে, কে বলবে, দেশটাতে ফের বর্ষা নেমেছে, দেশটাতে আবার সোনার ফসল ফলবে—কার এমন উদ্যম আছে—ফের মাঠে সোনাব ফসল ফলায়, বরিষের দিনের জল কোথাও ধরে রাখে, অজন্মা অথবা খরা এলে সেই জলে মানুষ স্নানাহার করবে।

৬

পাখি উড়ছিল আকাশে, সুবল ঘুরছিল পথে পথে। টুকুন বসে রয়েছে নিজের জানালায়, আর জনার্দন মাঠ ভেঙ্গে নেমে আসছে। নদীর চোরা স্রোতের ওপর বন থেকে হরিণী ওর দুই বাচ্ছা নিয়ে নিশ্চয়ই এখন অপেক্ষা করছে।

জনার্দন খুব পা চালিয়ে হাঁটছিল। সারারাত পাহাড়ের উপর কাজ গেছে। পাহাড়ের মাথা থেকে বড় বড় পাথর ফেলে যোজকের মত ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিচ্ছে। পাগলের প্রায় কাজ কর্ম। কি হবে, যদি এই অঞ্চলে বৃষ্টি হয়, যদি নদী জলে ভেসে যায়, এবং পাহাড়ে ভিতর হ্রদের মত স্থানটুকু জলে ভেসে যায়, তবে কার সাধ্য, এই জল সামান্য আলগা পাথরে আটকে রাখে।

তবু এক বিশ্বাস, এই উপবীতের অহঙ্কার—এর এই কাজ, উদ্যম এবং আত্মত্যাগ মন্ত্রের মত শুভ দিনের জন্য প্রতীক্ষা করবে। জল হবে দেশে, ঘরে ঘরে মানুষ-জন ফিরে আসবে, সে এই জল নিয়ে চরণামৃত করবে মা সুবচনীর, এবং মাঠে মাঠে তাই ছড়িয়ে দিয়ে হাঁকবে, শস্য শ্যামলা দেশে আমার সুবচনী মায়, ছেইলা কোলে লৈয়া বাড়ি বাড়ি যায়। দুর্ভিক্ষ এবং খরার দিনেও জনার্দন প্রায় একটা সুখের স্বপ্ন দেখে ফেলল।

সে দেখল যেন সেই পাহাড়ের ওপর বিরাট এক জলাশয় গড়ে উঠেছে। এক হ্রদ, চার পাশে কত গাছপালা, নীচে কত জীবজন্তু বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। আরও নীচে সমতল মাঠ, কোঠা বাড়ি, ছোট ছোট নালার মত খাল সমস্ত অঞ্চলটাকে জালের মত ঘিরে রেখেছে। মানুষ তার প্রয়োজন মত জল নিচ্ছে নালা থেকে, এবং সময়ে শস্য হবে,

জলের জন্য শস্য হবে, আর সারা গ্রামময়, অঞ্চলময় কোন বিষাদ থাকছে না, শুধু গাছ পালা পাখি, নদীতে জল, হ্রদে জল, মাঠের মাঝে যে সব খাল হ্রদ থেকে নেমে এসেছে সেখানে জল, আর জলে কত গাছ, মাঠে কত সোনার ফসল, সুবচনী দেবীর মন্দিরে মেলা বসেছে। দূর দেশ থেকে মানুষ এসেছে সওদা করতে, নটুয়া এসেছে গান গাইতে, কবি এসেছে কবিগান শোনাবে বলে। বাজীকর এসেছে যাদু দেখাবে বলে, ছোট বড় শিশুরা যুবকেরা যুবতীরা মাথায় ফেটি বেঁধে ছুটছে মেলায়, যুবতীরা হেসে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, কাঁচের চুড়ি কিনছে দু পয়সায় আর মেলার প্রাঙ্গণে বড় নিশান উড়ছে—উদ্যানবিহনে কার পূরে মনোরথ।

জনার্দন বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে নীচে সেই সামান্য জলাশয়ের উদ্দেশে হাঁটছে এবং স্বপ্ন দেখছে। হরিণী আর তার দুই শিশু সন্তান প্রতীক্ষারত। জলের জন্য ওরা দূরের কোন সংরক্ষিত বন থেকে নেমে আসে। ওরা জলপানের জন্য ভোর রাতের দিকে নেমে আসে এবং ভোরেই জল পান করে চলে যায়। সুতরাং জনার্দন পা চালিয়ে হাঁটছিল। ওর হাতে একটা ছোট পেতলের বালতি, ফেরার পথে সামান্য জল নিয়ে সুবচনীর মন্দিরে উঠে যাবে।

ভোরে জলপান করানো তার কাজ, সে নেমে এসে কিছুক্ষণ ওদের তিনজনকে দেখল। হরিণী নির্ভয়ে জিব বের করে নাক থেকে কিছু ঘাম চেটে নিল। হরিণী এতক্ষণ শুয়ে ছিল। জনার্দনকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। পাশে তার দুই শিশু হরিণ ঘোরাফেরা করছে। লাফাচ্ছে। ছুটে দূরে চলে যাচ্ছে। মুখ উঁচু করে কি দেখছে। ফের নেমে আসছে নীচে ঠিক মায়ের কাছে, আর পেটের নীচে এসে গুঁতো মারছে। সামান্য স্তন থেকে দুধ খাবার জন্য মুখ বাড়ালে, এখন নয় এখন নয় এমন ভাব হরিণীর চোখে। সে তার পিছনের দুপা দিয়ে ওদের সরিয়ে দিচ্ছে। তারপর সেই শিশু হরিণেরা মায়ের কাছে

বিমুখ হয়ে জনার্দনের পায়ের কাছে দাঁড়াল। জনার্দন ওদের একজনকে তুলে নিল বুকে, অন্যজন মুখ উঁচু করে জনার্দনকে দেখতে থাকল।

—অভিমান! জনার্দন অন্য শিশু হরিণকে বাঁ হাতে তুলে এনে দুগালে দুজনের মুখে লেপ্টে দিল।—কিরে তোদের কি ভয় হয় না। জনার্দন বলল। তোদের মানুষকে এখন ভয় নেই। তোরা এত দূর থেকে চলে আসিস কষ্ট হয় না।

হরিণী তার দুই শিশুর সঙ্গে এই মানুষেব ভালবাসাটুকুতে খুব খুশী, সে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। এবার একেবাবে শরীর ঘেঁসে দাঁড়াল। জনার্দন বলল, কতক্ষণ লাগে যেতে ? বলে তাব কোল থেকে ওদের নামিয়ে দিয়ে বলল, এখন আব লাফানো ঝাপানো নয়। এবার জল খেয়ে সূর্য ভাল করে না উঠতে মানুষের এই অঞ্চল ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও। আমার অনেক কাজ আছে, ও দিকে মা আমার প্রত্যাশায় বসে থাকে, কেবল কি খাবে কি খাবে করে সারাদিন। জনার্দন তার কথা নালিশের মত করে যেন ওদের শোনালো, তুই মেয়ে ছেলে খরা এনে দেশটাকে শ্মশান করে দিলি, এখন কেবল খাব খাব করলে চলবে কেন!

ভিতরে ভয়ঙ্কর ক্ষুধা জনার্দনের। যখন খিদে পায়, যখন পেটের ভিতরটা সামান্য আহারের জন্য ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে তখন পাগলের মত সুবচনী দেবীর উদ্দেশ্যে গাল পাড়তে থাকে।—খাবি খাবি। সব খেয়ে তবে তোর শান্তি। আমাকেও খাবি। জনার্দন জল খেল। জল খেলে পেটের যন্ত্রনাটা সামান্য সময়ের জন্য কমে যায়।

মন্দিরে আর আহার বলতে কিছু নেই। আলুর লতা এখন পাহাড়ে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জল নিয়ে নদীর পারে সে উঠে এল। হরিণী তার দুই শিশু নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের ওপারে যে সংরক্ষিত বন রয়েছে তার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে।

সে কিছুক্ষণ অপলক ওদের উঠে যাওয়া দেখল। ভিতরে ক্ষুধার কষ্ট, কোন মৃত পাখি পর্যন্ত সে খুঁজে পেল না, না শুকনো বট ফল। সে ভাবল—দূরে যে সব কুড়ে ঘর রয়েছে, যা এখন শ্মশানপুরীর মত খা খা করছে—সেখানে উঠে গেলে হয়। ঘরের ভিতরে যদি খুঁজে কিছু সংগ্রহ করতে পারে। যদি কেউ দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় রেখে মারা যায়। জনার্দন এবার মা মা বলে দ্রুত হাঁটতে থাকল। এই অঞ্চল লোকালয়বিহীন। সুতরাং এখন সে প্রায় নগ্ন। সে প্রায় বেহুঁস। সে ওপরে উঠে যাচ্ছিল, আর বম বম করছিল। মা, তারা শশ্মানীকে বলছিল, তুই মা আর কত কষ্ট দিবি জীবকূলকে এসব বলছিল! মা তাবা ব্রহ্মময়ী! ওর চলতে চলতে মনে হল, মা তারা ব্রহ্মময়ী তার সামনে ডাইনীর মত দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জীর্ণ কুটীরের দিকে উঠে যেত বসেছিল। সে, বলল পথ ছাড়। তুই ভেবেছিস ভয় দেখিয়ে আমাকেও দেশছাড়া করবি। তুই জানিস না জনার্দন কত অহঙ্কারী মা। মা তোর একদিন কি আমার একদিন। আমি মা দেখব তোর সন্তানকে তুই আর কত কাল নিরন্ন রাখবি! দেখব, দেখব, দেখব। জনার্দন দ্রুত হাঁটছিল আর তিন সত্য এই বলে গাল দিচ্ছিল, তুই মা করালবদনী, মুখ ব্যদন করে আছিস, মুখের রক্ত মাটিতে উগলে পড়ছে তবু এক বিন্দু জল দিবি না।

জনার্দন হাঁটতে হাঁটতে ফের বলল, বেশীদিন আর নেই। আমি মরে গেলে মনে করবি না তোকে ওখানে বসিয়ে রাখব। তোকে বুঝলি সুবচনী, তোকে তোর ছেলেকে নিয়ে ঐ যে পাহাড় দেখছিস সেখানে নিয়ে যাবো। পাথরের নীচে রেখে পাষাণের ভার চাপিয়ে দেব। তবু যদি তোর চোখে জল না আসে দুঃখে, তবে তোর মুখে মুতে দেব।

তখন সুবল দেবদারু গাছের নীচে বসে জুতো পালিশ করছিল। পাখিটা দাঁড়ে বড় বেশী ছটফট করছে। বড় বেশী কিচমিচ করছে। পাখিটার তবে বুঝি জল তেষ্টা পেল। সে বাটিতে করে সামান্য জল

দিল পাখিটাকে। কিন্তু পাখি জল খেল না। পাখা ঝাপটাতে থাকল। এবং পা দিয়ে বাটির জল উল্টে চিঁ চিঁ করে কাঁদতে থাকল!

পাখিটাত এমন করে না কোনদিন! সুবল ভাবল। সুবল অস্বস্তি বোধ করছে। পাখিটা ছটফট করলে ওর বড় কষ্ট হয়। সে ভালভাবে জুতো পালিশে মন দিতে পারছিল না। সুতরাং সে রেগে মেগে পয়সা না দিয়েই চলে গেল।

সুবল ভাবল, বাঁচা গেল। লোকটি পয়সা দেয়নি বাঁচা গেল। লোকটি চলে গেছে, সুতরাং সুবল এখন পাখিটার দিকে ভাল ভাবে মন দিতে পারবে সে ওর ক্রিমের কৌটার মুখ বন্ধ করে ব্রাস দিয়ে কাঠের বাক্সটাতে একটা বাড়ি মারল, তারপর ব্রাসটা নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, এই সাত সকালে তোর কি হল বাপু।

পাখিটা দাঁড় থেকে উঠে সুবলের হাতে ঠোকরাতে থাকল। সুবল কি ভেবে বলল, আমাকে ভাল লাগছেনা। তবে যা, উড়ে যা। বলে সে পা থেকে শেকল খুলে দিল। আর শেকল খুলে দিতেই পাখিটা সামনের দেবদারু গাছ অতিক্রম করে সামনের ছোট মাঠ পার হয়ে একটা জানালায় গিয়ে বসল। আর সেখানে বসে সেই আগের মত প্রাণপণে চিঁ চিঁ করতে থাকল।

সুবল কিছু একটা ঘটবে, ঘটেছে ভেবে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখল ঘরের ভিতর টুকুন দিদিমণি, সজ্ঞাহীন, বড় বড় ডাক্তার, অনেক খেলনা চার ধারে। পাখিটা কিচ কিচ করছে বলে নার্স ছুটে এসে পাখিটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলে, সুবল বলল, আমাদের টুকুন দিদিমণি না? টুকুন টুকুন দিদিমণি, সে ক্ষেপা বালকের মত ডাকতে থাকল, সে এত উত্তেজিত যে এইসব বড় বড় ডাক্তারদের আদৌ ভ্রুক্ষেপ করল না। সে জানালার ওপর উঠে গেল। পাখিটা সুবলের উত্তেজনা যেন ধরতে পারছে, পাখিটা সুবলের চারপাশে এখন উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সুবল ডাকছে, টুকুন দিদিমণি আমি এসে গেছি। আমি তোমাকে কত খুঁজে

খুঁজে ফিরে গেছি। এই দেখ টুকুন দিদিমণি সেই দুষ্টু পাখি, দেখ নীল লাল কুঁচ ফল।

একজন নার্স এগিয়ে এসে বলল তুমি কে বাপু।

—আমি সুবল। সুবল আমি। আমরা ট্রেনে করে আসছিলাম…।

—অ: তুমি সুবল। নার্সের মনে হল যেন সেই এক গল্প টুকুনের মা বাবা করে গেছে, এক সুবল, পাখিয়ালা সুবলকে দেখে টুকুন দিদিমণি হাতে তালি বাজিয়েছিল। সেই সুবল এসে গেছে। নার্স এবার ধীরে ধীরে বলল, কথা বলল, টুকুন দিদিমণির খুব অসুখ। টুকুন দিদিমণি বাঁচবে না।

সুবল বলল, বাঁচবেনা কেন?

—ওর ভয়ঙ্কর অসুখ।

—কি অসুখ।

নার্স অসুখটার নাম করতে পারত। কিন্তু সাধারণ এক পাখিয়ালা সুবলকে এত ফিরিস্তি দিয়ে কি লাভ। সে বলল, তুমি অতসব বুঝবেনা। তুমি যদি টুকুন দিদিমণিকে দেখতে চাও, ঘুরে সামনের দরজায় এস।

—আমিত এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি টুকুন দিদিমণিকে। দিদিমণি ঘুমোচ্ছে।

নার্স এবার বিরক্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ ঘুমোচ্ছে।

—জাগলে একবার ডেকে দেবেন। আমি দেবদারুগাছটার নীচে রয়েছি। আমার কথা আছে অনেক। টুকুন দিদিমণি বলেছিল কলকাতায় এলে আমি যেন ওর সঙ্গে দেখা করি।

নার্স বলল, এখন যাও বাপু। ডাক্তার বাবুরা খুব বিরক্ত হচ্ছেন। তুমি গিয়ে চুপচাপ দেবদারু গাছের নীচে বসে থাক।

—দিদিমণির বাবা মাকে দেখছি না?

—ওরা বিকেলে আসবে। তুমি যাও বাপু। কথা বল'না। ডাক্তারবাবুরা বিরক্ত হচ্ছেন।

—তবে আমার পাখিটা এখানে থাকল।

—পাখি আবার কেন।

—দিদিমণি জাগলে সে আমাকে ডেকে দেবে।

—না বাপু পাখি টাখি রেখনা! তুমি তোমার পাখি নিয়ে চলে যাও। টুকুন জাগলে তোমায় ডেকে দেব।

—সত্যি ডেকে দেবেন ত?

নার্স বিরক্তি প্রকাশ না করে আর থাকতে পারল না, যাও বলছি।

—যাচ্ছি। সে পাখিটাকে ডাকল, আয়।

পাখিটা নড়ল না। পাখিটা গরাদে বসে ঠোঁট মুছতে লাগল।

সুবল বলল, ও এখন যাবেনা। আমি যাচ্ছি। পাখিটা আপনাদের কোন বিরক্ত করবে না!

--না নিয়ে যাও বলছি।

পাখিটা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, টুকুন চোখ খুলছে। পাখিটা এবারে ভিতরে ঢুকে ফুর ফুর করে উড়তে থাকল। টুকুন ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখল সেই পাখি—সোনার রঙের ঠোঁট, পায়ে সবুজ ঘাসের রঙ, পাখা কালো—গলার নীচে লাল রিবন যেন বাঁধা! টুকুন মনে করতে পারছিল না এই পাখি সে প্রথম কোথায় দেখেছিল। সে পাখিটাকে কোথায় দেখেছে। কবে কখন! এই প্রিয় পাখি কার, কে এই পাখি নিয়ে এসেছিল তার কাছে। যেন স্বপ্নের মত তার কাছে এক পাখি এসে গেছে, লাল রিবন বাঁধা পাখি! সে এই পাখি দেখে কত দীর্ঘদিন পর যেন মনে করতে পারল—এ পাখি সুবলের পাখি। সুবলকে ফেলে তার কাছে চলে এসেছে। পাখি দেখে টুকুন প্রথম জল খেতে চাইল, জল দিলে সে পাখিটাকে ধরার জন্য হাত তুলতে গিয়ে মনে হল শরীরের ভিতর কি যেন কেবল শির শির করছে।

সে সামান্য হাসতে পারল, আরামদায়ক এক অনুভূতি। পাখি, সুবলের পাখি, পাখি যখন এসে গেছে তখন সুবলও এসে যাবে। সুবল, পাখিয়ালা সুবল এই সংসারে এলে আর কোন দুঃখ থাকবে না। টুকুন সামান্য না হেসে যেন থাকতে পারল না।

বিকালের দিকে টুকুনের বাবা সুরেশ বাবু এলেন। ওদের পারিবারিক ডাক্তার এলেন। এবং টুকুনের মা শিয়রে বসেছিল। নার্স, সকালের দিকে টুকুন সংজ্ঞাহীন হয়েছে আজও—খবরটা সুরেশ বাবুকে দিতে গিয়ে সেই পাখিয়ালার গল্পও করে ফেলল।

সুরেশ বাবু বললেন, সে এখন কোথায় ?

নার্স দেবদারু গাছটার দিকে হাত তুলে বলল, ওর নীচে বসে জুতো পালিশ করছে। সকালের দিকে এসেছিল। খুব বিরক্ত করছিল টুকুনকে। তাই তাড়িয়ে দিয়েছি।

—ওর পাখিটা এখনও আছে ?

—পাখিটাকে নিয়েইত সব ঝামেলা। ঘরের ভিতর ঢুকে কেবল ফুরুৎ ফুরুৎ করে উড়ছে। আমার কথা শুনছে না, পাখিয়ালার কথা শুনছে না। ডাক্তার বাবুরা খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন। ভয়ে ভয়ে আমি তখন ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। সে পাখি নিয়ে দেবদারু গাছের নীচে বসে আছে।

নার্স ভুলে গেল পাখিটা যখন উড়ছিল তখন টুকুনের মুখে সামান্য সজীবতা লক্ষ্য করা গেছে। নার্স ভুলে গেল বলতে সংজ্ঞাহীন অবস্থা থেকে টুকুন পাখির ডাক শুনে জেগে উঠেছে। আর ভুলে গেল বলতে পাখিয়ালা বিশ্বাসই করছিল না, টুকুন বাঁচবে না।

মা টুকুনের কপালে হাত রাখল। টুকুনকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। খেলনাগুলো সব একদিকে জড় করা। নার্স বিকেলের দিকে চুল বেঁধে দিয়েছে। মুখে সামান্য পাউডার। মুখের এনিমিয়া ভাবটা এখন আর তত স্পষ্ট নয়। সকলের মুখই বিষণ্ণ। বিশেষ করে টুকুনের

মা সারাক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ডাক্তার বাবু বললেন, এখন আর আমাদের কিছু করণীয় নেই।

—না কিছু করণীয় নেই।

—সংসারে বুঝলেন সুরেশবাবু, ডাক্তারবাবু কেমন বিচলিত ভাবে কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

—আপনি উদ্যমহীনতার কথা বলতে চাইছেন।

—হুঁ আমরা কেমন যেন ক্রমশঃ উদ্যমবিহীন হয়ে পড়ছি সকলে।

—তিনি একটু থামলেন, তারপর টুকুনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। ওর ভিতরেব কল বজ্রাগুলো ঠিকমত প্রথম থেকেই কাজে লাগে নি।

সুরেশ বাবু বললেন, কিন্তু আমার দিক থেকে ত' কোন ত্রুটি ছিল না ডাক্তার বাবু।

আর তখন কে যেন পথে পথে বনে বনে বলে গেল, কে যেন হেঁকে হেঁকে গেল, পথ দিয়ে মানুষ যায় দেখ, ঘোড়া যায় গাড়ি যায় দেখ, দুঃখ যায় সুখ যায় দেখ। দেখ দেখ মানুষ কত মানুষ, কত হিসাবের মানুষ পোষ্টার মারছে দেয়ালে—খেতে পায় না, অনাহারে দুর্ভিক্ষে মানুষ সব গ্রামে মাঠে মরে থাকছে।

অথবা যেন পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে গেল সহরটা—জল চাই, অন্ন চাই। শুধু লেখা ছিল না উদ্যমবিহনে কিবা পূরে মনোরথ! সুরেশ বাবু নিজের চোখে মেয়ের চোখে দেখছিলেন, এক দুরারোগ্য ব্যাধি এই মেয়ের। ঠিক যেন তার কলকারখানার মত। আয় নেই, ব্যয় বাড়ছে, শ্রমিকেরা উৎপাদন বাড়াচ্ছে না। টাকার দাম কমছে, জিনিষপত্র আকরা। এক রোগ তার কলকারখানাকে উৎখাতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই তিনি সে ক্ষয় থেকে তাকে রক্ষা করতে পারছেন না—ঠিক যেন এই মেয়ে, যে ইচ্ছা করলেই বেঁচে উঠতে পারে ভিতরের উদ্যমহীন এক ক্ষতজাত রক্ত কিছুতেই তাকে সুস্থ হতে দিচ্ছে না।

সুরেশ বাবু যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন, তোরা বল, বুকে হাত দিয়ে বল, যা এখন উৎপাদন করছিস, তোরা মনপ্রাণ দিলে তার দ্বিগুণ দিতে পারিস।

এক দৈত্য বোধহয় নিয়মের দৈত্য অথবা আদাইয়ের দৈত্য হু হু করে হেসে উঠল—স্যার আপনি কি জলে ডুবে স্বপ্ন দেখছেন। আমরা কি আর উৎপাদন বাড়াতে পারি।

সুরেশ বাবু মেয়ের মুখ দেখে আঁৎকে উঠলেন। ভিতরে মেয়ের সেই ক্ষতজাত রক্ত কেবল ভিতরে ঘুরে ঘুরে আমরণ পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য লড়াই। যেন এই মেয়ে তার নিজের ভিতরেই ক্ষয়কে ভালবেসে পুষে রেখেছে। সে বলল, টুকুন তুমি ঐ দেখ পাখিয়ালা সুবল এসে গেছে। তুমি তখন হাতে তালি বাজিয়েছিলে, এখন পার না। ঐ দেখ সুবল দেবদারু গাছের নীচে বসে জুতো পালিশ করছে। তাকে ডাকব ?

টুকুন হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। যেন কোন অমল আনন্দের খবর বয়ে আনার মত মানুষ তার আর নেই।

সে শুধু বলল, বাবা জল খাব। জল।

সুরেশ বাবু নার্সকে জল দিতে বলে বের হয়ে গেলেন। যে বাঁচতে চায় না, তাকে বাঁচিয়ে লাভ নেই। সুরেশ বাবুর মুখে অবসাদের চিহ্ন। তিনি বড় বড় হাই তুলতে থাকলেন।

সুবল দেবদারু গাছের নীচে বসে ছিল। রাস্তায় আলো জ্বলছে। ফুটপাতে মানুষের ভিড়। কোথায় কি গণ্ডগোল হয়েছে, সহসা শহরের ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেল। মানুষেরা পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরছে। কিছু টেম্পো, লরী এবং রিক্সা মানুষ বইছিল, রাস্তা ফাঁকা বলে সব ছোট ছোট ছেলের দল রাস্তার উপর বল খেলছিল, ক্রিকেট খেলছিল এবং হাডুডু খেলছিল।

অথচ দেবদারু গাছটার নীচে বসেছিল সুবল, রাতে সে এই গাছের

নীচে শুয়ে থাকবে। সঙ্গে ওর ছোট এক সতরঞ্চ আছে, অপরিচ্ছন্ন হলে সে সব গঙ্গার জলে ধুয়ে নেয়। আর এই গাছের নীচ থেকে টুকুন দিদিমণির জানালা স্পষ্ট। এখন মনে হচ্ছে দিদিমণির ঘরে কেউ নেই! ঘর ফাঁকা। শুধু সেই রাজা, কিছু পরী এবং বিড়াল, কুহুমাসীর মুখ দেখা যাচ্ছিল। সে তার পাখির দিকে মুখ তুলে তাকাল। পাখিটা দাঁড়ে বসে ঝিমোচ্ছে। সে এবার সব গোছ-গাছ করে কাঁধে ফেলে জানালার দিকে এগুতে থাকল, যখন কেউ নেই, জানালা দিয়ে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু ঘরে একটা নীল আলো জ্বলছে, তখন সুবল কিছুতেই দেবদারুর নীচে বসে থাকতে পারল না। কি এক অপরিসীম ভালবাসা আছে টুকুন দিদিমণির, টুকুন দিদিমণি ছুটে গিয়েছিল দরজায়, দরজা খুলে বলেছিল, এখানে কেউ নেই, এ কামরায় কেউ ঢোকেনি। বলে পুলিশের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল —সেই থেকে মনে হয়েছে সুবলের এমন ভালবাসার জন আর তার কেউ নেই। এমন আপনার জন তার আর পৃথিবীতে কেউ নেই। টুকুন দিদিমণিকে সে যেন ইচ্ছা করলে সব দিয়ে দিতে পারে। আর এই যে পাখি, যার মূল্য সুবলের কাছে প্রাণের চেয়েও অধিক, ইচ্ছা করলে সুবল টুকুন দিদিমণিকে খুশী করার জন্য সেই অমূল্য ধনও উড়িয়ে দিতে পারে। তার যা কিছু সম্বল, যা কিছু সঞ্চয় সব এই টুকুন দিদিমণিকে দিয়ে দিতে পারে। ঘর ফাঁকা দেখে সে কিছুতেই আর গাছের নীচে বসে থাকতে পারল না—জানালায় এসে কাঁধ থেকে ঝোলাঝুলি নামিয়ে ফিস ফিস করে ডাকল, টুকুন দিদিমণি আমি এসেছি।

জানালার দিকে মুখ ছিল টুকুনের। স্প্রিংের খাট, শিয়রের দিকটা একটু উঁচু করা। টুকুন দিদিমণির চোখ ঘোলাটে, যেন স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছে না। প্রায় অন্ধের মত—অথবা সংজ্ঞাহীনের মত, ঠিক যেন তার সেই খরা অঞ্চল, কোন কালে বৃষ্টি পায় না আর ফসল ফলবে না,

সোনার ফসল ঘরে তুলে কেউ আর উৎসবে পার্বনে আলো জ্বালবে না। সে ফিস ফিস করে ডাকল, দিদিমণি, দিদিমণি আমি সুবল, চিনতে পারছ না? আমাকে তুমি চাদর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল, আমাকে তুমি পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে। আমি পাখিয়ালা সুবল।

—কে? সুবল!

—হ্যাঁ আমি সুবল। আমি তোমাকে কুঁচফল দিয়েছি।

—তুমি আমাকে রঙ বেরঙের পাথর দিয়েছ সুবল।

—আমি তোমাকে চন্দনের বীচি দিয়েছি।

—আমার শিয়রে সব আছে।

—কৈ দেখি। সুবল দু পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। কিন্তু অবাক টুকুন তার হাত পা নড়াতে পারল না।

সুবল, বলল, কৈ দেখি। তোমার শিয়রের নীচে কোথায় রেখেছ দেখি

টুকুন বলল, নার্স এলে বলল। নার্স শিয়রের নীচ থেকে চন্দনের বীচি বের করে দেখাবে।

—কেন তুমি পার না!

—না সুবল। আমি পারি না। আমি হাঁটতে পারিনা সুবল। কতদিন আমি হাঁটিনা। কতদিন আমি মাঠে মাঠে হেঁটে বেড়াইনি। বলে দুঃখী এক মুখ নিয়ে সুবলের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর সামনের মাঠে যে আলো জ্বলছিল, সামনের পার্কের বেঞ্চগুলোতে যে মানুষগুলো বসেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, জান সুবল ওরা পর্যন্ত অবিশ্বাস করছে, আমি ট্রেনে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলাম, ওরা তা বিশ্বাস করতে চাইছে না। বলে সে আঙ্গুলে সমস্ত ফুলপরী জলপরী, রাজা এবং অন্যান্য পুতুলদের উদ্দেশ্য করে দেখল।

সুবল বলল, যা তুমি আবার হাঁটতে পারবেনা কেন? তুমি ঠিক হাঁটতে পার।

—আমি হাঁটিতে পারি তাই না সুবল? আমি ট্রেনে হেঁটেছিলাম তাই না সুবল! বলে সে খুব উচ্ছল হয়ে উঠল।

—তুমি এখনও হাঁটতে পার।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল টুকুন খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে। সে আর সুবলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। কি যেন ভাবছে। সে সুবলকে বলতে চাইল, আমি আর হাঁটতে পারি না। তোমাকে ইচ্ছা হয় বার বার হেঁটে দেখাই। কিন্তু সুবল আমি সত্যি পারি না এখন। গায়ে শক্তি নেই। হাতে পায়ে স্থবির এক ভাব সব সময়।

টুকনের চোখ ঘোলাটে হয়ে উঠছিল ফের। ভিতরে লজ্জাকর অনুভূতি। বড় মাঠ সামনে, আর এত সব ট্রাম বাস চোখের উপর দিয়ে ছুটছে, এত সব মানুষজন আর পথ পার হয়ে যাচ্ছে—ওদের দেখে টুকুনের ভিতর সব সময় এক অসহিষ্ণু ভাব। টুকুন ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিল।

সুবল যেই দেখতে পেল, টুকুন দিদিমণির চোখ ফের ঘোলা হয়ে যাচ্ছে—সে বলল, টুকুন দিদিমণি, তুমি হাঁটতে পার। তুমি হেঁটে হেঁটে ইচ্ছা করলে, অনেক দূরে চলে যেতে পার।

আমি হাঁটতে পারি সুবল তুমি ঠিক বলছ?

এই যে পাখি আছে না দিদমণি, এই পাখি ঠিক তোমার মত শুয়ে থাকতে ভালবাসত। শুয়ে থাকলে মানুষের হাত পা অবশ হয়ে যায়। তুমি হাঁটতে পার, দেখ আমার পাখি কেমন আমার মাথার চার পাশে উড়ছে।

টুকুন এবার তার খেলনাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, কিরে রাজা এখন বুঝতে পারছিস, আমি হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলাম। এই দেখ সুবল পাখিয়ালা সুবল, সব দেখেছে। ওদের দেশে খরা বলে ও কলকাতায় চলে এসেছে। ওর সঙ্গে ট্রেনে কত কথা বলেছি। ওর

পাখিকে আমি খেতে দিয়েছি। আমি তোদের মত নেঙ্গু নইরে। তোদের মত এক জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে থাকি না।

সুবল বলল, এই যে পাখি দেখছ, ওর কেউ ছিল না। একদিন ফিরে আসার সময় দেখি গাছের নীচে পড়ে ছটফট করছে। ওর মা বাবা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখে বুঝি পালিয়েছিল। পাখিটা নড়ে না, খায় না, পাখির চোখ ঘোলাটে। এই পাখি সকলে বলল মরে যাবে, আমি পাখিকে নিয়ে মাঠে চলে গেলাম, সবুজ কীট পতঙ্গের ছানা খুঁজে বের করলাম। অতল জলের স্বাদ মুখে দিলাম। নদীর জলে স্নান করলাম, সুবচনী দেবীর মন্দিরে গিয়ে মানত করলাম, মা আমার পাখিকে উড়িয়ে দে আকাশে, উড়িয়ে দে সব, পাখির চোখে নদীর জল লেগে পাথরের মত কালো হয়ে গেল। সবজ কীট পতঙ্গের ছানা খেয়ে পাখা গজাল, অতল জলের স্বাদ পেয়ে পাখি তাজা হল—কিন্তু হায় পাখি আমার আকাশে ওড়েনা, চলে না ফেরে না। পাখিকে নিয়ে কি কষ্ট! মাঠে নেমে পাখিকে বলতাম ঐ দেখ বড় মাঠ, ঐ দেখ বড় গাছ, আপন প্রাণের তেজে পাখি উড়ে যা আকাশে! সে কি দৌড় ঝাঁপ গেছে। খরা চলেছে গ্রামে মাঠে, মানুষ রোদে বের হতে চায় না, আমি পাখিকে শুধু বললাম, পাখি, আপন প্রাণের তেজে পাখি আকাশে উড়ে যা। একদিন দুদিন গেল মাস গেল এবং মাঝে মাঝে আমরা নদীতে জলের সন্ধানে বের হতাম, পাহাড় চারপাশে, কত গাছ পালা ফুল ফল পাখি ছিল, খরায় সব পুড়ে গিয়েছে। চারিদিকে তাকালে কান্না পায়, জল খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে পাখিকে বলতাম—উড়ে যা। আপন প্রাণের আবেগে উড়ে যা। বলে সুবল নিজের পাখিকে বলল, উড়ে যা, তোর টুকুন দিদিমণি দেখুক—সঙ্গে সঙ্গে পাখি উড়তে থাকল ডিগবাজী খেতে থাকল—কোথাও উড়ে গিয়ে নিমেষে ফিরে এল, রাজার মাথায় বসেছে কিন্তু মলমূত্র ত্যাগ করলে মনে হল চোখের নীচে রাজার পিচুটি। রাজা যেন হাপুস নয়নে কাঁদছে।

তখন সুবল বলল, দেখ দিদিমণি দেখ, তোমায় রাজার চোখে পিচুটি, রাজা কেমন মুখ গোমড়া করে আছে। টুকুন ঘাড় ফিরিয়ে রাজাকে দেখতে পেয়েই হো হো করে হেসে উঠল।—ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে। পাখি তোমায় উচিত শাস্তি দিয়েছে। পাখিটার কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পাখি আকাশে ওড়ার মত ঘরের ভিতর দোল খেয়ে উড়ছে।

সুবল বলল, দিদিমণি ওর পাখায় কত রাজ্যের স্বপ্ন দেখো।

সুবল বলল, দিদিমণি পাখির পায়ে কত রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখো।

তারপর সুবল কেমন নেচে নেচে বলতে থাকল, আকাশ দেখো, সমুদ্র দেখো, দেখো দেখো মাঠ দেখো, পাহাড় দেখো।

পাখিটা সেই আকাশ দেখার মত ঘরেব ভিতর উড়তে থাকল, সমুদ্র দেখার মত বাতাসের উপর ভাসতে থাকল, নদী দেখার মত এঁকে বেঁকে সোজা উপরে নীচে উঠে গেল। টুকুন সব দেখছিল। যাদুকর তার পাখির খেলা দেখাচ্ছে। যাদুকর এই ঘবে পাখির খেলা দেখিয়ে সকল দুঃখ যেন দূর করে দিচ্ছে।

টুকুন মনপ্রাণ ঢেলে এই পাখির খেলা দেখতে থাকল। ভিতরে সেই শির শির ভাবটা কাজ কবছে। ভিতরে, সেই প্রাণের ভিতরে শির শির ভাবটা কাজ করছে। যেন শরীরের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে। শরীরের ভিতরে কোথাও এক হীরামন পাখি এতদিন চুপচাপ ঘুমিয়ে ছিল এই পাখির খেলা দেখতে পেয়ে সে-পাখি আকাশে ওড়ার জন্য ডানায় যে সব রাজ্যের ক্লান্তি জমে ছিল এতদিন, তাই উড়িয়ে দিল। প্রাণের ভেতরে এক পাখি আছে, ওড়ার পাখি, সেই পাখির আজ কতদিন পর যেন ওড়ার প্রত্যাশায় চোখে মুখে হাসির আনন্দ, হায় এই হাসির আনন্দ কোথাও থাকে না, মানুষের এই হাসির আনন্দ প্রাণের আনন্দ কখন যেন বড় হতে হতে হারিয়ে ফেলে।

টুকুন ধীরে ধীরে দেখল অনেকক্ষণ ওড়ার পর পাখিটা ক্লান্ত হয়ে

সুবলের মাথায় গিয়ে বসেছে। রাত বাড়ছিল। সুবল ধীরে ধীরে জানলা থেকে নেমে ফের দেবদারু গাছের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। টুকুন জোরে চীৎকার করতে চাইল, সুবল তুমি আবার কাল এস। আমি জানলায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। এবং পিছনের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল নার্স দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। টুকুন এতক্ষণে বুঝতে পারল নার্সের ভয়ে সুবল চুপি চুপি কিছু না বলে পাখি নিয়ে চলে গেছে।

৭

জনার্দনও বুঝতে পারলে, আর রক্ষা নেই। মাটি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। মরুভূমির মত উত্তাপে গাছপালা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। কোথাও সামান্য রস সঞ্চিত নেই। এখন এই পাহাড় ঘেরা অঞ্চলে শুধু মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকা। জনার্দন মন্দিরের ভিতর পায়চারী করছিল। হাত পা শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। চোখে আর প্রায় দৃষ্টি ছিল না। সে এখন আর পাহাড়ের ওপর উঠে পাথর নিক্ষেপ করতে পারছে না। সমস্ত উদ্যম নিঃশেষ হয়ে গেল।

দাবানলের মত জ্বলে সূর্য অস্ত চলে গেল। জনার্দন অভ্যাস মত বের হয়ে পড়ল। চোখের দৃষ্টি কমে আসছে বলে সে ধীরে ধীরে পরিচিত পথ ধরে পাহাড় থেকে নেমে সমতল পথ ধরে হাঁটতে থাকল। আজ প্রায় চারদিন হল জনার্দন শুধু জল খেয়ে আছে। জনার্দন আজও শেষবারের মত বের হয়ে পড়ল। যদি কোন আহার্য বস্তু সংগ্রহ করতে না পারে, যদি পাহাড়ময় এবং মাঠময় কোন মৃত জীবজন্তু অথবা ঘাস পাতা সংগ্রহ করতে না পারে তবে মনে হচ্ছিল মৃত্যু অবধারিত। এই মৃত্যু ওকে গ্রাস করবে ক্রমশঃ। এখন আর পায়ে শক্তি নেই যে সে দূরের কোন সহরে অথবা গঞ্জে চলে যাবে। ষাট সত্তর মাইল হেঁটে যাবার শক্তিটুকু জনার্দনের শেষ হয়ে গেছে। সে হাঁটছিল এবং মাঝে মাঝে আবেগে মা মা বলে ডেকে উঠছিল।

জনার্দনের হাঁটতে হাঁটতে মনে হল সংসারে এক রকমের তেষ্টা আছে যা কোনকালে নিবারণ হয়না। এক রকমের অভাব আছে যা কখনও দূর হয়না। আর একরকমের অহঙ্কার আছে যা কোনকালে শেষ হয় না। জনার্দনের সেই অহঙ্কার। শস্য শ্যামলা এই দেশে

প্রথম পিতৃপুরুষেরা আসেনি। পাহাড়ী অঞ্চল ছিল। সেখানে লোকালয় বিশেষ ছিলনা। নির্জন এক পাহাড় ঘেরা প্রান্তরে সামান্য ক'ঘর আদিবাসীর ভিতর তার কোন পিতৃপুরুষ এসেছিল সুবচনী দেবীর ভার কাঁধে নিয়ে। সে এসেছিল বলে, দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে, এবং দিনমান এই মাঠের ভিতর উপুর হয়ে পড়ে থেকে সব ঘাস বিচালী তুলে নিয়েছিল বলে বর্ষার শেষে কি ফসল, কি ফসল! এত ফসল হয় মাটিতে মানুষের জানা ছিল না। পাহাড়তলি অঞ্চল থেকে মানুষজন ফসলের লোভে চলে এসেছিল—আর যায়নি। তার পূর্বপুরুষ এক বন্ধ্যা মাটিকে উর্বরা ভূমি করে সংসারে প্রায় পীর সেজে গেল। তারপর থেকেই বংশের ভিতর এক নিদারুণ অহঙ্কার। উৎসবে, পালা পার্বনে মানুষের সুখে দুঃখে সব সময় এই দেবীর সেবাইত প্রায় ঈশ্বরের সমতুল্য। জনার্দন হাঁটতে হাঁটতে ফের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, মা মা—মা সুবচনী তুই নিষ্ঠুর হলে চলবে কেন—আমার অহঙ্কার মুছে দে মা। সামান্য বৃষ্টি দে মা। রাগ করে মা কার ঘরে বসে আছিস। বৃষ্টি দে মা মাঠে ঘাস বিচালী গজাক। পাখি পাখালি উড়ে আসুক মা। গাছে গাছে ফুল ফুটুক। ফল হোক মা গাছের শাখা প্রশাখাতে। তোর লীলা মা আর কতকাল চলবে।

কিন্তু হায় কার কথা কে শোনে। শেয়াল ডাকছে না। কুকুরের আর্তনাদ নেই কোথাও। চারিদিকে বীভৎস জ্যোৎস্না! সাদা আলো মাঠময়। সেই মাঠের ভিতর বসে একসঙ্গে কারা যেন নিত্য কেঁদে চলেছে। জনার্দন একটু থমকে দাঁড়াল। কারা কাঁদছে! ঠিক যেখানে নদী সামান্য বাঁক নিয়েছে, যেখানে ক'ঘর মুণ্ডা জাতীয় আদিবাসী ছিল, এবং যেখানে পেটের জ্বালায় ঘরের এক বৌ ফাঁসি দিয়েছিল সেইসব মাঠে এবং গাছের ভিতর একদল মেয়ে যেন হাজার হবে, তার বেশীও হতে পারে বসে বসে কাঁদছে। জনার্দনের প্রায় পা চলছিল না। এমন বীভৎস দৃশ্য জনার্দন কোনকালে যেন দেখেনি।

হাজার ঘোড়া ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে সব নারী পুরুষের মুখ ঝুলছে। দেহ নেই। শুধু মুখ। তারপর একটা কালো ঘোড়া যেন ছুটে গেল, সেই ঘোড়ার পিঠে শুধু এক তরবারী। তারপর মনে হল সুবচনী দেবী মাঠের ভিতর ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে। ছোট সুবচনী দেবী হাত পা বিশাল করে, স্তনে সন্তান ঝুলিয়ে ঠিক কোন ভৈরবীর মত দু হাত ওপরে তুলে জনার্দনের দিকে এগিয়ে আসছে আর মনে হল হাজার হাজার কঙ্কাল সেই সুবচনী দেবীর চারপাশে আনন্দে নৃত্য করছিল। জনার্দন এবার বলল, মা আমার আর কোন অহঙ্কার নেই মা। আমি ক্ষুধার জন্য অন্ধ হয়ে যাচ্ছি মা। মা আমার এই পিতৃপুরুষের দেশকে শ্মশান করে দিলি মা। জনার্দন হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকল।

জনার্দন ধীরে ধীরে আরও নীচে নেমে এল। সে এক নাগাড়ে হাঁটতে পারছিল না বলে কোথাও সামান্য সময় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। জলের জন্য সে নেমে যাচ্ছে। খাদ্য অন্বেষণের জন্য সে নেমে যাচ্ছে। যেখানেই সে বসত—চারপাশে শুধু মৃত গাছের ডাল। হাওয়া দিলে মরমর শব্দ করে কিছু গাছপালা ভেঙ্গে পড়ত। জনার্দনের ইচ্ছে যায় তখন, মৃত ডালে, গাছে গাছে এবং সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দিলে কেমন হয়। মা সুবচনীকে পুড়িয়ে মারলে কেমন হয়। ভাবতে ভাবতে জনার্দন হা হা করে হেসে উঠল।

আবার জনার্দনের হাঁটা। দক্ষিণের মনি পাহাড়ে উঠে গেলে হয়ত এখন কিছু কাঁটা জাতীয় গাছ মিলতে পারে। কম জল হলে ওরা বেশী গজায়। পাথরের ফাটল থেকে রস চুষে ওরা বড় হয়। কিন্তু শরীর দুর্বল, মণি পাহাড়ে উঠে যাবার সাধ্য যেন একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে জনার্দনের। সে হেঁটে হেঁটে শেষ যে পাহাড়ের মাথায় রোজ উঠে পাথর নিক্ষেপ করত তার নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। জ্যোৎস্না রাত বলে পাহাড়ের শেষ দিকের অংশটুকু একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। সে এবার সেই যোজকের নীচের অংশটুকুতে এসে দাঁড়াল। পাথরে

পাথরে জায়গাটা খুব উঁচু হয়ে গেছে। এবার নদীতে জল এলে প্রায় হ্রদের মত জায়গাটা ঘিরে জল ধরে রাখবে। সে জলের আশায় বৃষ্টির আশায় আকুল হতে থাকল। বৈশাখ চলে গেছে, জ্যৈষ্ঠ যাব যাব করছে। অথচ একবিন্দু বৃষ্টি নেই। এবারেও মা সুবচনী এ-অঞ্চলে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। রাগে দুঃখে জনার্দন পাথরের ওপরই থামচাতে থাকল।

দুঃস্থ মানুষ জনার্দন অহোরাত্র খাদ্য অন্বেষণের পর ক্লান্ত হয়ে নদীর স্রোতের সামান্য উঁচু অংশটাতে চুপচাপ বসেছিল। ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। হরিণী তার দুই শিশু সন্তান নিয়ে এবার নেমে আসবে। ওদের জলপান করানো হলে জনার্দন পেট পুরে জলপান করবে। তারপর, মন্দিরের ভিতর সারাদিন পড়ে থাকা ক্ষুধার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে মাঝে মাঝে দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়া-হায় জনার্দন প্রায় এখন কিছুই ভাবতে পারছিল না। সামনে যে সব গঞ্জ ছিল সেও মৃতপ্রায়। কোন কোলাহল নেই, ক্রমশঃ এক অন্ধকার এই পাহাড় ঘেরা মাঠে নেমে এসে সব অঞ্চলটাকে ভূত প্রেতের রাজত্ব করে দিল।

জনার্দন মনে মনে খেঁকিয়ে উঠল, না হয় না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল যে কোন মই বেয়ে এবার প্রায় আকাশের কাছাকছি উঠে যাবে, এবং আকাশটাকে মা সুবচনীর খাঁড়া দিয়ে দু ভাগ করে দেবে। দু ভাগ করে দিলেই ঝর ঝর করে জল নামবে। সে এই ক্লান্ত শরীরেও মই বেয়ে ওঠার মত দু হাত তুলে দিল আকাশের দিকে। তারপর চীৎকার করে বলতে চাইল, জল দে। আমি যদি তোর কাছে পাপ করে থাকি, আমার প্রাণের বিনিময়ে জল দে। বলে সে বালিয়াড়ী ওপর সটান শুয়ে পড়ল, এবং হাত দুটো পিঠের উপর যেন দুটো হাত বাঁধা অবস্থার ওকে বলি দেওয়া হচ্ছে এমন ভঙ্গি নিয়ে বালির উপর শুয়ে পড়ল।—এবার দে এক কোপ। ভ্যাঁ। জনার্দন

বালির ওপর কাটা পাঠার মত ছটফট করতে থাকল এবং ব্যা ব্যা করে ডাকতে থাকল। যথার্থই যেন ওকে সুবচনী দেবীর মন্দিরে পাঁঠার মত বলি দেওয়া হচ্ছে এখন।

না এ ভাবে পড়ে থেকে লাভ নেই—জনার্দন উঠে পড়ল। নিশুতি রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে মাঠ, গাছ পাহাড় যেন দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে তাকে হত্যা করবে বলে। জনার্দন উলঙ্গ ছিল বলে উপবীত ডানদিকের কোমরের কাছে ঢলঢল করছিল। মনে হচ্ছিল উপবীত ওর শরীরে সুরসুরি দিচ্ছে। সে উপবীতে হাত রেখে হাঁকল, কে আসবি আয়, কার কার হিম্মত আছে আয়, কত লড়বি এই ঠাকুরের সঙ্গে আয়—কারণ জনার্দনের মনে হচ্ছিল শুধু সুবচনী নয় শুধু এই অঞ্চলের মানুষজন নয়, সকলেই যেন, যেন গাছ, ফুল, পাখি, পাহাড় সকলে মিলে ওর সঙ্গে তঞ্চকতা করছে। অথবা রসিকতা করছে— হায় জনার্দন তোদের ফসলের অহঙ্কার ভালবাসার অহঙ্কার এবারে সব মুছে যাবে।

ঠিক তক্ষুণি লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে আসছে হরিণী আর তার দুই শিশু। সোনার হরিণের মত দেখাচ্ছিল প্রায়। ভোর রাতের জ্যোৎস্নায় ওদের চোখগুলো বড় উজ্জ্বল ছিল। বালিতে পায়ের দাগ পড়েছে। ওদের শরীর এত নরম এবং উজ্জ্বল যে জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছিল শরীর থেকে পিছলে যাচ্ছে। ওরা নেমে আসছিল এবং পেছনের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। জনার্দনের এখন আর মৃত্যুভয় থাকছে না। মাঠ এবং পাহাড়কে এখন দৈত্যের মত মনে হচ্ছে না। এখন যেন জনার্দন আর একা নয়। সে এবং এই তিন বন্য প্রাণী মিলে চারজন সে প্রায় সুবচনী দেবীর মন্দিরে যেমন একা একা কথা বলে দিন কাটায় অর্থাৎ সেই সুবচনীর সঙ্গে কথা বলে, এবং সুবচনীর হয়ে কথার উত্তর দেয় তেমনি এই নদীর খাতে হরিণদের সঙ্গে প্রায় একা একা কথা বলার স্বভাব।—তা হলে তোরা এলি। তোদের জন্য আমি কখন

থেকে বসে রয়েছি। তোরা তো বাপু দ্রুত ছুটতে পারিস, কোথায় কোন বনে দ্রুত ছুটে যাস কে জানে। আহারের কোন অসুবিধা হচ্ছে নাত! জনার্দন ওদের সঙ্গে প্রায় সাধু ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করে দিল।

সে ওদের নাম রেখে দিয়েছে এতদিনে।

সে সবচেয়ে ছোটটাকে ডাকল—পলা এই পলা তুইত বাপু ভারি দুষ্টু। শিঙে মুখ ঘসে সুখ খাচ্ছিস। পলা পা দুটো হঠাৎ এবার পিঠের উপর রেখে প্রায় মাথার কাছে মুখ নিয়ে এল। ওর মাথার নীচে এবং গা চেটে দিচ্ছে। বোধহয় ঘাম ছিল শরীরে, এবং ঘাম শুকিয়ে মুখের গন্ধ ছিল শরীরে, পলা মনের সুখে জিভ দিয়ে পিঠ ঘাড় গলা চেটে দিতেই জনার্দন এক ধরণের সুখ পেল—অতীব সুখ, লোভের বশবর্তী সে সুখ আহারের সুখ, এমন সুখ বুঝি কতদিন সে পায়নি—সে ভিতরে আহারের এক সুখ আছে ভাবতেই মনে হল কোথায় যেন আগুন জ্বলছে, কাঠের আগুন, বন্য মানুষেরা সেই কাঠে মাংস পুড়িয়ে চিবুচ্ছে। ওর জিভ স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়, জিভে জল এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে খপ করে পলাকে ধরে বুকের কাছে টেনে আনল, এবং ওদের জলপান করানোর কথা মনে থাকল না। আহারের লোভ, দীর্ঘদিনের অনাহার জনার্দনকে প্রায় পাগলের মত করে ফেলছে। সে পলাকে নিয়ে এবার মন্দিরের দিকে দ্রুত ছোটার জন্য মাঠের দিকে উঠে যেতে থাকল।

সুবলের পাখিও দ্রুত আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে যাচ্ছে। দ্রুত যেন পাখি সকলকে হারিয়ে দেবে। দেখো হুই আকাশে উড়েছে। জানালার পাশে আর কেউ নেই এখন। সুবল এবং টুকুন।

ভোরবেলা, নার্স এখনও আসেনি ঘরে। সুবলের কেবল গমনের অপেক্ষা। ওর দেবদারু গাছের নীচে থেকে জানালা দিয়ে ঘর স্পষ্ট,

নার্স না থাকলেই টুকুন দিদিমণির সঙ্গে কথা, কত কথা, রাজ্যের কথা রাজরাণীদের কথা, রাজা ঘোড়ায় চড়ে শিকারে যাচ্ছেন তার কথা—টগবগ করে ঘোড়া ছুটছে তার কথা—ঘোড়া ছুটছে, দিদিমণি—সেই ঘোড়া, কালো ঘোড়া ছুটছে। সামনে পাহাড়, পথ উঁচু টগবগ করে উঠে যাচ্ছে, থামছে না, ঘোড়ায় চড়ে যেন রাজা যুদ্ধে যাচ্ছেন। সুবল পায়ে ঠিক ঘোড়ার মত তাল দিতে থাকল। বলল, দেখো আমার পাখি কালো ঘোড়ার মত, রাজপক্ষী ঘোড়ার মত রাজার দেশে চলে যেতে পারে। সে যে কত বড় রাজার দেশ! দেশে কোন দুঃখ নেই, কত গাছ, কত ফুল ফল পাখি—বাজার দেশে মানুষের মুখে হাসি আর আনন্দ। সামনে সমুদ্র, রাজার দেশে হায় কোন দুঃখ জাগে না। কোটাল পুত্র, রাজার পুত্র মাণিক্যের আলোতে দুঃখের জন্য জাগে। দিদিমণি দুঃখ না থাকলে কষ্ট না থাকলে প্রাণে, আপনি বাঁশি বাজে না।

টুকুনকে খুশী রাখার জন্য, সামান্য সুবল আবোল তাবোল যা মনে আসে, যা মুখে আসে বলতে থাকে। টুকুনের সামান্য হাসি দেখার জন্য সে তার পাখি নিয়ে এসে জানালায় দাঁড়ায়। জানালায় দাঁড়ালে টুকুনের মনে হয় সুবল এসেছে পাখি নিয়ে। এই পাখির জন্য সে ট্রেনে হাততালি দিতে পারছিল না, এই পাখির জন্যে সুবলের জন্য সে হেঁটে গিয়েছিল। ওর মনে হয় ওর আর আলস্য থাকার কথা নয়, আর দূরে থাকার কথা নয়। আকাশে পাখি উড়তে থাকলে—অথবা ঘোড়া ছুটছে টগ বগ···তখন ঘোড়ার মত শক্তি যেন পায়ে খেলা করতে থাকে। রাজার হাতে অসি, অসি খেলা হচ্ছে, সুবল দুহাত দিয়ে ছোট্ট একটা তালগাছের মত বাঁশের বাঁট দিয়ে অসি বানিয়ে রাজার মত খেলা দেখাচ্ছে। যেন এক রাজা যুদ্ধে যাবার আগে সেনাপতিদের অসির নিয়ম কানুন বোঝাচ্ছে।

অথবা ওর হাতে কোন কোন দিন লাঠি থাকত। মেলার দিনে

সকলে যেমন লাঠি খেলা দেখায়—দূর থেকে ছুটে এসে লাঠিতে মাথায় বারি মারে অথবা এক দুই তিন, একপা, দু পা, তিন পা সামনে গিয়ে ফের পিছনে—লাঠি ঠিক কোমরের সামনে রেখে ফের এক পা দু পা এগিয়ে যাওয়া—দেখলে মনে হবে সুবল যেন পায়ের ওপর পাইকদের মত নাচানাচি করছে। জানালা থেকে টুকুন ওর সব রকমের নাচন কোঁদন দেখে হাসত। ওর পায়ে কি শক্তি কি শক্তি! পাখিব পাখায় কি রাজ্যের স্বপ্ন। মনে হত টুকুনের সমস্ত শরীরে সহসা বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে।

তারপর সুবল যখন ক্লান্ত হত অথবা নার্স ঘরে ঢুকলে সে ভাল মানুষের বাচ্চার মত দেবদারুব নীচে গিয়ে বসে বলত, এসে যান বাবু দেখে যান বাবু. জুতো সাফ কবে যান—এবং বলত, দু আনা পয়সা দেবেন—সুবল বেশী চায়না, শুধু খেতে পরতে চায়। বলত, আর এই পাখি আছে, পাখির জন্য কিছু সঞ্চয় করে নিচ্ছি। সে মন দিয়ে জুতো সাফ করে। সে পাখিকে টেরিটি বাজার থেকে কিনে আনা কীট পতঙ্গ খাওয়াত। ওর সুখের পাখি সখের পাখির জন্য প্রায় সময় সে স্বপ্ন দেখত। স্বপ্নে টুকুন দিদিমণি খুব সুন্দর এক জরীর টুপি মাথায় দিয়ে কনে বউ সেজে বসে আছে। সুবল লাঠি নিয়ে দু'পাশে নাচানাচি করছে। সুবল রাজার পাইক যেন। সুবল যেন লাঠি নিয়ে কনে বউকে খেলা দেখাচ্ছে লাঠির। পরণে জরীর কাপড়, মালকোঁচা মেরে সে কাপড় পরেছে। মাথায় পাগড়ী সুবলের। পাগড়ীতে পালক আছে। সে রাজার মত অথবা রাজপুত্রের মত কোন কোন সময়, যেন ঘরে কনে বউ ফেলে হরিণ শিকারে যাচ্ছে আর সেই শিকারের গল্প ভোর হলে অথবা বিকাল হলে বলা চাই।

সে বলত—সে এক হরিণ টুকুন দিদিমণি। হরিণের বনে হরিণ আছে। রাজার সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ আছে। বনে ঘন বন আছে। দু'চোখে বনের পথ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে সমতল মাঠ আছে,

মাঠে ঘাস আছে! রাজার পিঠে তীর ধনুক। একটি হরিণ জল খাচ্ছিল। মাঠের ভিতরে এত হরিণ অথচ একটা হরিণ জল খাচ্ছে। ছোট হরিণ —শুধু লাফায়, নাচে আর ঘাস খেতে সখ যায়, কিন্তু নরম ঘাস না হলে, কুয়াশায় ভেজা ঘাস না হলে হরিণ শিশু ঘাস খেতে পারে না।

রাজা ছুটছেন। বুঝলে দিদিমণি বনের ভিতর দিয়ে রাজা ছুটছেন। হরিণ ছুটছে। শিকার ধরার জন্য রাজা ছুটছে। কি বেগে ছুটছে! চারদিকে পাহাড়, ওপরে মধ্যিখানে হ্রদের পারে হরিণী ছুটছে। কি বেগে কি তালে তালে পায়ের খুরে আগুন জ্বলছে। পাথরে ঘসা লেগে পায়ের খুর জ্বলছে। হরিণীর বাচ্চা একা একা পথে তখন মাঠের ওপাশে হ্রদের জলে মুখ দিয়ে বসে রয়েছে। মা বুঝি আসছেন।

—বুঝলে দিদিমণি বিপদ বুঝতে পেরেছিল হরিণের বাচ্চারা।

—সে মাকে দৌড়তে দেখে সেও দৌড়াতে থাকল।

—রাজা ধরতে পারল সুবল?

—না! কি করে পারবে। হ্রদের পারে আসতেই রাজা দেখল পাথরের ঘসা খেয়ে ঘোড়ার পায়ে ফোসকা পড়েছে।

—ঘোড়ার পায়ে ফোসকা।

—বাপরে, আগুন জ্বলছিল পাথরে। হরিণের খুরে আগুন লেগেছিল।

—অঃ। টুকুন যেন আবার যথার্থ ই সবটা বুঝে ফেলেছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে দেখল টুকুন, সুবল চলে যাচ্ছে।—বড় জ্বালাচ্ছে! নার্স চীৎকার করতে চাইল। কিন্তু অবাক টুকুন খাটের উপর বসে রয়েছে। মুখে কোন অবসাদের চিহ্ন নেই। সব কিছু কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে ডায়াল করে বলল, সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু আছেন?

—কে।

—আমি সারদা বলছি।

সহসা এই ফোন সুরেশ বাবুকে বিস্মিত করেছে। কোন অঘটনের আশঙ্কা করলেন তিনি। তার বুক কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে আসছে। নার্স সারদার গলা কাঁপছে বলতে—সে ঠিক স্পষ্ট বলতে পারছে না। দুঃসহ খবরেব জন্য বুঝি ওব গলা কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু একি বলছে! কি বললে! কি বলল!

—টুকুন খাটের উপর বসে দিব্যি সেই সুবল ছোঁড়াটার সঙ্গে কথা বলছিল।

—ঠিক ঠিক বলছ?

—ঠিক। আমি দরজা দিয়ে ঢুকতেই সুবল পালিয়ে গেল।

—ডাক্তার বাবুকে খবর দিয়েছ?

—না।

—আগে তাকে খবর দেওয়া উচিৎ ছিল।

—এমন আনন্দের খবব আপনাকে আগে না দিয়ে তাকে দিই কি করে?

—শোন আমরা যাচ্ছি এখুনি। বলে ফোন ছেড়ে দিলেন সুরেশ বাবু।

তারপর কিছুক্ষণের ভিতরেই ওরা সকলে এসে গেল। ডাক্তার বাবু এলেন। তিনি টুকুনকে দেখে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। টুকুন কিছু কুঁচ ফল এবং চন্দনের বীচি নিয়ে এখন বিছানার ওপর একা একা আপন মনে খেলা করছে, সে ভিড় প্রায় লক্ষ্যই করল না। রাজার গল্প, ইঁদুরের গল্প, রাজপুত্রের গল্প অথবা এই যে এক পাখিয়ালা, সুবল যার আপন প্রাণে নিরন্তর বেঁচে থাকার উদ্যম, যে কোন এক খরা অঞ্চল থেকে চলে এসে এই সহরে ছুটে বেড়াচ্ছে সেই সুবল, বালক সুবল রাজার মত ওকে কেবল উৎসবের কথা বলে গেল। বেঁচে থাকার কথা বলে গেল। আপন প্রাণের তেজে উড়ে যাবার কথা বলে গেল।

সে চন্দনের বীচি কুঁচফল এবং রঙ-বেরঙের পাথরগুলো দেখতে দেখতে কেমন নিবিষ্ট হয়ে পড়ল।

—টুকুন তোমার শরীর ভাল হয়ে যাচ্ছে! মা মাথায় হাত রেখে বললেন।

—টুকুন একবার মার দিকে তাকাল। কোন কথা বলল না।

ডাক্তার বাবু বললেন, আমার হাত ধর টুকুন।

টুকুন ডাক্তার বাবুর হাত ধরল।

—এবারে উঠে দাঁড়াও।

—আমি পারব না ডাক্তার বাবু।

—সুবলের একটা পাখি আছে টুকুন।

—ওর পাখিটা ভারি দুষ্টু। ও রাজার মাথায়—বলে হো হো করে হেসে উঠল।

—তুমি দাঁড়াও। সুবল আজ আবার কখন আসবে।

—কখন আসে বলে না। ওদিকে একটা দেবদারু গাছ আছে, তারপাশে কোথায় যেন থাকে।

—তুমি দাঁড়াও। এইত উঠতে পারছ।

—আমি পারব না ডাক্তার বাবু।

—এইত হচ্ছে। আচ্ছা শোন তুমি সুবল এলে থাকতে বলবে, ওর সঙ্গে আমি কথা বলব। আচ্ছা শোন, ঠিক আছে, কাল আবার আমরা হাঁটার চেষ্টা করব।

ডাক্তারবাবু টুকুনকে বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং নার্সকে ইসারা করতেই নার্স বারান্দায় বের হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু নার্সের পেছনে পেছনে বের হয়ে ফিস ফিস করে বললেন, সুবল কখন আসে।

—ঠিক থাকে না। আমি না থাকলেই চলে আসে। ও যেন কি করে টের পায় কখন আমি থাকি না।

—ঠিক আছে। ও আসবে। ও টুকুনের সঙ্গে কথা বলবে। তবে যেন এক নাগাড়ে বেশীক্ষণ ও না থাকে। তোমার প্রতি সুবলের যে ভয়টা আছে সেটা সব সময় রাখবে।

—আমি ওকে বেশী আসতে দিই না।

—খুব বেশী না দিলেও তোমাকে মাঝে মাঝে কাজের অছিলায় বাহিরে বেশী সময় থাকতে হবে। সুবল এসে কথা বললে ও প্রাণের ভেতরে এক অশেষ আনন্দ পায়। এক ধরণের উত্তেজনার জন্ম হয়। আমরা সকলে যা পারিনি, সামান্য এক পাখিয়ালা তাই করে দিয়ে গেল।

—তবে ওকে ভিতরে নিয়ে এলে হয় না?

—না। তা হয়না সারদা। ওর যদি মনে হয় সুবল এখানেই থাকবে, সুবলের আর যাবার জায়গা কোথাও নেই, তবে ওর প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। কারণ এখন সুবল ওর কাছে যাদুকরের মত। স্রেফ অলৌকিক যাদুকর। আসে যায়, কখনও কখনও হারিয়ে যায়। আবার আসে। প্রত্যাশা ওকে বড় এবং ভাল করে তুলবে। বলে ডাক্তারবাবু অন্যমনস্কভাবে কেবল তুড়ি মারতে থাকলেন।

সুরেশবাবু বাইরে এসে বললেন, কেমন বিস্ময়ের ব্যাপার লাগছে সব!

সুরেশবাবুর স্ত্রী বললেন, ডাক্তারবাবু টুকুন সত্যি হাঁটতে পারবে?

—সব এখন পাখিয়ালা সুবলের উপর নির্ভর করছে।

—কেন কেন।

সুরেশবাবুর স্ত্রীর মুখ কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

—টুকুনের কাছে সুবল এখন আশ্চর্য এক যাদুকর। ওর পাখি, ওর কুঁচ ফল, চন্দনের বীচি, রঙ-বেরঙের পাথর আর সারদা যা বলল, কি সব আজগুবি গল্প বলে সে নাচতে থাকে কেবল। তার অর্ধেকটা বোঝা যায়, অর্ধেকটা বোঝা যায় না। রাজার গল্প, হরিণের গল্প, বন

পাহাড়ের গল্প, এবং পাখির গল্প বলে সে কেবল ছোটার অভিনয় করে। তখন টুকুনের, সুবলের পা দেখতে দেখতে বুঝি মনে হয়—হরিণের মত সেও ছুটছে, মনে হয় ঘোড়ার মত সেও ছুটছে, গল্পের সঙ্গে এই যে ছোটা, ছোটা আর ছোটা—প্রাণের ভিতর এই ছোটা কেবল আবেগের জন্ম দেয়। রক্তে উত্তেজনা আসে। হাতে পায়ে সেই উত্তেজনার রক্ত বইতে থাকে। টুকুনকে তখন খুব স্বাভাবিক দেখায়। এই ছোটার ভিতর সেই উদ্যমের কথাই বলা হচ্ছে সুরেশবাবু। আমরা এই উদ্যম হারিয়ে কেমন ক্রমশঃ টুকুনের মত স্থবির হয়ে যাচ্ছি। বলে ডাক্তারবাবু কেমন হাসফাঁস করতে থাকলেন!—আমাদের জীবনে এখন সুবলের মত এক পাখিয়ালা চাই। যে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসা দিয়ে আমাদের এই কঠিন রোগ সারিয়ে তুলবে। বলে তিনি ফের অন্যমনস্ক ভাবে হাতে তুড়ি মারতে থাকলেন।

হাতে তুড়ি মারতে থাকলেন ডাক্তারবাবু, জনার্দন ছুটতে থাকল মাঠ দিয়ে। বুকে পলা। হরিণ শিশু পলা জনার্দনের বুকের ভিতর চুপটি করে আছে। কোন ভয় ডর যেন নেই। কান খাড়া করে দেখছে পেছনে ওর মা অপলা, বোন অচলা আসছে। ছুটে ছুটে আসছে না। কারণ জনার্দন ভাবছিল সে খুব দ্রুত ছুটছে, কিন্তু জনার্দনের মনে নেই বোধ হয়—ওর শরীর বড় ক্লিষ্ট, শরীরে কোন শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। চোখ মাঝে মাঝে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ছে। মনে হয় সব কিছু ঝাপসা। আবার কেমন সামান্য জল খেলে চোখের ভাবটা ফিরে আসে।

জনার্দন ছুটছিল। কারণ সে অন্য দুই হরিণকে ভয় পাচ্ছিল। শুধু ফাঁকা মাঠ। বালি শুধু মাঠে। এখনও রোদ ওঠেনি বলে বালিতে কোন উত্তাপ জমছে না। পাহাড়ের নীচটা ক্রমশঃ সাদা হয়ে উঠেছে। অন্য পাশে চাঁদের মরা গোল সোনার বাটি সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। দু-একটা শকুন উড়ে যাচ্ছিল কোথাও। কোনদিকে

এই শকুনেরা উড়ে যাচ্ছে অন্যদিন হলে জনার্দন একটু সময় অপেক্ষা করে দেখত। কিন্তু আজ এই পলা তার বুকে। এই পলার চোখ ওকে ভয় দেখাচ্ছে—জনার্দন ক্লিষ্ট শরীর নিয়ে ছুটছিল আর মাঝে মাঝে পেছনের দিকে তাকাচ্ছিল। ওরা এখনও জনার্দনকে অনুসরণ করছে। ওরা অর্থাৎ দুই হরিণী। অচলা অপলা। সে এবার নুয়ে একটা পাথর তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল। পাথরটা বেশী উঁচুতে উঠল না। কিছুদূরে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। হরিণীরা সেই পাথর নিক্ষেপের জন্য অল্প সময় থমকে দাঁড়াল। পাথরটা গড়িয়ে আসছে। জনার্দন ওদের ভয় দেখানোর জন্য থেমে থেমে পাথর ছুঁড়ে যাচ্ছিল। আর হাত তুলে—যা আমার সঙ্গে কেন! যা বলছি! ভয়ে কেমন টেঁসে যাচ্ছিল জনার্দন। জনার্দন পিছন ফিরে তাকালে ওরাও থেমে যেত। জনার্দন ছুটতে থাকলে ওরাও ছুটত। জনার্দন পাথর নিক্ষেপ করলে ওরা দু পা তুলে পাথর রোখার চেষ্টা করত। অথবা যেন পাথরটাকে গুঁতো মারতে আসছে তেমনি শিং বাগিয়ে ধরত।

পাহাড়ের ভিতর দূরে সুবচনীর মন্দির দেখা যাচ্ছে। চার পাশে বনের মত। পাতা নেই কোন গাছে। ফলে গাছগুলো যেন মৃত। শুকনো এক ভাব—মনে হয় আগুন লাগলে দাবানল জ্বলবে। চারিদিকে তাকানো যাচ্ছে না। চারিদিক মরুভূমির মত হাহাকার। মাটি, মরুভূমি বুঝি গ্রাস করছে। জনার্দনের আর পা চলছিল না। সুবচনী দেবী কিছুতেই প্রসন্না হচ্ছেন না। তিনি প্রসন্ন হলে সংসারে আর দুঃখ কিসের! ঠিক তক্ষুণি পলা ওর বুকে ডেকে উঠল। ভয়ে ডেকে উঠল। জনার্দনের চোখে লোভ লালসা ভেসে বেড়াচ্ছে। জনার্দন থর থর করে কাঁপছিল। যত এগিয়ে যাচ্ছে সুবচনী দেবীর মন্দিরের দিকে উঠে যাচ্ছে ঠিক তত সে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ছে। এবং মন্দিরের ভিতর ঢুকেই পিছন ফিরে তাকাল। দেখল ঠিক মন্দির সংলগ্ন একটা

ত অর্জুন গাছের নীচে দুই হরিণী বসে রয়েছে। ওরা ওদের বাচ্চাকে ফিরিয়ে নিতে চায়।

জনার্দন আর অপেক্ষা করতে পারল না। সে ভয়ে ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল। কারণ জনার্দনের ভয় ওর ক্ষীণ শরীর সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে পড়বে। যদি হরিণী ওকে আক্রমণ করে তবে ওর পেট ফুঁড়ে যাবে। কিন্তু দরজা বন্ধ করতে মনে হল, ওর কোলের ওপর থেকে হরিণ শিশুটা লাফিয়ে নীচে পড়ে গেল আর মনে হল সে ক্রমশঃ যে দৃষ্টিহীনতায় ভুগছিল, এখন সেই দৃষ্টিহীনতা ওকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। সে অন্ধকার দেখল চারিদিকে। সে হরিণ শিশুকে ডাকল, পলা পলা! সে লোভের গলায় ডাকল। গলা মুখে যেই নোনতা স্বাদ, বলে সেই আগুনের ছবি যেন কোন আদিম মানুষের বনের ভিতর হরিণের মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছে। পলা সুবচনী দেবীর পেছনে চলে গিয়ে ঘুপটি মেরে বসে রয়েছে। জনার্দনের চোখের ছবি দেখে বুঝতে পারছিল যেন মানুষটা ওকে এবার চিবিয়ে খাবে। ভয়ে পলা কোন শব্দ পর্যন্ত করল না। একবার উঠে গিয়ে দরজার কাছে মাথা ঠুকল। বের হবার চেষ্টা করল।

জনার্দন—অন্ধ জনার্দন দরজায় শব্দ শুনে ছুটে গেল। কিন্তু কোথায়! অন্যদিকে বোধহয়। সে শব্দ শুনে এবার হরিণ শিশুকে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে থাকল। এবং প্রায় অজগর সাপের মত সে মেঝের ওপর শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হরিণের পায়ে হাত রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু হায় হরিণ শিশু লাফাচ্ছিল, নাচছিল—ওর এখন প্রায় খেলার মত হয়ে গেল। চারিদিকে পাথরের দেয়াল। ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য বাতাস আসছে। জনার্দন দরজা বন্ধ করে রেখেছে। জনার্দন অন্ধ। সুবচনী দেবীর খাঁড়া মাথার ওপর ঝুলছে। ফুল বেলপাতা শুকনো যেখানেই পলা গিয়ে দাঁড়াক না কেন মনে হয় ঐ দিকে। মনে হয় এখন পলা কাঁসর ঘণ্টার নীচে, মনে হয় পলা এখন ঢাক ঢোলের

নীচে, মনে হয় পলা এখন সুবচনী দেবীর মাথার ওপর উঠে বসে আছে। অথবা মনে হয়, পলা ঘরময় হেগে মুতে বেড়াচ্ছে।

জনার্দন সারাদিন ধরে পলাকে ধরার চেষ্টা করল। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ওর রাগে দুঃখে চোখ মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। সামান্য এক হরিণ শিশু ওকে নিয়ে রঙ্গ তামাসা করছে। সে হুংকার দিয়ে উঠল। যেখানে খাঁড়াটা ঝুলছিল তার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর খাঁড়াটা দড়ি থেকে খুলে ছুটে গেল মায়ের পাশে—মা আমার ক্ষুধা পেয়েছে। মা আমি না খেতে পেয়ে অন্ধ হয়ে গেছি। শরীরে শক্তি নেই মা। সে খাঁড়া নিজের মাথায় রেখে কেমন পাগলের মত শুয়ে পড়ল মেঝের উপর। পলাকে পুড়িয়ে মাংস খাবার ক্ষমতা তার আর থাকল না।

কিন্তু হায় সব পাগলের কাণ্ড। আত্মহত্যার মত এই ঘটনা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। জনার্দনের মনে হচ্ছিল সে মরে যাচ্ছে। খাঁড়ার ঘায়ে ঘাড়ের কিছুটা অংশ কেটে গেছে। ভোঁতা খাঁড়ার আঘাত ভাল করে লাগেনি। তবু ঘাড়ের ক্ষত স্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে শান ভেসে যাচ্ছিল। এবং মনে হল এবার জনার্দন সত্যি মরে যাবে। কিন্তু পলার কথা মনে হতেই মনে হল ঘরের ভিতর থেকে এক অবলা পশু মরে যাবে। সে কেঁদে উঠল, মা মাগো। আমাকে আর সামান্য শক্তি দে। আমি মা দরজাটা খুলে দি।

শান ভেসে যাচ্ছে রক্তে। ওর জিভে সেই রক্তের স্বাদ নোনতা লাগল, সে তাড়াতাড়ি ওপুড় হয়ে সেই রক্ত চাটতে থাকল। আহা আহা খাদ্যবস্তু। এমন খাদ্যবস্তু সে যেন কতকাল আহার করেনি। নিজের রক্ত পানে সে উল্লাসে ফেটে পড়ল। এত স্বাদ। এত স্বাদ এই রক্ত পানে এত স্বাদ। সে উল্লাসে উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াতে পারল। সে অন্ধ হলেও রক্তটুকু সে চেটে চেটে খেয়ে ফেলল। খেয়ে ফেলতেই ওর মনে হল কতকাল পর আহার করেছে। সে কতকাল

পর আহার করেছে। সে কতকাল পর আহার করে উল্লাসে জয়ঢাক বাজাচ্ছে। জয়ঢাক, ঢাক ঢোল বাজাচ্ছে। সে বাজাচ্ছিল না অন্য কেউ বাজাচ্ছে।—কৈ রে পলা গেলি কৈ। সে ওঠে দাঁড়াতে পারল, সে হেঁটে যেতে পারল। দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারল। টলতে টলতে সে দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেল। খিল খুলে দিয়ে বলল, যা অবলা হরিণ শিশু চলে যা। যদি কোন কালে বৃষ্টি হয় তবে বলবি—এই সংসারে জনার্দন চক্রবর্তী বলে একটা লোক ছিল, সে তার সব ভালবাসা দিয়ে, মন্ত্র দিয়ে এই দেশের প্রাণ প্রাচুর্যকে রক্ষা করতে চেয়েছিল—পারেনি।

একি! কিসের এত শব্দ! মনে হয় পৃথিবী দুলে উঠছে। মনে হয় পাহাড় টলছে। মনে হয় আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে। মনে হয় ঝড়ে দেবীর মন্দির গাত্রে পাথর ছুটে আসছে। যেন এক প্রলয়। জনার্দন দু'হাত তুলে সেই উলঙ্গ রাত্রির ভিতর ডাকল, পলা, অপলা অচলা কোথায় গেলি। ঝড়ে মরে যাবি। তোরা মরে গেলে এই অঞ্চলে আমার চেষ্টার সাক্ষী কেউ থাকল না। তোরা মন্দিরের ভিতর চলে আয়। এই ঝড়ে পড়লে তোরা মরে যাবি।

কিন্তু জনার্দন ওদের কোন শব্দ পেল না। মনে হল অর্জুন গাছটা ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। মনে হল ভিতরে যত ফুল বেল পাতা ছিল সব উড়ে যাচ্ছে, মনে হল সেই হরিণ শিশুরা এখন লাফিয়ে চলছে। আর আর আর মনে হল—এটা কি হচ্ছে। বৃষ্টি। বৃষ্টি! মা, মা, বৃষ্টি হচ্ছে। মা মা, মাগো সুবচনী তোর এত কৃপা, তোর এত রূপ। মা আমি যে আর কিছু ভাবতে পারছি না।

জনার্দন মন্দিরের ভিতর পর্বত প্রমাণ দৈত্যের মত লুটিয়ে পড়ল।

৮

ডাক্তারবাবু ভিতরে ঢুকে বললেন, তুমি আজ বাড়ি যাবে টুকুন।

—সত্যি!

—সত্যি।

টুকুন বলল, আমি সত্যি বাড়ি যাব। ওর চারপাশে যা কিছু আছে—এই ভেবে একবার দেখল সব। তেমনি জানালা খোলা। মা-বাবা আসবেন। কখন আসবেন এই ভেবে টুকুন অধীর হয়ে উঠল। নার্সিং হোমের এদিকটায় একটা সবুজ মাঠ। এবং জানালা খুললেই চোখে পড়ে হাজার মানুষের মিছিল—এই কলকাতা শহরে এত মানুষ কেন? কোথায় যায়—কি করে এরা, টুকুন ভেবে পায় না। কিন্তু টুকুন যেজন্য জানালায় বসে আছে এবং খোলা রেখেছে, নার্স এলে বলেছে, সুবল এসেছিল সিস্টার? সুবল কি আমার ঘুমের ভিতর ঘুরে গেছে?

সিস্টার বলল না।

—সে কেন এল না! আমি বাড়ি চলে যাব—সে না এলে কি করে আমি বাড়ি যাব?

সিস্টার বলল, তোমার মা-বাবা এসে নিয়ে যাবে।

—মা-বাবা তো সব সময়ই আসছে, ওরা আমাকে যখন খুশী নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সুবলকে যে আমার বলা হয় নি, আজ আমি চলে যাব। সে এখানে এলে আমার ঠিকানা পাবে কি করে?

—আমি দেব। তোমার বাড়ির ঠিকানায় চলে যাবে। তোমাদের কত বড় বাড়ি, চিনতে ওর অসুবিধা হবে না।

—সে তো বলেছে, টুকুন দিদিমণি, আমি কলকাতার পথ-ঘাট চিনি না। তুমি যখন বাড়ি যাবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিও।

—সে ঠিক চলে যাবে।

—কিন্তু মা কি ওকে নিতে চাইবে?

—নেবে না কেন? এত বড় একটা অসুখ তোমার সে সারিয়ে দিল। আমরা সবাই যা করতে পারিনি, কোথাকার এক পাখিয়ালা এসে সব করে দিল, ভাবা যায় না।

—কোথাকার বলতে নেই সিস্টার। সুবল খুব ভাল ছেলে। সে আমাকে চন্দনের বীচি কুঁচফল দিয়েছিল।

—খুব ভাল। ঐ যা একটা পাখি রেখেছে বাঁশের চোঙে আর লম্বা আলখেল্লার মত পোশাক। মনে হয় আমরা তিন চারজন ওর ভিতর ঢুকে যাব।

—সিস্টার আমি একটু জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে চাই এখন।

—আমি ধরছি।

—না আমি নিজে হেঁটে যাব। সুবল যে কখন আসবে!

সুবল এলেই যেন টুকুনের সব হয়ে যায়। সে কখনও জানালা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না। সে ক'দিন আগে মাত্র উঠে বসতে পেরেছে। গতকাল তাকে ধরে ধরে হাঁটা শেখানো হচ্ছিল। বার বার হাঁটতে গিয়ে টুকুন পড়ে যাচ্ছিল। পারছিল না। নার্স এবং আয়া মিলে দু পা হাঁটতে সাহায্য করেছে। একে ঠিক হাঁটা বলে না, কিছুটা সান্ত্বনা দেবার মত ব্যাপারটা ছিল—তুমি হাঁটতে পার টুকুন, আর কি, এবারে তোমাকে আমরা অনেক দূরে নিয়ে যাব। কোন বড় পাহাড়ে। সেখানে পাইন গাছ থাকবে, শীত থাকবে, বরফের পাহাড় জমবে। তুমি ফারের কোট গায়ে দিয়ে লম্বা সরু দুটো লাঠি হাতে নিয়ে দু পায়ে স্কেটিং করবে। এ-পাহাড় থেকে সে-পাহাড়। এ-উপত্যকা থেকে সেই অন্য উপত্যকায়—অনেকটা পাখিয়ালা সুবলের মত ভাষা, সুবল যে জানালায় এসে বলত, টুকুন দিদিমণি, ছাখো কেমন পাখি উড়ে যায়, ছাখো কেমন ঘোড়া ছোটে, ছাখো কেমন নিরিবিলি

আকাশে মেঘেরা উড়ে বেড়ায়—তুমি টুকুন দিদিমণি, রাজার মেয়ের মত ঘোড়ায় চড়ে স্ফটিক জলের নীচে রুপোর কৌটা খুঁজতে যাবে না? আমি তোমায় নিয়ে যাব। তখন টুকুন কেমন ছেলেমানুষের মত বড় বড় চোখে তাকায়। হাতের ইশারাতে সুবল যা কিছু দেখায়—টুকুনের মনে হয় সব সত্যি। সে সব পারে। সে রাজার মেয়ের মত রাজ্যের সব দুঃখী রাজপুত্রদের স্বয়ংবর-সভা ডাকতে পারে। সেই সুবল কেন যে এখনই এল না!

টুকুন বলল, কি সুন্দর দিন!

সিস্টার বলল, ভারি সুন্দর।

—সুবল আমাদের ট্রেনে উঠে এলে পুলিস এসেছিল সিস্টার।

—পুলিস।

—হ্যাঁ পুলিস। ওরা তো জল খাবে বলে মাঝ-রাস্তায় ট্রেন আটকে দিয়েছিল।

—ও মা, কি বলে টুকুন!

—হ্যাঁ সত্যি সিস্টার। ওদের দেশে খুব খরা। জল নেই। লঙ্গরখানা বন্ধ। জলের অভাবে চাষবাস হয় না। গাছ পালা পুড়ে গেছে। সারা মাঠ খাঁ খাঁ করছে।

—সত্যি?

—সত্যি সিস্টার। আমাদের ট্রেনটা থামিয়ে দিলে বাবা তো ভয়ে কাঠ। ওদের কি চেহারা! সুবলকে এখন দেখে চেনাই যায় না। ওর শরীরে মাংস ছিল না। লিকলিকে। কাঠির মত হাত-পা। অথচ কি সুন্দর হাসিমুখ সুবলের, কি সুন্দর সরল চোখ!

সিস্টার বলল, গ্রামের মানুষদের এমনই মুখ চোখ হয় টুকুন।

টুকুন বলল, না দিদিমণি, হয় না। আমাদের কামরায় কেবল তো সুবল ওঠেনি, আরও অনেকে। ওদের দেখলে সিস্টার আপনিও ভয় পেতেন। আমি তো ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলাম, কিন্তু সুবল এসে

শিয়রের কাছে দাঁড়াতেই আমার মনে হয়েছিল সিস্টার, একজন বালক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়িয়েছে।

সিস্টার না বলে যেন পারল না, টুকুন তুমি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারছ দেখছি।

—সিস্টার আমি জানি না, কি করে এমন সুন্দব কথা বলতে শিখে গেছি। আগে মা বলত, আমি একটাও কথা বলতাম না। সব তাতেই আমি বিরক্ত হতাম। শুধু চুপচাপ শুয়ে থাকা ছিল আমার কাজ। আমি এখন কেমন উঠে বসতে পারি, হাঁটতে পারি।

সিস্টার জানে—টুকুন ঠিক হাঁটতে জানে না। টুকুনের বয়স কত—এই বারো-চোদ্দ হবে, টুকুনের অসুখ কবে থেকে, সেই কবে থেকে যেন, সাল-তারিখ সবাই ভুলে গেছে—এত লম্বা অসুখ মানুষের কি করে হয়—কি যে লম্বা অসুখ, ঠিক ঘোড়দৌড়ের মাঠেব মত, রেসের মাঠে যেমন একটা ঘোডা অনন্তকাল ছুটেও শেষ করতে পারে না, তেমনি মনে হয় টুকুন এক অনন্তকালের ঘরে অসুখের দরজায় বার বার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এমন অনেকবার হয়েছে। সে বেশ ভাল হয়ে গেছে। হেসে খেলে বেড়িয়েছে—আবার কি করে যে একটা অসুখের ভিতর পড়ে যায়—সে জানে না কি করে সে রুগ্ন হয়ে যায়, ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখের নীচটা ফুলে যায়। তখন শরীরের যাবতীয় কিছুতে কড়া পাহারা এবং এই করে কতকাল থেকে মা-বাবা বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভিতর পড়ে গেল টুকুনের। প্রতিযোগিতা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের।

টুকুন বলল, এখনও সুবল আসছে না।

—এসে যাবে।

—আমি জানালায় যাচ্ছি। বলে টুকুন নিজেই উঠে বসার চেষ্টা করল। ওর হাত-পা লম্বা। গায়ে মাংস সামান্য লাগায় মুখটা বেশ ভরা দেখাচ্ছে। সব কিছুর ভিতর আছে কেবল ওর দুটো সুন্দর চোখ।

মনে হয় আশ্চর্য নীল চোখ। চোখের মণিতে এখনও ছায়া দেখা যায়। কেউ এসে পাশে দাঁড়ালেই ছায়াটা নড়ে ওঠে। সিস্টার টুকুনকে পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে চাইলে হাতটা ঠেলে দিল।—না সিস্টার, আপনি দেখুন আমি ঠিক ঠিক উঠে যাচ্ছি। আমার উঠতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। বলে সে অনায়াসে উঠে বসলে, বলল, কেমন ঠিক আমি উঠতে পেরেছি।

টুকুনকে আজ সকালেই হলুদ রংয়ের একটা ফ্রক পরানো হয়েছে। নরম সিল্কের। রংটা ভারি উজ্জ্বল। লতাপাতা আঁকা ফ্রক। কোথাও দুটো প্রজাপতি মুখোমুখি বসে—এবং নানা রংয়ের ছবি ফ্রকে। ওর সেই খেলনাগুলোর মত। এই বয়সেও টুকুন খেলনার জগতে থাকতে ভালবাসে। এই খেলনার জগতে সে কখনও রাণী হতে ভালবাসে, অথবা রাজকন্যা। ওর কুতুমাসি বেড়ালটা ভারি বজ্জাত। যখন টুকুন এমন ভাবে, তখন বেড়ালটার গোঁফ নড়ে ওঠে। টুকুনের তখন ইচ্ছে হয় আছার মেরে ভেঙে ফেলতে। সে পারে না। কারণ সে উঠতে পারে না, হাঁটতে পারে না। ক'দিন কোন হুঁশ ছিল না। সুবল এসে খুঁজে পেতে ঠিক জানালায় আবিষ্কার করে ফেলে, আবার ওকে উৎসাহ দিল। বাঁচার উৎসাহ। কি এক জাদুকরের মত সুবল হাত-পা নেড়ে কেবল নেচে নেচে গ্রাম্য সঙ্গীত সুর করে বলে যেত।

এখনও সুবল আসছে না। সিস্টার অবাক—আজ এমন প্রতীক্ষা একজন মানুষের জন্য টুকুনের, যে এলেই বলবে তুমি যাবে আমাদের বাড়িতে। এই আমাদের ঠিকানা। দেখবে খুব বড় বাড়ি। সামনে বড় জলাশয়। চারপাশে অনেক দিনের পুরনো পাঁচীল। ভিতরে অজস্র গাছপালা। এবং জলাশয়ের পাশে সুন্দর এক আট্টালিকা। অট্টালিকার ছায়া যখন সেই জলাশয়ে ভাসতে থাকে তখন মনে হবে সুন্দর এক রাজকন্যার সন্ধানে কোন রাজপ্রাসাদে ঢুকে গেছে।

সিস্টার অবাক, ভারি সুন্দর পা ফেলে ঠিক ওর মনে আছে, সে এমন পা ফেলে হেঁটে গেছে—সেই বরে, এখন ভারি স্বপ্নের মত মনে হয়—সে একজন মানুষের উদ্দেশ্যে এমন পা ফেলে হেঁটে গেছে, বাড়িতে কি সব আলো জ্বালানো হয়েছিল সেদিন, সকাল থেকে শানাই বেজে চলেছে, সে সকাল থেকে হলুদ রংয়ের শাড়ি পরেছিল, এবং পায়ে পায়ে হাঁটা, প্রতীক্ষা, আশ্চর্য প্রতীক্ষা থাকে মানুষের। সে কখনও জানে না কি ভাবে সেইসব প্রতীক্ষার দিনগুলি মরে যায়। এখন টুকুন জানালায় যে ভাবে হেঁটে যাচ্ছে, ধারে ধারে গুণে গুণে পা ফেলে, কেউ যেন দুপাশ থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যেমন তাকে কেউ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, পীঁড়িতে বসিয়ে দেবার জন্য, লাল বেনারসী, চুমকি-বসানো ওড়না, মুখে কপালে ঘাম, পা গুণে গুণে হাঁটা, টুকুন ঠিক সেইভাবে জানালায় হেঁটে যাচ্ছে।

টুকুন বলল, সিস্টার আপনি বলেছিলেন আমি হাঁটতে পারি না।

—আমি দেখেছি টুকুন। তুমি ঠিক হাঁটতে পার।

—আজ মা-বাবাকে বলবেন কিন্তু আমি জানালা পর্যন্ত হেটে গেছি।

—বলব।

—কি সুন্দর লাগে!

—আমি তোমাকে ধরে থাকব।

টুকুন জানালার গরাদে হাত রেখে বেশ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কষ্ট হচ্ছিল—কষ্ট হোক, পায়ে এভাবে রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে, মেয়েটা একদিন ঠিক অশ্বের মত হয়তো দৌড়ে যাবে। কত জায়গায় না গেছে। এই অসুখ নিরাময়ের জন্য মিঃ মজুমদার হিল্লি-দিল্লি কম করেননি। অথচ মেয়েটা সেই যে কী হয়ে থাকল, চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, আর ভাল হতে চাইল না। তারপর সেই খরার দেশের ওপর দিয়ে ট্রেন এসে গেল। ট্রেন আটকে দিল মানুষেরা। লুটে-পুটে ট্রেনের জল খেয়ে নিল। খেয়ে নিয়ে কেউ নেমে গেল না। ওরা

শহরে-গঞ্জে চলে যাবে বলে ট্রেনে বসে থাকল। তারপর অন্য স্টেশনে, পুলিস। কড়া পাহারায় সব মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল। টুকুন শুয়ে শুয়ে আশ্চর্য এক মানুষের গল্প করার সময় এমন বলেছে।

—জানেন সিস্টার, সুবলের একটা বাঁশের চোঙ ছিল। কত যে রাজ্যের কীট-পতঙ্গ ওর পকেটে!

—ও সব দিয়ে ও কি করত?

—ওর পাখির জন্য ধরে এনেছে।

—পাখিটার কি নাম?

—কি যে নাম জানি না।

—ট্রেনে উঠে তোমাদের কামরায় সরাসরি?

—আমি দেখলাম, ওরা এসেই বাথরুমে চলে গেল। জলের কল খুলে দিল। অঞ্জলী পেতে কেবল জল খেতে থাকল।

—তারপর?

—তারপব অবাক আমরা, কি করে সুবলের কোল থেকে সব পোকা-মাকড় উড়ে গেল। এবং সারাটা কামরা ভরে গেল।

—ও মা, তাই বুঝি?

—বাবা ভীষণ বিরক্ত। কিন্তু যতসব ক্ষুধার্ত লোক একটু জলের জন্য যখন এমন করতে পারে তখন ভয়ে বাবা কিছু বললেন না। পোকাগুলো সারাটা কামরায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা বসতে পারছি না। আমাদের মুখ-চোখ সব ঢেকে গেছে।

—সত্যি!

—সত্যি সিস্টার! কিন্তু সুবল নিমেষে সব সাফ করে দিল।

—কি করে?

—কিছু না। সে তার বাঁশের চোঙ থেকে বলল, যা পাখি উড়ে যা! পাখি উড়ে গেল। উড়তে থাকল। সব এক দুই করে খেতে

থাকল। বড় বড় পোকমাকড় সব ধরে এনে সুবলের কোলের ভিতর পুরে দিতে থাকল পাখিটা।

তারপর টুকুন অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। সে চুপচাপ, চারপাশের মাঠ, রাস্তা, ট্রামগাড়ি, বাসগাড়ি দেখছিল। বেশ চলছে কলকাতা শহর। চলে, যাচ্ছে, কেবল চলে যাচ্ছে। টুকুন বারান্দায় দাঁড়ালে, সে কলকাতা শহর কেবল দেখতে পায় চলে যাচ্ছে। কেবল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দালান কোঠাগুলি আর লাইটপোস্ট, ইলেকট্রিক তার এবং নিরবধি কালের এই আকাশ।

এমন দেখতে দেখতে সে তন্ময় হয়ে যায়। তখন মনেই হয় না, এই শহরের কোথাও সুবল বলে একজন বালকের নিবাস রয়েছে। যে এসেছিল এদের সঙ্গে, যাকে মা ব্যাণ্ডেলে নামিয়ে দিল। যার কেউ নেই। মা নেই, বাবা নেই। সংসারে সুবল একা এক মানুষ। অথচ আশ্চর্য, তার কোন ভয় নেই। মা-বাবা না থাকলে সংসারে কি যে ভয়। টুকুনের ভয়ে চোখ বুজে এল।

সে চোখ বুজেই বলল, জানেন সিস্টার, সুবলের কেউ নেই। মা নেই, বাবা নেই, কেউ না থাকলে কি কষ্ট না!

—খুব কষ্ট। এবার এস তোমাকে শুইয়ে দিচ্ছি। একসঙ্গে বেশী সময় দাঁড়িয়ে থাকতে নেই।

—আমার কিন্তু কোন কষ্ট হচ্ছে না।

—তা না হোক। তবু তোমার এখন শুয়ে থাকা উচিত।

সিস্টার জানে বেশী সময় দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা ওর নেই। এবং যদি দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় তবে কেলেঙ্কারী। সে বলল, আমি জানলায় আছি, সুবলকে আসতে দেখলেই বলব সুবল আসছে।

—আপনি ঠিক চিনতে পারবেন না।

—আমি এত দেখলাম, কেন চিনতে পারব না!

—না। আমার মনে হয় আপনি ওকে ভুলে গেছেন। সে থাকে

জানালার বাইরে। আপনি ভিতরে। আপনি তাকে কতটুকু দেখেছেন!

তা ঠিক। সিস্টার খুব একটা বেশী দেখেনি। ছেলেটা এলেই কেমন বিরক্তিকর ঘটনা। সিস্টার দূরে অন্য কাজে মন দিত। কি যে এত কথা এমন একটা সুন্দর বড়ঘরের মেয়ের সঙ্গে—কোথাকার হাভাতে একটা ছোঁড়া, সে এলেই কেমন টুকুন হাতে-পায়ে বল পায়। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, সে এলে তাকে যেন টুকুনের সঙ্গে কথা বলতে অ্যালাউ করা হয়—সুতরাং সিস্টার আর কি করে এবং এখন মনে হল, সুবলকে সে খুব একটা ভাল লক্ষ্য করেনি।

টুকুন এবার ধীরে ধীরে বলল, জানেন সিস্টার কেউ একা এমন ভাবতে আমার কেন জানি ভারি কষ্ট হয়। আমার তখন কিছু ভাল লাগে না।

টুকুন একা—এটা ভাবতে ওর আরও কষ্ট। কখনো কেউ একা থাকলে—কেউ না থাকলে—টুকুনের মনে হয় সে যদি এমন একা হয়ে যায়। কেউ নেই। বাবা নেই, মা নেই। ওর দেখাশোনার মেয়ে শেফালি নেই—কি যে হবে তখন—ওর কি যে কষ্ট, ঠিক সুবলের মত সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। একটা গাছের নীচে বসে থাকলে তার ভেউ ভেউ করে শুধু কান্না পাবে।

এ-জন্যেই ওর ভিতর সুবলের জন্য কেমন মায়া পড়ে গেছে। সে জানে ওর যা বয়েস—এ-বয়সে অনেক কিছু হবার কথা। অথচ কি আশ্চর্য, তার শরীরে কোথাও সে সব লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। মা-বাবার কথাবার্তা অথবা ডাক্তারের কথাবার্তা থেকে সে ধরতে পারে—জননী হতে গেলে যা যা লাগে এই বয়সে তার কিছু তার ভিতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। সে কেমন দুঃখী গলায় এবার বলল, সিস্টার আমাকে ধরুন। আমি পায়ে হেঁটে আর যেতে পারছি না।

মেয়ের এমনই এক রোগ। হতাশা বুকে। এখন মনে হয়

মেয়ের বয়স ষোলর মত। ফ্রক কি খালি গায়ে রাখলেও কোন ক্ষতি নেই। সে যেন ইচ্ছা করলে একটা সিল্কের গেঞ্জি পরে থাকতে পারে। পুরুষ মানুষের মত হেঁটে বেড়াতে পারে। এবং এ-ভাবেই মেয়ের অসুখ বেড়ে গেল। এখন মনে হয় বয়স আরও বেশী টুকুনের, হিসাব করলে ষোল-সতেরো। ফ্রক গায়ে দিয়ে কচি বালিকা সেজে বসে আছে—এবং ইহজীবনে বুঝি টুকুন আর এ-বয়স পার হবে না। অথচ আশ্চর্য সুন্দর মুখ টুকুনের। মেয়েদের এমন সুন্দর মুখ হয়! আহা আশ্চর্য চোখের তারায় কি যে মায়া। সে সুবলের জন্য এখন বিছানায় শুয়ে কেমন প্রার্থনা করছে। ঈশ্বর, যাদের কেউ নেই, তুমি তাদের আছ। তুমি তাদের দ্যাখো।

সে শুয়ে আছে। পা দুটো সোজা। একটা সাদা চাদরে ঢাকা। এবং ফের মোমের মত মুখ হয়ে গেছে। চোখ প্রায় স্থির। কেমন কষ্টদায়ক মুখের ছবি। তাকে কোন কফিনের ভিতর রাজকন্যার মমির মত লাগছে এবং এ-ভাবেই সিস্টার দেখে অভ্যস্ত। এই যে একটু সময় জানালায় গিয়ে দাঁড়াল সেটাই বড় বিস্ময়ের ব্যাপার। টুকুনকে যারা দেখেছে, তাদের কাছে টুকুনের এমন ভঙ্গীতে শুয়ে থাকার ব্যাপারটাই বরং স্বাভাবিক, টুকুন যে জানালায় হেঁটে গিয়ে সেই সুবল নামক বালকের জন্য প্রতীক্ষা করছিল কে বলবে!

টুকুন বলল, জল খাব সিস্টার।

সিস্টার জল দিলে বলল, সে এলে আমায় কিন্তু ডেকে দিও। আমার এখন খুব ঘুম পাচ্ছে।

৯

সুবল সকাল সকাল উঠেই ফুটপাথের কলে স্নান করে নিয়েছে। সে একটা ঘর এখনও পাচ্ছে না। সে যা আয় করছে, বাবুরা ওর ভাজা-ভুজি কিনে যা দেয়, তাতে ওর দু বেলা ছাতু খেয়ে বেশ চলে যাচ্ছে। আর পয়সা বাঁচে না যা দিয়ে সে একটা ঘর, খুপড়ি ঘর ভাড়া নিতে পারে। এখানে সে দু-একজন লোকের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পরিচয় করে ফেলেছে, যেমন অজিত সাহা লোকটি তাকে অন্য ব্যবসা করতে বলছে —এই যেমন মটর কিনে সেদ্ধ করে রং মিশিয়ে মটরশুঁটির মত বাজারে বিক্রি করা। সিনেমার শো ভাঙলে সে অনায়াসে এই সব বিক্রি করতে পাবে।

সুবল বলেছিল, রং মেশাতে হবে কেন?

—রং না মেশালে শুকনো মটর মনে হবে, সবুজ মনে হবে না।

—রং তো লোকে খায় না!

—খায় না, খেতেও নেই। ওতে অক্সাইড থাকে, পেটে ঘা করে দেবার পক্ষে ভাল।

—ওতে মানুষের ক্ষতি হয় অজিতদা।

—মানুষের ক্ষতি হলে তোর কি? তোর ক্ষতি না হলেই হল।

—তা হলে এটা তো ভাল না। মানুষের ক্ষতি হলে কিছু আমার ভাল লাগে না। তুমি অন্য ব্যবসার কথা বল।

—তবে যা করছিস তাই কর। ফুটপাতে শুকিয়ে মর।

—আমি তো একা মানুষ, আমার তো চলে যাচ্ছে।

—তোর অসুখে-বিসুখে কোথায় থাকবি?

—গাছের নীচে।

—শালা তবে খরার দেশ থেকে চলে এলি কেন ?

—ওখানে বর্ষা নামলে আবার চলে যাব। এ-শহরে আমি থাকব না অজিতদা।

—কেন, ভাল লাগে না ? তোকে একদিন সিনেমায় নিয়ে যাব। দেখবি তখন তোর এই শহরটার ওপর মায়া পড়ে যাবে।

—তাই বুঝি ?

—তবে আবার কি !

—আমার পাখীটা এখানে থাকতে চাইছে না।

—রাখ তোর পাখি। কোথাকার কি একটা পুষে রেখেছিস, ছেড়ে দে। চলে যাক। সঙ্গে শুধু শুধু উটকো ঝামেলা রেখেছিস।

—ছেড়ে দিলে চলে গেলে মন্দ হত না। কিন্তু যায় না। আমাকে নিয়ে যাবে বলছে।

—শালা তোর পাখি তবে কথাও বলে !

—বলে, তোমরা ঠিক বুঝতে পার না। বলে সুবল হেসেছিল। তবু সুবল এই অজিত সাহার উপর রাগ করে না। বরং দু-একদিন কিছু কমাতে না পারলে অথবা পয়সা কম পড়লে সে তার কাছ থেকে ধার নেয়। দু-একদিন অজিত সাহা ওর বস্তির খুপরি ঘরে ডেকে দুটো ভাল-মন্দ খাইয়েছে। সুবল অনেকদিন ভাত খায়নি। সে টুকুন দিদিমণিকে বিকেলে দেখতে যায়। একদিন টুকুন দিদিমণির নার্স দেখে কেমন বিরক্ত হয়ে দশটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছিল, যেন ভিক্ষে চাইছে সুবল, সুবল হেসে বলল, না মা-জননী, আমি ভিখারী নই। টুকুন দিদিমণি আমি ভিখারি ! টুকুন দিদিমণি আমাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। আমার কেমন এই টুকুন দিদিমণির জন্য মায়া পড়ে গেছে।

সিস্টার বলেছিল, টুকুনকে তুই দিদিমণি বলিস কেন রে।

—কি বলব মা জননী ?

—মা-জননী, মা-জননী করবি না। কেমন বিরক্ত গলায় টুকুন দিদিমণির নার্স ওকে তাড়া লাগাত। সে যেত পালিয়ে পালিয়ে। কিন্তু সেই যে সেদিন সে যেমন বলেছিল, বলে আর যায়নি, সে এক হরিণ টুকুন দিদিমণি! হরিণের বনে হরিণ আছে। রাজার সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ আছে। বনে ঘন বন আছে, দু'চোখে বনের পথ দেখা যায় না। মাঝে মাঝে সমতল মাঠ আছে, মাঠে ঘাস আছে। রাজার পিঠে তীর-ধনুক। একটা হরিণ জল খাচ্ছিল মাঠের ভিতরে, এত হরিণ অথচ একটা হরিণ জল খাচ্ছে। ছোট হরিণ শুধু লাফায়, নাচে আর ঘাস খেতে শখ যায়, কিন্তু নরম ঘাস অথবা কুয়াশায় ভেজা ঘাস না হলে হরিণশিশু ঘাস খেতে পারে না দিদিমণি। এভাবে সে তার গল্প আরম্ভ করেছিল সেদিন।

—রাজা ছুটছেন। বুঝলেন দিদিমণি, বনের ভিতর দিয়ে রাজা ছুটছেন। সে ঠিক এ-ভাবেই বলে যাচ্ছিল। সুবলের ভীষণ স্মৃতিশক্তি। সে সেদিন কি কি বলেছিল, এবং নার্স তাকে তাড়া লাগালে সে আরও কি কি বলেছিল সব হুবহু মনে করতে পারছে না ফের। কলতলায় চান করতে করতে সব মনে পড়ছে। চান শেষ করে যখন ফুটপাতে করবীগাছটার নীচে গিয়ে বসবে তখনও মনে পড়বে।

—হরিণ ছুটছে। শিকার ধরার জন্য রাজা ছুটছে দিদিমণি। কি বেগে যে ছুটছে! চারিদিকে পাহাড়। মাঝখানে হ্রদ। হ্রদের পাড়ে পাড়ে হরিণ আর রাজা ছুটেছে। কি বেগে দ্রুত যে ছুটছে। হরিণীর খুরে পাথরের ঘষায় মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে উঠছে। হরিণীর বাচ্চাগুলো তখন মাঠের ভিতর। বাচ্চাগুলো মায়ের বুঝি বিপদ ধরতে পেরেছিল। মাকে দৌড়াতে দেখে ওরাও তখন দে-দৌড়।

—রাজা ওদের ধরতে পারল সুবল?

—না, কি করে পারবে! হ্রদের পাড়ে আসতেই রাজা দেখল, পাথরের ঘষা খেয়ে ঘোড়ার পায়ে ফোসকা পড়েছে।

—ঘোড়ার পায়ে ফোসকা।

—বাপ রে, আগুন জ্বলছিল পাথরে! হরিণের খুরে আগুন লেগেছিল।

—অঃ। টুকুন যেন যথার্থই সবটা বুঝে ফেলেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে টুকুন নার্সকে দেখেছিল, দেখে ভয়ে সুবল জানালার নীচে প্রায় যেন ডুব মেরেছে। তারপর দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে নিজেকে আড়াল দিয়ে রেখেছে। এবং টুকুন বুঝেছিল নিশ্চয়ই সুবল সিস্টারকে আসতে দেখেছে। চোখ তুলেই দেখেছিল সিস্টার ঢুকছে।

—বড় জ্বালাচ্ছে! সিস্টার চীৎকার করে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু সিস্টার অবাক—টুকুন খাটের ওপর বসে রয়েছে। চোখ ঝলমল করছে। ভীষণ সজীব। মুখে কোন অবসাদের চিহ্ন নেই। সব কিছু কেমন অলৌকিক মানে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে ডায়াল করে বলেছিল, সুরেশবাবু, সুরেশবাবু আছেন?

—কে?

—আমি সারদা বলছি।

সহসা এই ফোন সুরেশবাবুকে বিচলিত করেছিল। বুঝি শেষ, কোন অঘটনের আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। তাঁর বুক কেঁপেছিল। তিনি বলেছিলেন, খুব স্থির এবং স্পষ্ট গলায় বলেছিলেন, বল।

—টুকুন খাটের ওপর বসে সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে সত্যি কথা বলছিল।

—ঠিক, ঠিক বলছ?

—ঠিক। আমি দরজা দিয়ে ঢুকতেই পালিয়ে গেল।

—দ্যাখো তো আছে কিনা কোথাও?

সারদা জানালায় উঁকি দিয়ে দেখেছিল, কেউ নেই।—না, নেই। আমাকে খুব ভয় পায়। আমাকে দেখেই পালিয়েছে।

সুরেশবাবু বলেছিলেন, ডাক্তারকে খবরটা দিয়েছ?

—না।

—আগে তাকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল।

—এমন আনন্দের খবর আপনাকে না দিয়ে থাকি কি করে!

—আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি। ছোঁড়াটা এলে যেতে দেবে না। ওকে আমাদের দরকার আছে।

তারপর কিছুক্ষণের ভেতরই সুরেশবাবুরা এসেছিলেন। ডাক্তার বাবুও সঙ্গে হাজির। টুকুনকে দেখে তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। টুকুন কিছু কুঁচফল এবং চন্দনের বীচি নিয়ে তখন বিছানার ওপর খেলা করছিল। সে তার চারপাশে এত মানুষজন একেবারেই খেয়াল করেনি। রাজার গল্প, হরিণের গল্প, রাজপুত্রের গল্প, অথবা এই যে এক পাখিয়ালা সুবল, যার আপন প্রাণে নিরন্তর বেঁচে থাকার উদ্যম, যে কোন এক খরা অঞ্চল থেকে চলে এসে এই শহরে ছুটে বেড়াচ্ছে, সেই সুবল, বালক সুবল, রাজার মত ওকে কেবল উৎসবের কথা বলে গেল। বেঁচে থাকার কথা বলে গেল। আপন প্রাণের তেজে কেবল উড়ে যাবার কথা বলে গেল। সে চন্দনের বীচি কুঁচফল এবং রংবেরংয়ের পাথরগুলো দেখতে দেখতে কেমন নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল!

—টুকুন তোমার শরীর ভাল হয়ে যাচ্ছে। বাবা কপালে হাত রেখে এমন বলেছিলেন।

টুকুন বাবার দিকে তাকিয়েছিল অথচ কোন কথা বলেনি।

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, আমার হাত ধর টুকুন।

টুকুন ডাক্তারবাবুর হাত ধরেছিল।

—এবারে উঠে দাঁড়াও।

—আমি পারব না ডাক্তারবাবু।

—সুবলের একটা পাখী আছে টুকুন।

—সুবল কেন চলে গেল?

—তুমি দাঁড়াও। সুবল আবার কখন আসবে?

জানি না। ও কিছু বলে না। ওদিকে একটা দেবদারু গাছের নীচে না কোথায় থাকে।

—তুমি দাঁড়াও। এই তো উঠতে পারছ।

—আমি পারব না ডাক্তারবাবু।

—এই তো হচ্ছে। আচ্ছা শুনুন সিস্টার, সুবল এলে থাকতে বলবেন। আমার ওর সঙ্গে কথা আছে। তারপর ডাক্তারবাবু টুকুনের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা ঠিক আছে, কাল আবার চেষ্টা করব।

ডাক্তারবাবু টুকুনকে বিছানায় রেখে জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সিস্টারকে ইশারায় ডেকেছিলেন। তারপর ফিসফিস গলায় বলেছিলেন, সুবল কখন আসে?

—ঠিক থাকে না। আমি না থাকলেই চলে আসে। ও যেন কি করে টের পায় আমি কখন থাকিনা।

—ঠিক আছে। ও ঠিক আসবে। ও যখন আসছে তখন ঠিক আসবে। ও টুকুনের সঙ্গে কথা বলবে। তবে দেখবেন একনাগাড়ে যেন বেশীক্ষণ ও না থাকে। আপনার প্রতি যে ভয়টা আছে ওটা যেন ওর থাকে।

—আমি ওকে বেশী আসতে দিই না স্যার।

—খুব বেশী আসতে না দিলেও আপনাকে মাঝে মাঝে কাজের অছিলায় বাইরে বেশী সময় থাকতে হবে। সুবল এসে কথা বললে, টুকুন প্রাণের ভিতর বিশেষ আনন্দ পায়। এক ধরণের উত্তেজনার জন্ম হয়। আমরা সবাই যা পারিনি, যার জন্য এই মেয়েকে নিয়ে আমরা কোথায় না গিয়েছি, কোথাকার এক সামান্য পাখিয়ালা এসে মনে হয় ওকে ক্রমে নিরাময় করে তুলছে। বলে ডাক্তারবাবু একটু থেমেছিলেন, চোখ টেনে শরীরে রক্ত প্রবাহের মাত্রা দেখেছিলেন। এবং কেমন বেশ খুশী খুশী লাগছিল ডাক্তারবাবুকে।

সিস্টার বলেছিল, তবে ওকে কাছে রেখে দিলেই হয়।

—না, তা হয় না। টুকুনের যদি মনে হয় সুবল খুব সুলভ তবে সে আর কোন রোমাঞ্চ পাবে না। ওর শরীরে এমন একটা জিনিসের অভাব হয়ে গেছে, যা আমরা দিতে পারি না। দুর্লভ ব্যাপারটা ওর অভিধানে ছিল না। সুবলকে আমাদের ওর কাছে দুর্লভ সামগ্রী করে তুলতে হবে। বড়লোকেদের যা হয়ে থাকে। অভাব-অনটন সামান্য মানুষের দরকার আছে সারদা। না হলে বেঁচে সুখ থাকে না। মেয়েটাকে সুরেশবাবু শিশুবয়েস থেকে এমন করে বড় করে তুলেছিলেন, যেখানে কেবল প্রাচুর্য, সব কিছু হাতের নাগালে থাকলে বেঁচে সুখ নেই। আমার মনে হয়, এই বেঁচে সুখ নেই থেকে মেয়েটার এমন একটা অসুখের সূত্রপাত। বিষণ্ণতা। খেতে চায় না। কেবল চুপচাপ বসে থাকতে চায় জানালায়। তারপর ক্রমে কেমন স্থবির হয়ে গেল, শরীর ঢ্যাঙা হয়ে গেল। অথচ বয়সানুযায়ী শরীরে মা হবার লক্ষণগুলো প্রকাশ পেল না।

সারদা বলেছিল, টুকুনের এখন কত বয়স?

—প্রায় ষোল-সতেরো।

—সতেরো!

—হ্যাঁ, সতেরো।

—কিন্তু কিছুতেই ওকে বারো বছরের বেশী মনে হয় না।

ডাক্তারবাবু বললেন, ওটাই ওর অসুখ। এখন বুঝতে পারছি সুবলই পারে অসুখটা সারাতে।

—তাহলে স্যার ওকে ভিতরে নিয়ে এলেই হয়।

—না। বলেছি তো ভিতরে নিয়ে এলে হয় না। টুকুনের যদি মনে হয় সুবল এখানেই থাকবে, সুবলের আর যাবার জায়গা কোথাও নেই তবে ওর প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। কারণ এখন সুবল ওর কাছে জাদুকরের মত। স্রেফ অলৌকিক জাদুকর। আসে যায়, কখনও হারিয়ে যায়। আবার আসে। প্রত্যাশা ওকে বড় এবং ভাল করে

তুলবে। বলে ডাক্তারবাবু অন্যমনস্ক ভাবে কেবল হাতে তুড়ি মারছিলেন।

সুরেশবাবু বাইরে গিয়ে বলেছিলেন, কেমন বিস্ময়ের ব্যাপার লাগছে সব।

সুরেশবাবুর স্ত্রী বলেছিল, টুকুনের জীবনে স্বাভাবিকতা তবে আসবে ডাক্তারবাবু?

—সব এখন সেই পাখিয়ালার ওপর নির্ভর করছে।

পাখিয়ালার নাম শুনেই টুকুনের মা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। তাই বলে একটা রাস্তার ছেলে। অন্য কেউ হলে হয় না! কত সুন্দর সুপুরুষ সব তরুণ রয়েছে তাদের চারপাশে। টুকুনের মা আর কোন কথা বলতে পারল না। ছেলেটা তন্ত্র-মন্ত্র জানে। কোথাকার ছেলে, খরা অঞ্চল থেকে উঠে এসে কি করে যে টুকুনকে ট্রেনে নিজের মত করে ফেলল!

অথবা সেই সব দৃশ্য। টুকুনের মা এখনও যেন মনে করতে পারছে—টুকুন জেগে দেখেছিল, সুবল দরজা খুলতে পারছে না। টুকুন বাবাকে দেখেছিল দরজা লক করে দিতে। সুতরাং সুবল দরজা খুলতে পারছিল না। টুকুন সুবলকে কিছু বলার জন্য উঠে বসতেই জানালায় দেখতে পেল একজন পুলিস ওদের কামরার দিকে ছুটে আসছে। প্ল্যাটফরমে হৈ-চৈ। মানুষের ছুটোছুটি এবং কান্না। যারা জল চুরি করে খেয়েছিল অথবা লুট করেছিল, তাদের এখন ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। টুকুন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ডেকেছিল, সুবল সুবল, দরজা খুলবে না। দরজা খুললে ওরা ঢুকে পড়বে ঘরে।

সুবল বলেছিল, আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে?

—তাড়াতাড়ি এদিকে এস সুবল, বলে সে বাংকের নীচে সুবলকে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপর লম্বা চাদর দিয়ে পর্দার মত একটা আড়াল সৃষ্টি করে সুবলকে অদৃশ্য করে দিয়েছিল।

সুবল ট্রেনে তখন সব পোঁটলাগুলো শিয়রের দিকে রেখে দিয়েছিল। বাংকের ওপর টুকুন চুপচাপ শুয়ে। চাদরটা দিয়ে বাংকের নীচটা ঢেকে দিয়েছে। ওর ভিতর একটা ছেলে শুয়ে আছে পালিয়ে, কেউ টের পাচ্ছে না। টুকুনের মা-ও জানত না। টুকুনই পরে সব বলেছিল।—জানো মা, আমি দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলাম!

সে-সব কথা তখন টুকুনের মা বিশ্বাস করতে পারেনি। কারণ সে তো কিছু দেখেনি। পাশের বাংকে সে-ঘুমাচ্ছিল। ফার্স্ট ক্লাস কামরা, রিজার্ভ।

জেবের ভিতর ছিল তখন পাখিটা। সুবল একটু আলগা হয়ে শুয়ে ছিল নীচে। পাছে পাখিটা চাপা পড়ে মরে না যায়। পাখিটা তখন জড়পদার্থের মত, যেন শীতে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে, অথবা পাখিটার ঘুম পাচ্ছিল বোধহয়—খুব জড়সড় হয়ে জেবের একটা দিকে বসে আছে। তারপর মনে হয়েছিল সুবলের, ঘুম এসে গেলে পাখিটা জেবের ভিতর চেপ্টে যেতে পারে, সেজন্য সে শিয়রে রেখে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুম যাবার চেষ্টা করেছিল। পাখিটা শিয়রে জড়সড় হয়ে বসে আছে। নড়ছে না। যেন পাখিটারও ভয়, পুলিস পাখিটাকে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি এদের দলে, সুতরাং নিস্তার নেই।

টুকুন রুগ্ন এবং দুর্বল। টুকুন কোনরকমে উঠে বসেছিল এবং চাদরটা ঠিক মেঝের সঙ্গে মিলে আছে কিনা দেখার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল। টুকুন ক্ষীণকায়, লম্বা। সিল্কের দামী ফ্রক গায়ে ঢল ঢল করছিল। শুধু সামান্য মুখে সতেজ সুন্দর চোখ কালো জলের মত গভীর মনে হচ্ছিল। দরজায় তখন ঠক ঠক শব্দ। টুকুন কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মা এবং বাবা শেষরাতের ঠাণ্ডা বাতাসটুকু পেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। সুতরাং টুকুন নিজে ধীরে ধীরে উঠে গিয়েছিল এবং দরজা খুলে দিয়েছিল—লম্বা একটা পুলিসের মুখ গোটা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টুকুন খুব আস্তে আস্তে বলল, আমাদের কামরায় কেউ জল খেতে আসেনি।

—কেউ ভিতরে পালিয়ে নেই তো?

—না না, কেউ নেই। কেউ আসে নি। ট্রেন ওরা থামিয়ে দিলেই আমরা দরজা লক করে দিয়েছিলাম।

—বড় জ্বালাতন করছে এই সব দেহাতী মানুষগুলো।

টুকুন কোন জবাব দিতে পারে নি। কারণ সে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তার শরীর এত দুর্বল যে মনে হচ্ছিল মাথা ঘুরে নীচে পড়ে যাবে। সে পুলিসের কথা প্রায় শুনতে পাচ্ছিল না। এটা প্রথম শ্রেণী, ওরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। পুলিস, গার্ড, এমন কি স্টেশন-মাস্টার পর্যন্ত এসেছিল ওদের কামরাতে—এইসব দেহাতী মানুষগুলো উপদ্রব করে গেছে কি না, অথবা কোন দুর্ঘটনার জন্য এই দেহাতী মানুষগুলো দায়ী কিনা অনুসন্ধানের চেষ্টায় ছিল।

টুকুন তারপর শক্ত গলায় বলেছিল, এ-ঘরে কেউ আসে নি গার্ডসাহেব। বলে সে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর বাংকে কোন ক্রমে ছুটে গিয়ে পড়েছিল। আর অবাক টুকুন, কি বিস্ময় টুকুনের, সেদিন প্রথম কতদিন পরে সে নিজে বিছানা ছেড়ে উঠতে পেরেছে। সে নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পাচ্ছিল না।

টুকুন বলেছিল, সে মা-বাবাকে ডাকেনি, কারণ মা-বাবা হয়তো ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দিয়ে সব পুলিসকে বলে দিতেন।—হ্যাঁ সুবল, তার দলবল নিয়ে এসেছিল। এসে এই কামরার সব জলটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে। মাকে হয়তো টুকুন বুঝাতেই পারত না, সুবল এক পাখিয়ালা এসে টুকুন নামে এক রুগ্ন স্থবির বালিকার পায়ে শক্তি সঞ্চার করতে সাহায্য করেছে। টুকুন মাকে বাবাকে তার এই বিস্ময় দেখানোর জন্য ডেকেছিল, মা! মা!

তারপর মা-র সাড়া না পেয়ে টুকুন ডেকেছিল, বাবা বাবা!

তখন ট্রেন চলছিল। ভোর হয়ে আসছে। জানালা দিয়ে আবার বড় মাঠ দেখা যাচ্ছে। ট্রেনের তার দেখা যাচ্ছে। মা ঘুম থেকে উঠলেই টুকুন বলেছিল, জানো না আমি উঠে দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছি। দরজা খুলে দিয়েছি।

সুরেশবাবুর স্ত্রী ভেবেছিল, টুকুন হয়তো স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন দেখে ভুলতে পারছে না।

টুকুন বলেছিল, বাবা, পুলিস এসেছিল।

সুরেশবাবুও টুকুনের কথা স্বপ্ন টপ্ন ভেবে বললেন, আচ্ছা মা, তুমি একটু কমলালেবুর রস খাবে? তারপর তিনি দরজার দিকে চোখ তুলে দেখেছিলেন, দরজা তেমনি লক করা। টুকুন স্বপ্ন দেখেছে, হয়তো কোন মাঠে কিংবা নদীর পাড়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, তুমি ঠিক হাঁটতে পারবে টুকুন। তুমি ঠিক দৌড়তে পারবে। অথচ তিনি জানেন, ওগুলো কথার কথা টুকুনের শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শুকিয়ে আসছে। শরীরে ওর কোথাও কোন আর শক্তি অবশিষ্ট নেই। কেমন ক্রমশঃ টুকুন স্থবির হয়ে যাচ্ছিল। কোথাও কোন জায়গা নেই, বড় ডাক্তার নেই, যেখানে তিনি টুকুনকে না নিয়ে গেছেন। হতাশা এখন সম্বল। মেয়েটা ক্রমশঃ পঙ্গু হয়ে যাবে, তারপর সতেজ মুখে কোন আর বিষণ্ণ ছবি ঝুলে থাকবে না। টুকুন মরে যাবে।

সুরেশবাবুর স্ত্রীর মুখ দেখে সারদা বুঝল, ডাক্তারবাবুর কথা ওর পছন্দ হয়নি। পারিবারিক ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে গেলে কি আর থাকে, তখন কোথাকার এক বালক দৈত্যের সামিল হয়ে যায়। সারদা বুঝতে পেরে বলল, টুকুনের কাছে সুবল এক আশ্চর্য জাদুকর। ওর কুঁচফল, চন্দনের বীচি, রংবেরংয়ের পাথর আর টুকুন যা বলল, কি সব আজগুবি গল্প বলে নাচতে থাকে কেবল। তার অর্ধেকটা বোঝা যায়, অর্ধেকটা যায় না। রাজার গল্প, হরিণের গল্প, বন-পাহাড়ের গল্প

বলে সে কেবল ছোটার অভিনয় করে। তখন টুকুনের, সুবলের পা দেখতে দেখতে বুঝি মনে হয়—হরিণের মত সে-ও ছুটছে, মনে হয় ঘোড়ার মত সে-ও ছুটছে। গল্পের সঙ্গে এই যে ছোটা আর ছোটা—প্রাণের ভিতর এই ছোটা কেবল আবেগের জন্ম দেয়।

ডাক্তারবাবু সারদাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এ-ভাবেই রক্তে উত্তেজনা আসে। হাতে-পায়ে সেই উত্তেজনার রক্ত বইতে থাকে। টুকুনকে তখন খুব স্বাভাবিক দেখায়। এই ছোটার ভিতর উদ্যমের কথাই বলা হচ্ছে সুরেশবাব। আমবা সমাজ-জীবনেও এই উদ্যম হারিয়ে কেমন ক্রমশঃ টুকুনের মত স্থবির হয়ে যাচ্ছি। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। লোক কাজ করছে না মন দিয়ে। সততার অভাব। জীবন-যাপনে আমরা বড় বেশী অসৎ হয়ে পড়ছি। ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন, কথাগুলো কেমন বক্তৃতাব মত হয়ে গেল। সেজন্য পরেরটুকু খুব সহজভাবে বলতে চাইলেন, আমাদের জীবনে এখন সুবলের মত এক পাখীয়ালা চাই, যে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসা দিয়ে আমাদের এই কঠিন রোগ সারিয়ে তুলবে।

১০

সিস্টারের ভয়ে সুবল ক'দিন হল নার্সিংহোমের দিকে পা বাড়ায় নি। এই শহরে একমাত্র টুকুন দিদিমণিই ওর জন্য প্রতীক্ষায় বসে থাকে। তাকে দেখলে খুব খুশী হয়। এবং কেন জানি এ-ভাবে সুবলের কাছে টুকুন খুব আপন জন হয়ে গেল।

অথচ ভয়, সিস্টার তাকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করেছে। সেদিন সিস্টারের চোখে কি এক কঠিন বিরক্তি দেখে সে আর যেতে সাহস পায়নি। তা ছাড়া অজিতদা ওকে অন্য একটা সুন্দর ব্যবসার কথা শিখিয়ে দিয়েছে। সে বড়বাজার থেকে চিনাবাদাম কিনে আনছে। এবং ফুটপাথে সে উনুন জ্বালিয়ে বেশ ভাজাভুজি রেখে বিক্রি করছে। সে এখানে এসে একটা ব্যাপার দেখে খুশী। দেশে থাকতে কি না ওরা অসহায় ছিল। এমন একটা সুন্দর দেশ পর পর ছ' বছর খরাতে শস্যবিহীন দেশ হয়ে গেল। তবু অন্যান্য বছর সামান্য বৃষ্টিপাতের দরুন কিছু ফসল হয়েছিল—এবার যে কি হল! দেশ ছেড়ে মানুষ পালাল। সে আর থাকে কি করে। ওর ইচ্ছা ছিল টুকুন দিদিমণিদের সঙ্গেই চলে যাবে। দিদিমণির মা-টা যেন কেমন। ঠিক সিস্টার যেমন মুখ করে রেখেছিল, দিদিমণির মা-টার তেমনি রাগী রাগী ভাব। সে ভয়ে ব্যাণ্ডেলে নেমে গেল। তারপর এক আশ্চর্য বিকালে এত বড় বাড়ির জানালায় দিদিমণিকে আবিষ্কার করে অবাক।

কিন্তু এখন সে এমন একটা কাজ নিয়ে ফেলেছে যে সে যেতে পারছে না। ওর জুতো-পালিসের সব কিছু অজিতদার বাড়িতে আছে। অজিতদার বৌয়ের খুব সিনেমা দেখার স্বভাব। সে সুবলকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তার এ-সব ভাল লাগে না। সে সময় পেলে বরং টুকুন দিদিমণির কাছে চলে যাবে।

টুকুন দিদিমণির কাছে গেলেই তাকে নানারকম গল্প বলতে হয়। সে আজ যাবে ঠিক করেছে। চার পাঁচদিন হয়ে গেল দিদিমণিকে না দেখে কেমন সে কিছুটা দুঃখী সুবল বনে গেছে। সকাল সকাল কলের জল থেকে স্নান করেই মনে হয়েছে, দিদিমণির সঙ্গে দেখা না হলে কাজে উৎসাহ পাবে না। সে তাড়াতাড়ি কিছুটা ভাজাভুজি বিক্রি করে নেবে, তারপর বিকেলে হাতে সে কোন কাজ রাখবে না। আগে ওর খুব একটা ঝামেলা ছিল না। যখন খুশী চলে যেতে পারত। এখন পাবে না। সে আগে হাতে তার জুতোর বাক্সটা রেখে দিত। এখন তাব সম্বল একটা উনুন, একটা চট একটা চালুনি, একটা কাঠের ট্রে, একটা ভাঙা কড়াই, কিছু বালি, এতগুলো নিয়ে সে যখন তখন যেখানে সেখানে যেতে পারে না।

সে আজ ভাবল, সব রেখে দেবে শেফালীবৌদির কাছে। এই শেফালীবৌদির রং কালো। কেবল গুণ গুণ করে হিন্দী গান গায়। সব সিনেমার গল্প এসে কাউকে না কাউকে বলা চাই। রাতের বেলায় সুবল গেলে তাকে বসিয়ে গল্প। এক কাপ চা খেতে দেয় তখন। কালো রংয়ের শেফালীবৌদির খুব তাজা চোখ মুখ। এবং সবসময় পান খাবার স্বভাব। ছোট দুটো ঘর। তাই যতটা সম্ভব সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে। কাগজের ফুল তৈরি করে নানা রংয়ে সাজিয়ে রাখার স্বভাব। এবং কারুকাজ করা ডিমের খোলা—কোনটা লাল রংয়ের, কোনটা হলুদ রংয়ের। পাশে একটা বড় পুকুর। জানালা খুললে পুকুরের জলে অনেককে নাইতে দেখা যায়। অজিতদা না থাকলে জানালা খুলে শেফালীবৌদি কার জন্য মনে হয় জানালায় অপেক্ষা করে। সুবলের এটা কেন জানি ভাল লাগে না।

সুতরাং সুবল সব টুকিটাকি কাজ সেরে ফেলার সময় শেফালী-বৌদির কথা ভেবে কেমন সামান্য কষ্ট পেল। এই শহরে বড় একটা কষ্ট আছে সবার। যেমন অজিতদার, বৌদির। ওদের কাছে যেন

কিছু জিনিস খুব দুর্লভ। সেই দুর্লভ কিছু পাবার জন্য ওরা এমন করছে। ওর কাছে দুর্লভ বলতে টুকুন দিদিমণি। দিদিমণিকে দেখলেই ভিতরে সুবল প্রাণ পায়। সুবল দিদিমণির জন্য কি যে সুন্দর একটা খেলা শিখে ফেলেছে, আজ গেলে সেই খেলাটা দেখাতে পারলে খুব আনন্দ পাবে।

সে তার টুকিটাকি মালপত্র সব মাথায় করে এক সময় শেফালী-বৌদির ঘরের দিকে রওনা হল। সে যাবার সময় একটা সুন্দর সাজানো পান কিনে নিল। নিজে সে পান-টান কিছু খায় না। অজিতদা ওকে একদিন একটা বিড়ি দিয়েছিল খেতে। সে খেতে গিয়ে খক্ খক্ করে কেসেছে ভীষণ। সেই থেকে বিড়ি ব্যাপারটাকে ভীষণ ভয় পায় সে।

সে হাঁটছিল। তাকে খুব একটা দূরে হেঁটে যেতে হয় না। বড় রাস্তা থেকে কিছুদূর হেঁটে গেলেই গোলাবাগান বস্তি। দুপাশে ছোট ছোট সব খুপরি ঘব, টিনের চাল। একটা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের ডিসপেন্সারি। তারপব একটা লোক দুটো লেদ মেসিনেব দোকান নিয়ে সারাদিন কাজ চালিয়ে যায় এবং বোয়াকে চায়ের দোকান। একটা ছোট মুদি-দোকান, কলের জল পড়ছে এবং কলেব পাডে ভীষণ ভিড়। সে এখানে এলেই সবাই ঝুঁকে পড়ে। সুবল, তোর পাখিটা দেখি। দেখা না রে পাখিটা। কেউ কেউ একটা মাকড় ধরে এনে বলে, নে, এটা খাওয়া। সুবলের সব কথা ঠিক থাকে। সে জানে কোথায় কি বলতে হয়। সে মানুষকে আঘাত করতে জানে না। সে মিথ্যাকথাও বলতে জানে না, সে ইচ্ছা করলে বলতে পারে না, পাখিটা এখন আমার জেবে নেই। বললেই ওরা সরে যায়। কিন্তু বললে মিথ্যাকথা বলা হবে। সে কোনরকমে তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পার হয়ে যায় তখন। চৌকাঠে ঢুকে গেলে কেউ তখন আর বিরক্ত করতে আসে না।

শেফালী অসময়ে সুবলকে দেখে বলল, রাজা, এ-সব নিয়ে অসময়ে ?

—একটু কাজ আছে বৌদি।

শেফালী ওর মাথা থেকে এক এক করে টুকিটাকি জিনিস নামাতে নামাতে বলল, কোথায় যে রাখি !

—আজ রাখো, কাল সকালে নিয়ে যাব। তোমার জন্য এক পান নিয়ে এসেছি।

—রাজা তুমি আমাকে ভালোবাসো ?

সুবল অবাক। বৌদি তাকে ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে। তবু কেমন যেন গা-টা শিব শির করে উঠল। এই শহরে এলে মানুষ বুঝি সব কিছু একটু তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে। সে বলল, তুমি পান খেতে ভালোবাসো। অজিতদা কোথায় ?

শেফালী ঠোঁট উল্টে বলল, জানি না।

—আজ আসেনি ?

—না।

—কেন আসে না ?

—একবার জিজ্ঞাসা কর না।

—না, খুব খারাপ বৌদি। আমি ঠিক জিজ্ঞাসা করব। বলেই সুবল হেসে দিল।—তুমি ঠাট্টা করছ বৌদি। দাদা ঠিক এসেছে।

—না রে ! তোর সঙ্গে আমি মিথ্যা বলি না।

সুবলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে বলল, কোন খবর নিয়েছ ?

—ঠিক চলে আসবে। কোথায় খোঁজ করব বল ? কোথায় যায় আমাকে বলে যায় না।

সুবল বুঝতে পারল, বৌদি সত্যি কিছু জানে না। সে নিজেই একটা জলচৌকি টেনে নিল। বসতে বসতে বলল একটু জল খাব

শেফালী জল এনে দিলে বলল, কাল ক'টায় বের হয়েছে ?

—রাতে।

—রাত ক'টায় ?

—বেশ রাত। যেন শেফালী ইচ্ছা করেই আর বেশী বলতে চাইছে না, যদিও জানে রাজা খুব ভাল ছেলে। রাজার নতুন গোঁফ উঠছে বলে, খুব ভাল লাগে দেখতে। এই নতুন গোঁফ ওঠা ছেলেদের খুব ভাল লাগে। রাজা আগে খুব নোংরা জামাকাপড় পরে থাকত শেফালী ওকে কিছু কিছু ট্রেনিং দিয়ে বেশ এখন সাফসোফ রাখার ব্যবস্থা করেছে। আগে চুল ছিল বড় বড়। চুল কাটত না। ইদানাং চুল কাটছে। এবং বড় একটা শিখা ছিল মাথায়, সেটাও ছোট করে ফেলেছে। খুব খেয়াল না করলে বোঝা যায় না শিখাটা আছে মাথায়।

শেফালী বলল, সব ফেলে কোথায় যাচ্ছ ?

—টুকুন দিদিমণির কাছে।

—তুমি যে বলেছিলে আর যাবে না ? সিস্টার পছন্দ করে না।

সুবল বলল, আমার বৌদি আপনজন বলতে টুকুন দিদিমণি। ভেবেছিলাম যাব না। কিন্তু কাল থেকে মনটা টুকুন দিদিমণির জন্য কেমন করছে।

—কবে যেন গেছিলে ?

—গত বুধবার।

—আর মাঝে যাওনি ?

—না।

—টুকুন ঠিক জানালায় রোজ দাঁড়িয়ে থাকবে ?

—জানি না বৌদি। ওর মা আমাকে দেখতে পারে না। ওদের অসুবিধা হবে বলে একটা বড় স্টেশনে আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল।

—ভীষণ খারাপ। বড়লোক হলে মানুষ ভাল হয় না। বড়লোকেরা খুব স্বার্থপর।

সুবল সে-সব কথায় গেল না। সে বলল, আসতে আসতে দেখলাম, একটা বড় গীর্জাব সামনে দুটো ছেলে ফুল বিক্রি কবছে। বেশ ভাল কাজ।

—কেন, তুমি ফুল বিক্রি করবে নাকি ?

—দাদা এলে জিজ্ঞাসা কবব, কোথায় ফুল কিনতে পাওয়া যায়।

এ-কাজটা খুব ভাল হবে। তোমার খুব সুন্দর মুখ রাজা। তুমি যদি ফুল বিক্রি কর তবে লোকে অনেক ফুল কিনবে।

—সত্যি কিনবে ?

—সত্যি। প্রথম দিনের একজন খদ্দের তুমি আমাকে পাবে।

—আমি তোমাকে এমনি দেব।

—তবে তোমার ব্যবসা হবে কি করে রাজা।

—একটা ফুল দিলে ব্যবসা নষ্ট হয় না। যখন চিনাবাদাম ভেজে বিক্রি করি, কেউ কেউ দুটো একটা এমনি খায়। খেয়ে পছন্দ হলে নেয়। তুমিও আমার তেমন।

—আমার একটা ফুলে কিছু হবে না রাজা। একটা ফুল দিয়ে মালা গাঁথা হয় না।

—কত ফুল লাগবে ?

—একগুচ্ছ।

—তাই নেবে!

—না রাজা, আমি এমনি নেব না।

—তাহলে কি করতে হবে ?

—সে পরে বলব। বলেই শেফালী বলল যাও, আপনজনের কাছে যাও।

সুবল এতক্ষণে মনে করতে পারল সে টুকুন দিদিমণিকে একমাত্র

আপনজন বলেছে। সে বৌদির ঠাট্টাটা ধরতে পেরে বলল, তোমার নিজের লোক। অজিতদা কত ভাল লোক।

—ভাল লোক না ছাই।

—তুমি কেবল বৌদি অজিতদার নিন্দা কর। দাদা এলে বলে দেব।

—বলে ছাখ না যদি একটু রাগ করে। লোকটার তো রাগ-অভিমান বলতেও কিছু নেই। যা খুশী করবে। মান-সম্মান বুঝবে না। অপমান বলতে কিছু নেই।

সুবল দেখল কথা অন্যদিকে যাচ্ছে। সে উঠে পড়ল। সে একটা বল নিয়েছে হাতে। শেফালীর ইচ্ছা সুবল আর একটু বসুক। এখন এই বিকেলটা শেফালীকে বড় একা একা কাটাতে হবে। এখানে এ-ঘরে কেউ দেখতে পাচ্ছে না সে সুবলকে সামনে নিয়ে বসে রয়েছে। সুবল এলেই মনের ভিতর একটা অদ্ভুত রহস্য খেলা করে বেড়ায়। ওর নরম চুল এবং চোখ দেখলে যেন কোন আব দুঃখ থাকে না। বেশ জড়িয়ে ধরে ছেলেটাকে চুমু খেতে ইচ্ছা হয়। এবং সুন্দর করে সাজানো পুতুলের মত অথবা সে যে-সব সিনেমায় নানারকমের কল্প-কাহিনী দেখে তেমনি সব কল্পকাহিনীর বাসিন্দা হতে ইচ্ছা হয়। সুবলকে না দেখলে তার এমন বুঝি হত না।

শেফালী বলল, পাখিটার খেলা আজ দেখালে না?

সুবল বুঝতে পারছিল, কিছু না কিছু বলে তাকে আটকে রাখছে। সে বলল, আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। বলে সে বারান্দা থেকে নেমে চৌকাঠ পার হয়ে রাস্তায় দাঁড়াল।

সুবলের বেশ ভাল লাগছিল হাঁটতে। সে সাফসোফ হয়ে যাচ্ছে। জামা পাজামা সব ধবধব করছে। সে কলের পাড়ে এসব গতকাল কেচে নিয়েছিল। পয়সা হলে সে আরও দুটো ঢোলা পাজামা পাঞ্জাবি করে নেবে। একটা টিনের স্যুটকেস কেনার খুব বাসনা। একটা টিনের স্যুটকেশ কিনে ফেলতে পারলেই সে সব কিছু অতি প্রয়োজনীয়

যা আছে, স্যুটকেসের ভিতর রেখে দেবে। আর কেন জানি মাঝে মাঝে টুকুন দিদিমণিকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আর মাঝে মাঝে আব একজন মানুষকে তার চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয়। সেই যে কাপালিকের মত মানুষ জনার্দন চক্রবর্তী। যিনি তাদেব নিয়ে শেষ চেষ্টা করেছিলেন জল আবিষ্কারের। এবং তিনি পাহাড়ের ওপব কোন ঋষি পুরুষের মত দাঁড়িয়েছিলেন। হাতে একটা লাঠি। নদী পাহাড খাত ভেঙে উপত্যকার ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। যদি নদীগর্ভে চোবা স্রোত থাকে, সেজন্য তিনি সব মানুষদের, যারা আর অবশিষ্ট ছিল, শেষ পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছিল, তাদের নিয়ে শেষ চেষ্টা। দূরে দূরে সব এক একজন করে মানুষ ক্রমান্বয়ে দিনমান বালি খুঁড়ে চলছিল—জলের আশায় মানুষের এমন মুখ-চোখ হয় সুবল এখন চিন্তা করতেই পারে না।

সারাদিন কেটে গিয়েছিল, বাত নেমে এসেছিল, না, কোথাও নেই। মানুষটিই তাদের অনেকদূব হাঁটিয়ে, প্রায় ক্রোশ-দশেক হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—এবং ট্রেন আটকে দিতে বলেছিল। জল লুটে-পুটে খেতে বলেছিল। এখন মানুষটা কেমন আছে কে জানে! চিঠি দিলে সেখানে আর কে যাবে। কে চিঠি পৌঁছে দেবে।

মনের ভিতর মানুষটার মুখ-চোখ, আলখেল্লার মত পোশাক, এবং দিনমানে সে হয়তো অন্নহীন হয়ে সুবচনী দেবীর মন্দিরে পড়ে আছে। এমন মানুষ সে কোথাও দেখেনি। এই একমাত্র মানুষ যার বিশ্বাস ছিল দেবী কখনও না কখনও সুপ্রসন্না হবেন। এবং কোন পাপী মানুষকে এভাবে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সেই পাপের খণ্ডন কি কোন এক অলৌকিক উপায়ে করতে চেয়েছিলেন। এবং মানুষেরও তেমন একটা বিশ্বাস ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোখের ওপর দেখেছেন দেবীর মহিমা কি ভাবে বার বার মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে। সংসার আর সুজলা

সুফলা হচ্ছে না। সুবলের সেই মানুষটার জন্যও মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। ওকে ফেলে চলে এসে সে যেন ঠিক কাজ করে নি। খুব স্বার্থপরের মত ব্যাপারটা হয়ে গেছে।

সুবল দেখল সে ভাবছে বলে খুব একটা এগোতে পারছে না। অন্যমনস্ক হয়ে গেলে সে কেমন ঝিমিয়ে হাঁটে। সেই গীর্জাটা পার হয়ে যাচ্ছে সে। গীর্জায় বাঁশ বেঁধে রং করছে। গেটে একজন লোক বসে রয়েছে। ভিতরে বড় কবরখানা। কাঁচের বাক্স করে নিয়েছে একটা লোক। তার ভিতরে বসে ফুল বিক্রি করছে। লোকটার কাজই সবচেয়ে ভাল। মানুষের শেষদিনে মানুষকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে।

অথবা সুবলের ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে এমন সব গীর্জায় কেবল রং করে বেড়ায়। অথবা মন্দিরে। মসজিদে মসজিদে কারুকাজ করা যে সব পাথর আছে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। মানুষের সুখ দুঃখ ব্যাপারটা সুবলকে খুব ভাবায়।

অথচ এর ভিতর টুকুন দিদিমণির মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে। সে খুব দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। গাছের মাথায় সূর্যের আলো। এবং সব সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা পার্কে খেলা করে বেড়াচ্ছে। দোকান-গুলোতে মানুষের ভিড়। কি পোশাক, কি সুন্দর সব মানুষ! কোন অভাব-অনটন নেই। শেফালীবৌদি খুব সুন্দর পোশাক পরে যখন সিনেমায় যায়, তখন ওর তাকিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে। সব মানুষগুলোই সেজে-গুজে কেমন সুন্দর সুসজ্জিত হয়ে থাকে। এমন পরিপাটি পোশাক, মুখ-চোখ, সে তার গ্রামে স্বপ্নও ভাবতে পারে নি। মানুষ এ-ভাবে সুখে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে সে কল্পনাও করতে পারে নি। খুশীমত আলো জ্বেলে নেয়, জল তুলে নেয়, রাস্তা পার হয়ে যায়, হুস-হাস গাড়ি চলে যায়, বাজারে বাজারে কি সব শাক-শব্জি মাছ মাংস! ওর একবার মনে আছে গ্রামে মাংস হবে। গোবিন্দ

বণিক একটা পাঁঠা কিনে এনেছিল। বাবা কি করে পাঁচসিকা পয়সা সংসার-খরচ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন দুর্দিন এলে খরচ করবেন। কিন্তু বণিক সেই পাঁঠাটা কাটলে বাঁশতলায় কি ভিড়! বাবাও লোভে পড়ে পাঁচসিকার মাংস কলাপাতায় কিনে এনেছিলেন। সেবারই শেষ মাংস খাওয়া। তবে বাবা মাঝে মাঝে পাখি ধরে আনতেন। ওরা পাখির মাংস খেত। মা খুব পাখির মাংস খেতে ভালবাসত বলে বাবা অনেকদিন খুব রাত থাকতে পাহাড়ে চড়ে যেতেন। বালিহাঁসের ডিম, ডিম না হয় হাঁস ধরে আনতেন।

সুবলের ধারণা ছিল পাখি ধরা খুব সহজ কাজ। কিন্তু বাবা প্রায়ই কিছু আনতে পারতেন না। মা রাগ করে কিছুই না খেয়ে থাকত। এমনিতে না খাওয়া ছিল তাদের অভ্যাস, আর একটু চাল ডাল হলেই মা মাংস দিয়ে ভাত খেতে চাইত। বাবার ওপর রাগ করে মা-টা তার মরে গেল।

সুবলের এখন ধারণা হয় বাবা উদ্যমশীল ছিল না। যেমন সে-ও খুব নয়। কোনরকমে দিন চলে গেলেই হল। কিন্তু এখানে এসে সে নানাভাবে দেখছে খুব সহজে দিন চলে গেলে জীবনের কোন মানে থাকে না। চারপাশে এত প্রাচুর্যের ভিতর সে কতদিন আর ফুটপাথে দিন কাটাবে। ওর একটা ঘর না হলে চলছে না। সে ভাবল, বলবে টুকুন দিদিমণিকে, আমি আর গাছতলায় থাকব না। আমাকে একটা ঘর বানিয়ে নিতেই হবে।

সুবল রাস্তায় কত কিছু ভাবতে ভাবতে হাঁটছে। শহর ধরে হাঁটলেই যেন এমন হয়। অথচ খারাপ দিনগুলোতে সে একটা ভাবনাই ভাবত, জল কোথায় পাবে? জল পেলে কখনও পাহাড়ে যা সব লতা মূল ছিল, যেমন পেস্তা আলোর গাছ, এবং তার মূল অথবা ফল কিছু সিদ্ধ করে খেলে কোনরকমে তাদের দিন চলে যেত। জল যে কি দুর্লভ ছিল! এখন এই শহরে এটা ভাবতে পর্যন্ত হাসি পায়।

জলের জন্য তারা প্রাচীন কালের মানুষদের মত নদীগর্ভে এক এক করে মাইলের পর মাইল বালি তুলে মানুষ-সমান গর্ত করেও যখন দেখল নদীর চোরাস্রোতে পর্যন্ত জল নেই, তখন যার যেদিকে চোখ যায় সেদিকে চলে যাওয়া যেন।

অথচ এখানে এসে আর জলের কথা মনে হয় না। সে চারপাশে দেখে নানা আকর্ষণ। সকাল হলে গাছে তেমন পাখী ডাকে না, অথচ আকাশ নীল, ট্রামলাইনের তার নীল নীল সুতোর মত অজানা রহস্য হয়ে যায়। কত দূরে এই সব ট্রামলাইন চলে গেছে সে জানে না। পয়সা হলে সে একদিন সারাদিন ট্রামে চড়ে ঘুরবে। শহরের বড়রাস্তায় কখনও কখনও গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে সে হেঁটে যেত। আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। এবং দুটো একটা গাড়ি এলে মনে হত এক বড় মাঠের ভিতর দিয়ে একা একা হেঁটে যাচ্ছে। কেউ তার পাশে নেই। তাকে ঠিক পথ চিনে মাঠ পার হয়ে যেতে হবে।

এত সব ভাবতে ভাবতে সে দেখল একসময় দূর থেকে টুকুন দিদিমণির জানালাটা দেখা যাচ্ছে। সে এবার প্রায় রাস্তা ধরে ছুটতে চাইল। কারণ সে দেখতে পাচ্ছে, ঠিক স্পষ্ট নয়, এখনও স্পষ্ট নয়, তবু মনে হচ্ছে জানালাটা বন্ধ। এখন শরৎকাল। আকাশে নানা বর্ণের মেঘের খেলা। কখনও বৃষ্টি, কখনও নির্মল আকাশ। অথচ এ-সময় জানালা বন্ধ। টুকুন দিদিমণি কখনও জানালা বন্ধ করে না। ওর মনে হল হয়তো ক'দিন ওকে আসতে না দেখে হতাশায় জানালা বন্ধ করে দিয়েছে।

ওর খুব খারাপ লাগছিল। সে কেন যে এল না, কেন যে সিস্টারের ওপর অভিমান করে এল না! যদি অন্য কিছু হয়, যদি টুকুন দিদিমণির ছোট্ট পাখির মত আত্মাটা উড়ে চলে যায়! এ-সব মনে হতেই কেমন ওর বালকের মত বুক ভরে কান্না উঠে আসতে চাইল। সে বলল, দিদিমণি, এবার থেকে ফের আগের মত রোজ আসব। আমি এসেছি।

কিন্তু সে গিয়ে যা দেখল—সত্যি অবাক, জানালা বন্ধ। সেখানে কেউ আছে বলেও মনে হয় না।

সুবল পাগলের মত জানালায় শব্দ করতে থাকল।

সহসা জানালা খুলে, প্রায় পাঁচ সাতটা মানুষ ওকে তেড়ে এল। সে ওদের কাউকে চেনে না। ওরা সবাই একসঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে আছে।

তবু এরই ভিতর সে যা দেখল, একজন খুব মোটামত মানুষ বিছানায় বসে আছে। ওর পাশে একটা মোটা নলের মত কি যেন। মাঝে মাঝে দুটো সরু হলুদ রংয়ের নল সে টেনে নিয়ে দরকার হলে নাকে দিচ্ছে আবার খুলে রাখছে। মোটা গোঁফ লোকটার। সুবল ওদের তবু বলল, আমার টুকুন দিদিমণি এ-ঘরে ছিল। আমি ওকে দেখতে এসেছি।

লোকগুলো কোন কথা বলল না। মুখের ওপর জানালা বন্ধ করে দিল।

১১

এটা একটা বড় বাড়ি। খুব বড়। কলকাতার ওপর এতবড় বাড়ি সচরাচর দেখা যায় না। বাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। খুব ছিমছাম, পরিপাটি নরম ঘাসের চাদর বিছানো চারপাশে। সামনে একটা ছোট্ট পাহাড়। দু'দিকে দুটো পথ চলে গেছে। পাঁচিল লম্বা, দু' মানুষ-সমান উঁচু পাঁচিল বাড়িটার চারপাশে। পাঁচিলের পাশে সব ছোট ছোট আউটহাউস। এবং নানা বর্ণের কবরীফুলের গাছ। গাছের নীচ দিয়ে হেঁটে গেলে বোঝাই যায় না এ-বাড়িতে কোন দুঃখ জেগে আছে।

অথচ একটা মেয়ে, ছোট্ট জানালায় বসে রয়েছে। সে এখন জানালা আর বন্ধই করে না। সে আসবে। ঠিক আসবে। কারণ সুবল না এসে পারে না। ওর পাখিটা যখন সম্বল আছে, সে আজ হোক কাল হোক, জানালায় পাখিটাকে পাঠিয়ে দেবে। টুকুন আছে দোতালার দক্ষিণ দিকের বারান্দায়। নীচে মালীরা বড় একটা বাগান করছে। কত সব ফুলের সমারোহ এখন। শেফালীগাছে কত অজস্র ফুল। এবং সকাল হলেই গীতামাসি যখন জানালা খুলে দেয়, সে দেখতে পায় কত সব পাখি এসেছে গাছটায়। সে সুবলের পাখিটাকে তার ভিতর খোঁজার চেষ্টা করে। যদি ওদের সঙ্গে ছদ্মবেশে মিশে থাকে পাখিটা।

আর কি সুন্দর মনে হয় পৃথিবী। ওই যে সকাল হল, কিছুক্ষণ পরই রোদ এসে নামবে, এবং সামান্য শিশিরের টুপটাপ শব্দের মত পাখিরা এসে বসেছে গাছগাছালির ভিতর—তার যে কি ভাল লাগছে!

এই দক্ষিণের বারান্দায় কাঁচের জানালা সব। ভিতরে টুকুনের

মনোরঞ্জনের জন্য নানা রকমের খেলনা। এখন এই ক'মাসেই বোঝা যায় টুকুনের বয়স আর খেলনার জগতে নেই। সে সুবলের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই শারীরিক কি সব অনুভূতি যেন তাকে ক্রমে গ্রাস করছে। সে এখন সুন্দর সুন্দর বই পড়তে ভালবাসে। দি পপার অ্যাণ্ড দি প্রিন্স গল্পটি বড় ভাল লাগে। কখনও সে আতোয়ান দ্য স্যাঁত—একজুপেরির ল্য পতি প্র্যাঁস পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে যায়। সেই সাহারা মরুভূমির বুকে নায়ক, সে বিমান বিকল হয়ে যাওয়ায় ওখানে পড়ে গেছে, সাত-আট দিনের মত মাত্র পানীয় জল আছে—আর আশ্চর্য সেই মানুষটা যখন একাকী, নিঃসঙ্গ মানুষের বসতি থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে, এবং শুধু আকাশ সীমাহীন দেখা যাচ্ছে, কিছু নক্ষত্র, আব কাঁটাগাছ মরুভূমির, তখন কিনা সকাল হলে, সুন্দর এক ছোট্ট রাজপুত্রের কণ্ঠ সে শুনতে পায়—আমাকে একটা ভেড়াব বাচ্চার ছবি এঁকে দাও না!

টুকুন সুবলের যেন সেই ছোট্ট রাজপুত্রের সঙ্গে একটা আশ্চর্য মিল পায়। সুবল এখন অপেক্ষায় আছে, তার জন্য কেউ একটা সুন্দর ছবি এঁকে দেবে। টুকুন আজকাল বরং ঘর থেকে খেলনাগুলো সরিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। পরিবর্তে ওর ঘরে এখন আলমারি-ভর্তি বই। এবং সুন্দর সুন্দর সব ভালবাসার কথা সেখানে লেখা আছে।

আবার টুকুন আজকাল নানারকম গ্রহ-নক্ষত্রের বই পড়তে ভালবাসে। বিশাল সৌরমণ্ডলের কথা ভেবে সে কেমন মুহ্যমান হয়ে থাকে। সেখানে সামান্য টুকুন অথবা তার অসুখ, সে বড় হচ্ছে না, তার শরীরের সব লক্ষণগুলো কোথায় যেন আটকে আছে—এসব বড় তুচ্ছ। তখন তার কেন জানি বাবা-মা-র ওপর ভীষণ করুণা হয়। মা-বাবা কেন যে মুখ করুণ করে রাখে! মা কিছুতেই কেন যে সুবল এ-বাড়িতে আসুক চায় না! বাবার সঙ্গে ওই নিয়ে মা-র কি ভীষণ মন-কষাকষি! বাবা শেষ পর্যন্ত মা-র কথাতেই রাজী—তাই বলে

একটা রাস্তার ছেলে কখনও টুকুনের সঙ্গী হতে পারে না। আমি বরং রণবীরকে বলব ওর ছেলে ইন্দ্রকে যেন পাঠিয়ে দেয়। এখানে থাকবে। কি সুন্দর সুপুরুষ রণবীর। ওর ছেলে বাপকেও ছাড়িয়ে গেছে। এমন কথার পর বাবা আর সিস্টারকে ঠিকানা দিতে পারেননি। সুবল এলে পাঠিয়ে দিতে বলেননি।

তবু টুকুনের ধারণা, সুবল আসবে। কারণ সে কেন জানি সুবলকে এ-গ্রহের বাসিন্দা বলে ভাবতেই পারে না। সেই ছোট রাজপুত্রের মত তার বাড়ি অন্য কোন গ্রহে হবে। সে কোন অলৌকিক যানে চড়ে এখানে নেমে এসেছে। সুবল নিজের সঠিক ঠিকানা জানে না। তার গ্রহটা খুব ছোট। একটা বাড়ির মত গ্রহটা। সে সেখানে এতদিন থাকত বোধহয়।

সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গল্পের মত মনে হয় সত্যি এই সৌরজগতে কত তো গ্রহ আছে। সংখ্যায় তারা কত কেউ বলতে পারে না। কত সব ছোট্ট গ্রহ আছে যা দূরবীণে পর্যন্ত ধরা পড়ে না। অথবা কখনও কখনও বিন্দুর মত ধরা পড়লে জ্যোতির্বিদরা সংখ্যা দিয়ে তার অবস্থান অথবা নাম প্রকাশ করে থাকে। বড়দের তবু নাম আছে একটা—পৃথিবী বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র। কিন্তু ছোটদের জন্য কেউ নাম দেয় না। কোন জ্যোতির্বিদ কোন একটা গ্রহ আবিষ্কার করে বসলে একটা সংখ্যা দিয়ে দেন। গ্রহাণু ৩০৪০৮৩, একটা সংখ্যা দিয়ে হয়তো ঠিক নির্ণয় করা যায় সেই রাজপুত্র তেমন একটা ছোট্ট গ্রহের বাসিন্দা। ছোট্ট রাজপুত্রের কথা ভাবলেই সুবলের আশ্চর্য সুন্দর চোখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সুতরাং সকাল হলেই টুকুন বুঝতে পারে—এই পৃথিবী কত সব ভারি মজার ব্যাপার নিয়ে বেঁচে আছে। এই পৃথিবীর মাটিতেই সাহারা মরুভূমিতে এক ছোট্ট রাজপুত্রের সঙ্গে লেখকের দেখা হয়ে গেছিল। বড়রা এ-সব বিশ্বাস করবে না। যেমন বড়রা বিশ্বাস করবে

না, ছোটরা যদি ছবি এঁকে দিয়ে বলে, এই ছবিতে একটা বাঘ এঁকেছি, বাঘের মুখে হরিণ—ওরা বলবে, ধ্যাৎ, তা হয় নাকি, এটা তো রহমৎ মিঞার গোঁফ হয়ে গেল। তা হয় কি করে। এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি করেও বড়দের বিশ্বাস করানো যাবে না—কখনও কখনও কোন ছোট রাজপুত্র অন্য গ্রহাণু থেকে চলে আসতে পারে। টুকুন ভাবল, এসব কথা শুধু একজনকেই বলা যাবে—সে সুবল, সুবল শুনলে বলবে, হ্যাঁ দিদিমণি আমাদেব ছিল একটা নদী, বড় নদী, নদী শুকিয়ে গেল—সে যেমন বলেছিল, দিদিমণি স্বপ্নে দেখেছি, আমরা চলে আসার পর জনার্দন চক্রবর্তী ফিরে গেছে নদীতে। যেখানে দিনমানে আমরা গর্ত করেছিলাম—সেখানে কি নির্মল জল। জলের ভিতর একটা হরিণ-শিশু পড়ে গেছে।

সুবল যখন এমন বলে, তখন মনে হয় সব কিছু সত্যি হতে পারে। সে এলে গল্পটা বলা যাবে। বলা যাবে ছোট্ট রাজপুত্র বার বার একটা কথা কেবল বলছিল, আমাকে একটা ভেড়ার বাচ্চা এঁকে দাও। মানুষটা কি করে তখন, সে বলেছিল. আমি ছবি আঁকতে জানি না।

ছোট্ট রাজপুত্রের এক কথা, দাও না আমাকে একটা ভেড়ার বাচ্চা এঁকে!

মানুষটা ভাবল ভারী বিড়ম্বনা। এমনিতে উড়োজাহাজটা বিকল হয়ে গেছে। সাত-আট দিনের মাত্র জল আছে এর মধ্যে, কিছু না করতে পারলে মরে যেতে হবে। তখন এমন এক ছোট্ট রাজপুত্র কি করে যে এখানে! সে বলল, ছোট্ট রাজপুত্র আমি ছেলেবেলাতে একটা ছবি এঁকেছিলাম।

রাজপুত্র বলেছিল, তাই বুঝি?

—কিন্তু কি জান, আমি যা ভেবে আঁকলাম, তা সত্যি হল না!

—মানে?

—আমি একটা অজগরের মুখে হাতির ছবি এঁকেছিলাম।

—বাবা! বেশ তো!

—না, বেশ নয়।

—কেন নয়?

—কেউ বিশ্বাসই করল না ওটা অজগরের হাতি গেলার ছবি।

—ওরা কি বলল?

—ওরা বলল, ওটা একটা টুপি।

ছোট্ট রাজপুত্র হা হা করে হেসে উঠল।--বড়রা খুব অঙ্ক ভালবাসে। অঙ্কের হিসাবে না মিললে ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। যেমন ছ্যাখো, বিশ্বাস করতে চায় না কেউ আমার বাড়ি একটা গ্রহাণুতে। কিন্তু লামারতিন নামে এক জ্যোতির্বিদ আবিষ্কার করেছিল—সেটা সতেরোশো বাইশের জানুয়ারীর আঠাশ তারিখ হবে, আমার গ্রহের নম্বর পর্যন্ত ঠিক করে দিয়েছিল···

—কত?

ছোট্ট রাজপুত্র বলল, তিন আট সাত পাঁচ···ছোট্ট রাজপুত্র বলতে থাকলে আর শেষ হয় না।

টুকুনের মনে হত সে নিজেই সাহারা মরুভূমিতে একটা ছোট্ট এরোপ্লেন নিয়ে নেমে গেছে এবং যা কিছু কথা সব তার সঙ্গে হচ্ছে।

এমন একটা সকালে যখন সে এসব ভাবছিল, এবং জানালা দিয়ে সব সুন্দর সুন্দর ফুলের সৌরভ ভেসে আসছিল, তখন ইন্দ্র এসে হাজির।

টুকুন বলল, ইন্দ্র, আজও সুবল এল না।

—আসবে।

—তুমি ওকে আমার ঠিকানাটা দিয়ে আসবে?

—ও কোথায় থাকে?

—তা জানি না। সে একটা দেবদারু গাছের নীচে শুয়ে থাকে জানি।

ইন্দ্র জানে টুকুনের এমনই কথা বলার ধরন। টুকুনকে আজ শাড়ি পড়িয়েছে গীতামাসি। টুকুনকে খুব স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল। কিন্তু টুকুনের ভিতর কোন লজ্জা নেই। সে তার শাড়িব আঁচল বুক থেকে ফেলে দিয়েছে। ইন্দ্র যে পুরুষ সেটা মনেই হয় না টুকুনের চোখ দেখে। ইন্দ্র বেশী সময় সঙ্গ দিতে পারে না। সে সুন্দর করে সেজে আসে। সে যতটা পারে সরু প্যাণ্ট জামা পরে এবং ওর ভিতর কিছু কৃত্রিমতা থাকে বলে টুকুনের ভারি হাসি পায়। সে কিছুতেই টুকুনকে ছুঁতে চায় না। টুকুন সে এলে ঠিক বান্ধবীর মত জড়িয়ে ধরতে চায়—আব ইন্দ্র তখন কেমন করে, টুকুন তো এখনও ভাল করে হাঁটতে পাবে না। তখন সবকিছু তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। সে আর নড়তে পারে না খাট থেকে।

টুকুন ডাকল, ইন্দ্র কাছে এস।

ইন্দ্র কাছে গেলে বলল, তুমি আমার হাত ধর।

ইন্দ্র হাত ধরতে সঙ্কোচ করলে বলল, তুমি ইন্দ্র এমন কেন, সুবলকে যদি দেখতে, সে আমার জন্য সব করতে পাবে। আমি ভাল হলে সুবলকে ঠিক নিয়ে আসব।

ইন্দ্র বলল, মাসিমা বলেছে আমরা আজ 'চাঁদমামার সংসার' দেখতে যাব।

—কোথায় ?

—ছোটদের নাট্য-সংসদে।

—আমি যাব না।

—তুমি গেলে খুব আনন্দ পাবে টুকুন।

—আমার ভাল লাগে না।

মা এসে বললেন, খুব ভাল লাগবে। ইন্দ্র আর তুমি যাবে।

—আমার ভাল লাগে না মা। আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যাবে, আমার এটা ভাল লাগে না।

—ডাক্তার বলেছে, তুমি ভাল হয়ে গেছ। এখন শুধু তোমাকে নিয়ে ইন্দ্র ঘুরে বেড়াবে।

ইন্দ্র বলল, আমি দেখেছি। খুব ভাল।

টুকুন বলল, ওসব বাচ্চাদের বই।

—না, সবাই দেখতে পারে। সবারই ভাল লাগবে।

—আমার এখন বোদ ভাল লাগে। বৃষ্টি অথবা ঝড়। আমার কখনও সূর্য ওঠা দেখতে ভাল লাগে। পাখিবা তখন আশ্চর্যভাবে উড়ে বেড়ায়। আমার কেন জানি মনে হয় সুবল তার দেশে চলে গেছে। সে রোদে বৃষ্টিতে অথবা ঝড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কি সুন্দব যে তাকে লাগছে দেখতে! চোখ বুঝলে আমি সব টেব পাই।

তবু ইন্দ্র বার বার চেষ্টা করল। এখন ইন্দ্রের কলেজ বন্ধ। সে এখানেই থাকবে। ইন্দ্রের জন্য নীচে একটা বড ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রর সকালে একবাব বিকেলে একবার আসার কথা। সবই ডাক্তারের পরামর্শ মত হচ্ছে। যখন পাখিয়ালা সুবলকে মিসেস মজুমদাব মাঝে মাঝে আসতে দিতে একেবারেই রাজী হলেন না, তখন আর কি কবা। তবু তাঁর ধারণা, জীবনেব ভিতরে এই বয়সে যে উদ্দামতা দেখা যায়, ইন্দ্রের শরীর থেকে মেয়েটা তার গন্ধ পেলে হয়তো বাছ-বিচার না করে এক আশ্চর্য গন্ধে এই পৃথিবীর কোন এক সকালে সে বড় হয়ে যাবে। এবং পৃথিবীময় তখন সে মনোরম সঙ্গীত শুনতে পাবে—যা সে কোনদিন টের পায়নি, এত ভাল; এভাবে পৃথিবী ক্রমে তার কাছে আরও বড় হয়ে যাবে। সে তখন ছুঁতে পাবে চারপাশটা।

ইন্দ্র বলল, তুমি না গেলে আমি যাচ্ছি না।

টুকুন বলল, আমাকে শাড়ি পরলে বড় দেখায়?

—খুব বড়।

—মা-র মত লাগে?

—মাসিমার মত লাগবে কেন?

—বা রে, শাড়ি পরলে মাসিমার মত না লাগলে তবে শাড়ি পরা কেন?

—তোমাকে টুকুনই লাগছে। যুবতী টুকুন।

—বাঃ, আমি যুবতী হব কি করে, বলেই সে কেমন হতাশ মুখে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল। ভীষণ অভিমান সুবলের ওপর। কি দরকার ছিল ট্রেনে দেখা হওয়ার! কি দরকার ছিল পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দেবার! আমি বেশ তো মরে যাচ্ছিলাম। মরে যেতে আমার ভীষণ ভাল লাগছিল। সবার আগে মানুষের সব দুঃখ বুঝতে না বুঝতে চলে যেতাম তবে। তুমি কেন যে আমার শরীরে আবার প্রাণের সাড়া এনে দিলে! দিলে তো একেবারে ভাল করে দিলে না। কখনও কখনও এত ভাল লাগে সবকিছু—আবার কখনও কখনও কেমন হতাশা। আমার কি আছে বল? ইন্দ্র আমার কাছে আসে দায়ে পড়ে। ও তো আমাকে ভালবাসে না। আমার কিছু নেই। আমি এখনও বাচ্চা মেয়ে হয়ে আছি। ওর কেন আকর্ষণ থাকবে বল?

এভাবে কত সব ভাবনা এসে মাঝে মাঝে টুকুনকে ভীষণ অভিমানী করে রাখে—পাখিটাকে পাঠিয়ে দিতে পারছ না? সে আমার কত খবর নিয়ে যেত। আমার কত গল্পের বই আছে। সেখানে কতরকম ভাবে সব মানুষ সমস্ত সৌরজগতের খবর নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর তুমি তোমার পাখিটাকে পাঠিয়ে আমার খবরটুকু নিতে পারছ না!

টুকুন এখন দেখল ইন্দ্র আর নেই। এত বড় একটা সম্পত্তির ওপর ইন্দ্রের লোভটা সে কি করে যে টের পায়। ইন্দ্রের বাবা খুব খুশী। আগে এ-বাড়িতে ওদের গলা সে কখনও শুনেছে মনে করতে পারে না। এখন এ-বাড়িতে ইন্দ্রকে নিয়ে আসায়—ওরা খুব আসে। বাবার মুখ দেখলে টের পায় টুকুন, তিনি আর কাজে কোন উৎসাহ

পাচ্ছেন না। চারপাশ থেকে বাবাকে কারা যেন অক্টোপাশের মত গিলে খাচ্ছে। কখনও কখনও এমন মনে হয়ে যায় যে টুকুন ইন্দ্রকে একদম সহ্য করতে পারে না। কিন্তু স্বভাবে টুকুন ভারি মধুর। সে রাগ করে কেন জানি কথা বলতে পারে না। রাগ করে কথা বলতে পারলে সে কবে ইন্দ্রকে তাড়িয়ে দিত।

টুকুন বুঝতে পারে এভাবে একজন তরুণ বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারে না। সে যখন খুব বিনয় করে বলে, আমি আসি টুকুন, আবার পরে আসব—তখন টুকুনের ভারি হাসি পায়। কেন যে মিথ্যা অভিনয় করছে ইন্দ্র! ওর বলতে ইচ্ছা হয়, তোমাকে আর কখনও আসতে হবে না। তুমি আমার কাছে এসে কোন উৎসাহ পাও না। উৎসাহ না পেলে কিছুই জমে ওঠে না। যদি সুবলকে দ্যাখো, দেখবে সে যে কোথাকার সব রাজ্যের ফুল ফল পাখির খবর নিয়ে আসছে।

সুতরাং ইন্দ্র চলে গেলে পর ফাঁকা। মা এসে কিছুক্ষণ পাশে বসে থেকে গেছে। গীতামাসি আসবে নানারকমের খাবার নিয়ে। সে একটা দুটো খাবে, বাকিটা খাবে না। তারপর ওর যা কাজ, জানালায় বসে মালিদের বাগানে কাজ দেখা। প্রতিটি গাছ ওর এত চেনা যে, এখন ইচ্ছা করলে সে যেন বলে দিতে পারে কোথায় ক'টা নূতন কুঁড়ি মেলেছে, কখন ফুল ফুটবে, ক'টা ফুল ক'টা গাছে ফুটে রয়েছে। ম্যাগনোলিয়া গাছে দুটো ফুল ফুটেছিল কাল। সাতটা কুঁড়ি। তিনটা ফুটবে ফুটবে ভাব। আগামীকাল তিনটা ফুল ফুটবে। আগে এইসব ভাল জাতের ফুল তুলে এনে ওর ঘরে নীল রংয়ের ভাসে সাজিয়ে রাখত গীতামাসি। কিন্তু সে বারণ করেছে, ফুলেরা গাছে থাকলে বেশী ভাল লাগে। ওরা যে কি ভাবে ফোটে! কখনও কখনও রাত জেগে দেখতে ইচ্ছা হয়। সে এভাবে আজ পর্যন্ত একটা ফুলের কাছকাছি যেতে পারল না। ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারল না। কান্নায় ওর গলা বুজে আসে তখন।

সুবল এলে বুঝি সত্যি সত্যি সে এবার ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারত। শরীরে তার নানারকমের ঘ্রাণ, সুন্দর সুন্দর সব ইচ্ছারা খেলা করে বেড়াত। সুবল এলে এইসব ইচ্ছা কেন যে জেগে যায়। এবং সে তখন যেন ইচ্ছা করলে ছুটতে পারে।

সে বলল, গীতামাসি আমাকে ছোট্ট রাজপুত্রের বইটা দাও তো।

টুকুন 'বৈমানিকের ডায়রি'টা তুলে নিয়ে সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গল্পটা পড়তে থাকল।

বৈমানিক লিখেছে, প্রতিদিন আমি তার গ্রহ, সেখান থেকে তার যাত্রা তার ভ্রমণ বিষয়ে খানিকটা করে জেনেছিলাম। এভাবে তৃতীয় দিনে বাওবাব গাছের গল্পটি জেনেছিলাম।

সেটাও আমার সেই ভেড়ার ছবি আঁকার কল্যাণেই জানতে পেরেছি।

কারণ দেখেছিলাম, ওর মুখে ছোট্ট সংশয়ের রেখা। সে যেন কি ভাবছে। কি যে ভাবছে আমি জানি না। চারপাশে বিরাট সাহারা, আমার কাছে আর পাঁচ দিনের মাত্র জল আছে। এর ভিতর উড়োজাহাজটাকে মেরামত করে নিতে না পারলে, আমি আর ফিরতে পারব না। আমার ছোট্ট বন্ধুটির সঙ্গে সারা মাস কাল বোধহয় এই মরুভূমিতেই ঘুরে মরতে হবে। আমি বললাম, কিছু বলবে?

—অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি কিছু বলব, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—তুমি যে-ভাবে কাজ করে যাচ্ছ—

—হ্যাঁ কাজ করছি। না হলে দেশে ফেরা যাবে না।

—কিন্তু তুমি ঠিক জানো তো ভেড়ারা গুল্ম খায়?

—হ্যাঁ খায়।

—যাক বাঁচা গেল! কি যে ভাবনা হচ্ছিল!

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সে এমন বলছে কেন! আবার ছোট্ট রাজপুত্রের ভারি গলায় প্রশ্ন—ওরা বাওবাব খায়?

আমি হেসেছিলাম। এমন একটা প্রাণ-সংশয়ের ভিতর আছি, আর সে কিনা এমন সব প্রশ্ন করছে—ভেবে অবাক, বললাম—বাওবাব তো গুল্মজাতীয় গাছ নয়। তুমি যদি একপাল হাতি নিয়ে যাও এবং তার ওপর তোমার ভেড়াটাকে চাপাও, তবু বাওবাবের পাতার নাগাল পাবে না।

—অঃ। ছোট্ট রাজপুত্রকে খুব যেন চিন্তিত দেখাল। তারপর খুব জোরে হেসে নিল, তুমি একটা কথা জান না, সব গাছই বড় হবার আগে ছোট থাকে। ছোট থেকে বড় হয়।

—তাহলে তুমি বাওবাবের চারাগাছের কথা বলছ?

ছোট্ট রাজপুত্র কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখল। আর একটা সংশয় যেন দানা বাঁধছে। প্রশ্ন করল, ভেড়া যদি গুল্ম খায় তাহলে বলতে হবে ফুলও খায়।

—ওরা যা পায় তাই খায়। আমাদের দেশে কথাই আছে, ছাগলে কি না খায়, পাগলে কিনা বলে!

—ছাগল ব্যাপারটা কি?

বুঝতে পারলাম ছোট্ট রাজপুত্র ছাগল ব্যাপারটা জানে না। আমি বললাম, সে এক রকমের ভেড়ার মতই দেখতে জীব।. এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে আবার সংশয় ফুটে উঠছে। সে কিছু আবার প্রশ্ন করবে বুঝতে পারলাম।

—আচ্ছা যে ফুলের কাঁটা আছে—

—যে ফুলের কাঁটা আছে ওরা তাও খেয়ে নেবে।

তখন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম বিমানের কাজে। একটা লোহার ভাঙা ভিতরে ঢুকে গেছে। ওটাকে বের করতে না পারলে শান্তি নেই। জলও ক্রমে আমার কমে আসছে। খুব শঙ্কিত ছিলাম

এ-জন্য। পাশে ছোট্ট রাজপুত্রের একের পর এক প্রশ্ন। আর আশ্চর্য, কোন প্রশ্নের যতক্ষণ পর্যন্ত জবাব না পাবে—একনাগাড়ে সে তা জানতে চাইবে। মনে মনে কিছুটা বিরক্ত। যা মনে আসছে তাই আবোল-তাবোল কিছু বলে সান্ত্বনা দেবার মত বললাম, কাঁটা দিয়ে কিছু হয় না। ওগুলো আমার মনে হয় ফুলগুলির দুষ্টুমি।

ছোট্ট রাজপুত্র বলল, ও। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কেমন ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, তোমার কথা মানি না। যা মনে আসছে বলে যাচ্ছ। ফুলেরা দুর্বল আর সরল বলে কাঁটা না থাকলে চলে না। ও-ভাবে কাঁটা আছে বলেই কারো কারো কাছে ওরা ভয়ানক।

কোন জবাব দিচ্ছিলাম না। এত বড় একটা মরুভূমির মত মত জায়গায় ছোট্ট রাজপুত্র আমার সঙ্গী। সে যদি আমাকে ফেলে চলে যায়—ভাবতেই গা-টা ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি ডাণ্ডাটা খোলার জন্য খুব জোরে হাতুড়ি মারলাম। একেবারে ওটাকে উপড়ে আনতে চাইছি।

ছোট্ট রাজপুত্র ফের বলল, তুমি কি ভাব ফুলেরা—

—না না, আমি কিছুই ভাবছি না। কেবল আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছি। আমার মাথাটা ঠিক নেই। তা ছাড়া দেখছ না দরকারী কাজে ব্যস্ত।

ছোট্ট রাজপুত্র আমার দিকে ভারি বিস্ময়ের চোখে তাকাল। বলল, দরকারী কাজ! সে কি জিনিস আবার?

আমি কিছু বললাম না। আমার কিছু ভাল লাগছিল না।

হাতের আঙুলে, হাতুড়িতে তেল-কালি মাখা। বেয়াড়া একটা যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে আছি সেই কখন থেকে। ছোট্ট রাজপুত্র আমায় কেবল এখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এবং বুঝতে পারছিলাম ভীষণ রেগে যাচ্ছে। সে ফের বলল, তুমি বড়দের মত কথা বলছ।

আমি কিছু বলছি না। এমন কি তাকাচ্ছিও না।

সে বলল, তুমি সব ভুলে গেছ, গুলিয়ে ফেলছ।

ছোট্ট রাজপুত্র এ-ভাবে চটে যাচ্ছে। সে কোন ছোট গ্রহাণু থেকে পাখিদের ডানার মত এক রকমের কি সব লাগিয়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে এসে সে এমন একটা বেরসিক লোকের দেখা পাবে বোধহয় আশাই করতে পারেনি। ওর সোনালি চুলগুলি কি যে মাখনের মত নরম, ওর চোখ কি যে নীল—সে আর যেন আমার এই অবহেলা মোটেই সহ্য করতে পারছে না।

সে এবার একনাগাড়ে বলে চলল, একটা গ্রহের কথা জানি আমি। সেখানে ঘন লাল রংয়ের একটা লোক থাকে। কখনও একটা ফুল শুঁকে দেখেনি। সে কোনদিন সাদা জ্যোৎস্নায় হেঁটে বেড়ায়নি আকাশের তারা দেখেনি, কাউকে সে ভালবাসেনি। সে একটা যোগ অঙ্ক ছাড়া কিছুই করেনি। সারাদিন তোমার মত বলত, আমি ভারি ব্যস্ত মানুষ। আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ত না। একটু থেমে ছোট্ট রাজপুত্র দুহাতে বালি ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, সে কি একটা মানুষ! সে তো একটা ব্যাঙের ছাতা!

—একটা কী? হাতের সব কাজ ফেলে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

—একটা ব্যাঙের ছাতা। রাগে ছোট্ট রাজপুত্র একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

ওর সোনালি চুল ছোট পাখির বাসার মত বাতাসে যেন কাঁপছে।

সে ক্রমান্বয়ে রাগে দুঃখে বলে চলল, লাখ লাখ বছর ধরে ফুলেরা কাঁটা তৈরি করছে। আর লাখ লাখ বছর ধরে ভেড়ারাও ফুল খেয়ে যাচ্ছে। যে কাঁটা কারুর কোন কাজে আসে না, ফুলেরা তাই বানাতে গিয়ে এত কষ্ট করে কেন, সেটা জানা কি দরকারী নয়? এই যে

লড়াই ফুলের সঙ্গে ফুলের কাঁটার, ভেড়ার সঙ্গে ফুলের—সেটা একটা যোগ অঙ্কের চেয়ে বেশী দরকার নয় জানার।

আর কথা বলতে পারছিল না ছোট্ট রাজপুত্র। কোনরকমে ধীরে ধীরে বলছিল—কেউ যদি একটা ফুলকে ভালবাসে, যে ফুল লক্ষ লক্ষ তারার ভিতর তাদেরই একটি হয়ে ফুটে আছে, এবং তখন যদি একটা ভেড়া সেই ফুল খেয়ে ফেলে—আর যদি আকাশের তারারা সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় ভয়ে, তখন কি সেটা আমাদের জীবনে বড় সমস্যা নয়?

এবং এ-ভাবে ছোট্ট রাজপুত্র আর কথা বলতে পারছিল না। হঠাৎ কেন যে ফুঁপিয়ে ওঠে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। রাত নেমে এসেছিল। যন্ত্রপাতি ফেলে এবার ওঠে দাঁড়ালাম। এই মরুভূমির রুক্ষতা, সীমাহীন বালুরাশি, তৃষ্ণা, মৃত্যুভয়—সবই কেমন তুচ্ছ বলে মনে হল। কেন জানি মনে হল আমার গ্রহ এই পৃথিবীতে এক ছোট্ট রাজপুত্র চলে এসেছে—যার নিয়মকানুন সব আলাদা, যাকে আমায় সান্ত্বনা দিতে হবে। ওকে হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিলাম। একটা ফুলের মালার মত হাতের ওপর দোলাতে লাগলাম। তাকে সান্ত্বনা দিলাম, যে ফুল ভালবাস তুমি, তার কোন বিপদ হয়নি। তোমার ভেড়ার একটা মুখ-ঢাকা এঁকে দেব। আর তোমার ফুলের জন্য একটা বর্ম। আর ভেবে পেলাম না ওর হয়ে আমি আর কি বলব। বুঝতে পারছিলাম না তাকে কি ভাবে আর শান্ত করব। কি করে তার মন পাব। চোখের জলের রাজ্যটি সত্যি বড় রহস্যময়।

টুকুন বুঝতে পারল না এ-ভাবে বইটি পড়তে পড়তে সে-ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেন। এ-ধরণের কান্না তার বুক বেয়ে কখনও ওঠে আসেনি। সে নির্বান্ধব ছেলেটি এখানে কোথায়। সে তার কাছে এলে যেন এখন বলতে পারত, আমরা এখানে থাকব না সুবল, সেই

ছোট-গ্রহাণুতে চলে যাব। তুমি আমি ছোট্ট রাজপুত্র একসঙ্গে থাকব। ওর ফুলকে পাহারা দেব।

এবং এ-ভাবে টুকুন কখনও কখনও সন্ধ্যায় অথবা রাতে নিজের বিছানা থেকে বড় জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশ দেখতে থাকে। এবং সব উজ্জ্বল গ্রহ দেখতে দেখতে কোন বিন্দুর মত অনুজ্জ্বল কিছু দেখলেই মনে হয় বুঝি সেই গ্রহাণুতে ছোট্ট রাজপুত্র থাকে। সুবলকে নিয়ে সে যদি সেখানটায় যেতে পারত!

১২

সুবল সেদিন শেফালীবৌদির কাছে ফিরে আসবে ভেবেছিল। সে গিয়ে যখন দেখল টুকুন দিদিমণি হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে, তখন ওর আর কিছু ভাল লাগছিল না। কেউ তাকে আর কোন খবরও দিল না। সে দুবার চেষ্টা করেছে সেই সিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে। কিছুতেই সুবলের সঙ্গে সিস্টার দেখা করতে চায়নি।

তবু যা হয়ে থাকে, মনের ভিতর এক অসীম বিষণ্ণতা। সে যখন তার গ্রাম মাঠ ফেলে চলে আসছিল, তখন কি ভীষণ মায়া তার গ্রাম মাঠের জন্য। সে বার বার বলেছে, আমি আবার ফিরে আসব মা সুবচনী। সুবচনী দেবী ওদের খুব জাগ্রত দেবতা। তার যতদূর মনে আছে, বাবা-মা ওর কি একটা অসুখে একবার সেই দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়েছিল। সে সেই পূজা দেখেছিল, না অন্য মানুষের মুখে শুনে শুনে সে তার-বাবা-মা-র সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে রেখেছে, এখন মনে করতে পারে না।

সুবল জানত না এই শহরে এসে সে এক মায়ায় জড়িয়ে পড়বে। এতবড় শহরে কি করে যে টুকুন দিদিমণি তার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেল! এখন নিজের ওপরই তার রাগ হচ্ছে। সে যদি দেবদারু গাছটার নীচেই আস্তানা গেড়ে নিত! কিন্তু ওর কি যে হয়ে গেল, বেশী পয়সার লোভে সে অন্য ব্যবসা করতে গিয়েই মরেছে। সে সময় কম পেত। আগের মত খুশীমত দুজোড়া জুতো পালিশ করে গাছের নীচে ঘুম যেতে পারত না। এখন কেন জানি ঘুমিয়ে পড়লেই মনে হয় কেউ তার সবকিছু চুরি করে নিয়ে যাবে। তার এমন কিছু হয়েছে, যা চুরি যাবার ভয়। তার আর আগের মত কোন স্বাধীনতা

নেই। সে বুঝতে পারে, এইসব শহরে এলেই মানুষের স্বাধীনতা চুরি যায়।

সে যখন শেফালীবৌদির ওখানে ফিরল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। সে ইচ্ছা করলে ফুটপাথে রাত কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কেন জানি সে আজ খুব পরিষ্কার হয়ে গেছিল, এমন কি সঙ্গে সে পাখিটাকেও নিয়ে যায়নি। তার হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছিল, পাখিটাকে খাওয়ানো হয়নি। নানা কারণেই সে ফিরে না এসে পারেনি। আর এমন পরিচ্ছন্ন পোশাকে ফুটপাথে রাত কাটাতেও কেমন খারাপ লাগছিল।

শেফালী সুবলের মুখ দেখেই বুঝল, টুকুনের সঙ্গে সুবলের কিছু একটা হয়েছে।

সে বলল, মুখ গোমড়া কেন রাজা?

—তোমার কাছে থাকব বৌদি আজ। দাদা এখনো ফেরেনি?

—না। একটু থেমে বলল, সিস্টার আবার বুঝি ধমক দিয়েছে?

সে জবাব দিল না কিছু। গলায় সুবলের মাফলার জড়ানো স্বভাব। সে তার গ্রামে দেখেছে, কেউ বাবু বনে গেলে গলায় একটা কমফর্টার জড়িয়ে রাখে। সে-ও আজ গলায় একটা কমফর্টার জড়িয়ে গিয়েছিল। সে সেটা একটা দড়িতে ঝুলিয়ে ঝুড়ির ভিতর থেকে পাখিটাকে বের করল। সে পাখিটার জন্য ইচ্ছা করলে একটা খাঁচা কিনতে পারে। কিন্তু খাঁচায় পাখি রাখার ইচ্ছা সুবলের হয় না। পাখি সেই যে কবে বাঁশের চোঙে আশ্রয় নিয়েছিল, আর সে অন্য আশ্রয়ে যেতে চায়নি। সে বলল, পাখি তোর টুকুন দিদিমণি চলে গেছে।

পাখি পাখা নাড়ল। যেন বলতে চাইল, কোথায়?

—জানি না।

শেফালীর ঘুম পাচ্ছিল। সুবল কিছু খাবে হয়তো। ওকে জল-নুন দিতে হবে। বাকিটা সুবল নিজের কাছে রাখে। ছোলার ছাতু, লঙ্কা,

একটু চাটনি। সে একটা থালায় এসব রেখে শেফালীবৌদিকে হয়তো বলবে, এক গ্লাস জল দাও তো বৌদি, খেয়ে নি।

কিন্তু আজ সে-সব কিছুই করল না সুবল। বরং পাখিটাকে খাওয়াল। তারপর পাখিটার সঙ্গে কি যেন ফিস ফিস করে বলল, এবং এক সময় মনে হল, ওর টুকুনদিদিমণিকে খুঁজতে যাওয়া দরকার। সে শেফালীবৌদিকে বলল, বৌদি তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে। আমার যা কিছু—এই যেমন কড়াই, চিনেবাদাম, ছোলা মটর সব এখানে কিছু দিনের জন্য থাকল। কবে ফিরব ঠিক নেই। পাখিটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

—দেশে যাচ্ছ নাকি? অবাক চোখে তাকাল শেফালী।

—দেশে আমার কেউ নেই। আমাদের কেউ নেই। তবে স্বপ্ন দেখেছি একদিন জনার্দন চক্রবর্তী সুবচনী দেবীর মন্দিরের বাইরে একটা হরিণকে ধরার জন্য ছুটছে। কি যে স্বপ্ন! স্বপ্নটার কোন মানে হয় না।

—কিন্তু এত রাতে! কিছু খেলে না! তুমি কি পাগল!

সুবল হাসল। সুবলের লম্বা পাজামা, লম্বা পাঞ্জাবি গেরুয়া রংয়ের এবং সন্ন্যাসীর মত মুখ শেফালীকে কেমন কাতর করছে। সে বলল, খেলে না। টুকুনের কাছে গেলে—দেখা হল কিনা বললে না। সিস্টার কি বলল বললে না। কি হয়েছে তোমার?

—টুকুন দিদিমণি হাসপাতাল থেকে চলে গেছে।

—তাহলে দেখা হয়নি?

—না।

এক আশ্চর্য বিষণ্ণতা ধরা পড়ছে সুবলের চোখে মুখে। অথবা দেখলে মনে হয় সুবল মনে মনে কিছু স্থির করে ফেলেছে। তাকে এখন শেফালী কিছুতেই আটকে রাখতে পারবে না। শেফালী তবু বলল, কিছু খেলে না!

—কিছু খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

—তুমি তো দেখছি শহরের মানুষের মত হয়ে যাচ্ছ।

সুবল চোখ তুলে তাকাল।

—তোমার তো এমন হওয়া উচিত না রাজা।

সুবল কিছু বলল না। সুবলের যেমন স্বভাব কথাব ঠিক ঠিক জবাব দিতে না পারলে একটু হেসে ফেলা, তেমনি সে হেসে দিল।

এই হাসিটুকু ভাবি সুন্দর। এমন ভাবে হাসলে বড় বেশী সরল মনে হয়। তখন ওকে জড়িয়ে ধবতে ইচ্ছা হয়। আদব করতে ইচ্ছা হয়। এত যে মনের ভিতর তার অশান্তি—কেমন নিমেষে উড়ে যায়। তার মানুষ ঘরে থাকে না। মানুষটা সংসার চালাবার নামে কোথায় থাকে কোথায় যায় সে বলতে পারে না। এবং মদ্যপানে মানুষটা কখনও অমানুষ হয়ে গেলে শহরের সব দুঃখ একসঙ্গে ধরা যায়। তখন সুবলের মত একজন সরল গ্রাম্য বালকের সঙ্গ পেতে বড় ভাল লাগে।

শেফালী বলল, তুমি রাজা আজ কোথাও যেতে পারবে না।

সুবল দেখল শেফালীবৌদির চোখে ভীষণ মায়া। ভীষণ এক টান। এবং এই শহব, নির্বান্ধব শহরে সে কেন জানি আর না করতে পারে না।

শেফালী বলল, আমি ক'টা গরম রুটি সেঁকে দিচ্ছি। একটু আলুব তরকারি। বেশ খেতে ভাল লাগবে।

সুবল বলল, তুমি আমার জন্য এত রাতে এসব করবে?

—ব'ঃ করব না। তোমার দাদা এসে যদি জানতে পারে রাজা রাতে না খেয়ে বের হয়ে গেছে, তবে আমাকে আস্ত রাখবে!

সুবল বুঝতে পারে এই শহরের কোথাও নানা ভাবে নানা বর্ণের দুঃখ জেগে আছে। এই সংসারে এমন এক দুঃখ। অভাব-অনটনের সংসারে একটা মানুষ সবসময় কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে। কেমন একটা পালিয়ে বেড়ানোর স্বভাব অজিতদার। কোথায় যে এই

মানুষের আস্তানা সে সঠিক জানে না। খুব কম সময় সে অজিতদাকে এখানে দেখেছে। এবং শেফালীবৌদির চোখ দেখে মনে হয়েছে সে-ও সঠিক ঠিকানা অজিতদার জানে না। ওর মনে হল টুকুন দিদিমণির সঙ্গে অজিতদার সঠিক ঠিকানাটাও সে খুঁজে বের করবে। সে বলল, দাও তবে। আজ আর বের হচ্ছি না। যখন বললে, তখন আজ রাতটা এখানেই কাটানো যাক।

সুবল কেমন স্মার্ট গলায় এখন কথাবার্তা বলছে। সে দেখল বারান্দার উনুনে বৌদি আঁচ দিচ্ছে। এবং বৌদিকে দেখে মনে হচ্ছিল কিছুদিন থেকে দাদার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার অভাব হচ্ছে। অথবা বৌদির এমন একটা জায়গা ভাল লাগছে না। কারণ বৌদি খুব পরিপাটি এবং সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে।

অজিতদার খুব ইচ্ছা বৌদির জন্য সে যাবতীয় কিছু করবে। এত সব অট্টালিকা এই শহরে, বৌদির জন্য এমন একটা অট্টালিকা চাই। এবং যখন সে নানাভাবে চেষ্টা করেও কোনরকমে একটু সুন্দর ভাবে বাঁচবার মত ব্যবস্থা করতে পারে না, তখন কেমন হীনমন্যতায় ভোগে। এবং এ-ভাবে সংসারে অশান্তি নেমে এলে মনে হয় শেফালীবৌদিকে অজিতদা কোথা থেকে যেন চুরি করে নিয়ে এসেছে। অনেক কিছুর প্রলোভনে শেফালীবৌদি সব কিছু পিছনে ফেলে চলে এসেছিল। বৌদি কতদিন কতভাবে তাকে নানারকম সব গল্প শুনিয়েছে। এবং আজকের এই রাতে থেকে যাওয়া একটু বেখাপ্পা ঘটনা। ওর সঙ্কোচ হচ্ছিল।

শেফালী বলল, বেশ গরম পড়েছে। চান করে নাও।

কলতলা খোলা। সেখানে সে পাজামা খুলে চান করতে পারে না। এবং শরীরে সব অস্পষ্ট জলের রেখা চারপাশে ভেসে উঠছে। সে ছুঁলেই বুঝতে পারে নরম, খুব নরম ত্বকে বাবুইয়ের বাসার মত গুচ্ছ গুচ্ছ কি সব ভেসে উঠেছে। এবং এ-ভাবে ওর এক লজ্জা

নিবারণেব কথা মনে হয়। সে বলল, বৌদি আমি বরং রাস্তার কল থেকে স্নান করে আসি।

শেফালী বলল, এত রাতে বাস্তার কলে চান করলে পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে।

পুলিসকে বড় ভয় সুবলেব। সে বলল, আমি ববং হাত-মুখ ধুয়েনি।

শেফালী বলল, বাস্তায গাছের নীচে শুয়ে থাকলে এত গবম লাগে না বাজা।

ঘবে শুলে ভীষণ গবম। চান না করে নিলে ঘুমোতে পাববে না।

—তাহলে আমি যখন চান কবব, তুমি কিন্তু তাকাবে না।

—তাকালে কি হবে? শেফালী হেসে দিল।

সুবল বলল, আমি বড হযে গেছি বৌদি। বলেই সে কেমন ছেলে মানুষেব মত লজ্জায় মাথা নীচু করে রাখল।

—আমার বড় তোয়ালে আছে—ওটা পরে নাও।

—তোমাদেব অসুবিধা হবে না? অজিতদা খারাপ ভাবতে পারে।

সুবল আর কিছু না বলে বেশ বড় একটা তোয়ালে নিয়ে নিল। সংসারে অজিতদাব যা কিছু বোজগার সব শৌখিনতার জন্য। সুবল এতসব সুন্দবভাবে ভাবতে পাবে না। তবু যখন তোযালেতে এক মনোরম গন্ধ, সে তোয়ালেটা মুখে নিয়ে কেমন ঘ্রাণ নিতে থাকল এমন বং-বেরংয়ের তোয়ালে নিশ্চয়ই বৌদির। সে ঠিক টুকুন দিদিমণিব মত এক আশ্চর্য সুবাস পায় বৌদির শরীরে। আর কেন জানি সুবলের মনে হয় এই শহরে, সে যতবার যতভাবে যুবতী মেয়েদেব অথবা ফ্রক পরা মেয়েদের সান্নিধ্যে এসেছে, কেমন এক ফুলের সুভাস সবার গায়ে। সে ভাবল, সে যখন ফুল বিক্রি করবে তার শরীরেও এমন একটা মিষ্টি গন্ধ থাকবে।

শেফালীবৌদির চটপট সব হয়ে যায়। সুবল গড়িমসি করছিল খুব। ওর তো এমনভাবে বাঁচার স্বভাব নয়। এ যেন আলাদা ব্যাপার। সে একটা আলাদা স্বাদ পাচ্ছে। খুব নিরিবিলি একটা ঘরে, বৌদি, বৌদির রান্না, ঝালের গন্ধ, এবং আলোর ভিতর বৌদির কপালে ঘামের চিহ্ন কেমন এক আকর্ষণ তৈরী করছে। সে সুবল, সংসারের নিয়ম-কানুন সঠিক তার জানা নেই, সে জানে না, এ-ভাবে কোন যুবতী বালককে বেঁধে-বেড়ে খাওয়াতে পারে, সে ভারী এক রহস্যের স্বাদ পেয়ে যাচ্ছে, সে বলল, বৌদি এখানে এলে আমার আর যেতে ইচ্ছা হয় না। অজিতদা যে কি করে তোমাকে ফেলে এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে বুঝতে পারিনা।

শেফালী বলল, তুমি থেকে যাও না রাজা।

—আমায় যে বৌদি টুকুন দিদিমণির কাছে যেতে হবে।

—কে যে এক টুকুন দিদিমণি তোমার!

—না, খুব ভাল। আমাকে দেখলেই দিদিমণির প্রাণে যেন জল আসে।

—তুমি ঐ ভেবেই সুখে থাক।

সুবল বলল, আমি যখন ফুল বিক্রি করব তখন একটা করে ফুলের গুচ্ছ দিদিমণিকে দিয়ে আসব।

—তুমি ওকে কোথায় পাবে?

—কেন, এই শহরে।

—সে কি খুব ছোট ব্যাপার?

—আমি যখন ফুল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করব তখন আমার ডাক শুনলে ঠিক দিদিমণি টের পাবে। জানালা খুলে দিলে আমাকে চিনতে পারবে।

আমি বলব, দিদিমণি তোমার ফুল।

শেফালী এই সরলতার জন্য কেমন মুগ্ধ হয়ে যায়। সে বলল,

তুমি দাঁড়াও রাজা। ঝালটা হয়ে গেলে তোমাকে জল পাম্প করে দেব।

শেফালী জল পাম্প করে কেমন ছেলেমানুষের মত বলল, রাজা তুমি সাবান মাখ না কেন?

—সাবান কোথায় পাব?

—আমি তোমাকে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছি। আমাকে তোমার দাদা পামঅলিভ কিনে দেয়।

—আমার গায়ে মেখে দিলে তোমার শরীরের মত গন্ধটা হবে?

—হ্যাঁ। ঠিক আমার শরীরে তুমি স্নান করে এলে যেমন গন্ধ পাও ঠিক তেমনি।

—তবে দাও। খুব সুন্দর গন্ধ শরীরে থাকলে আমার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে ভাল লাগে।

শেফালী ছুটে ছুটে কাজ করছিল। ওর যেন এটা একটা খেলা হয়ে গেছে। সুবলকে নিয়ে খেলা। সুবল কলের নীচে বসে আছে। সুবলের পিঠে শেফালী সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে। বড় নরম শরীর সুবলের। ওর ঘন চুল কি কালো। কপাল প্রায় যেন ঢাকা। লম্বা ভুরু। চোখ ভাসা, এবং পদ্মফুলের মত জলের ওপর যেন গাছের ছায়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

কি যে ভাল লাগছিল শেফালীর—এমন ভাবে সাবান মাখিয়ে দিতে! ওর শরীরের ভিতর এক আশ্চর্য অহঙ্কার আছে, শেফালী কেমন পাগলের মত ওর শরীর নিয়ে, ঠিক একটা ছোট্ট পাখির মত ওর অহঙ্কার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সুবল বলছে, বৌদি ঠিক আছে, এবার বাকিটা আমি ঠিক পারব।

—না, তুমি পারবে না রাজা। তুমি কিছু জান না।

—জানি, ঠিক জানি। দাও, ন্তাখো কি করে মাখতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি এমন করছ, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

কিন্তু শেফালী আজও আশা করেছিল, অজিত ফিরে আসবে, কিন্তু যা খবর পাঠিয়েছে ওর মানুষ দিয়ে, অজিত কবে আসবে ঠিক নেই, কবে আসতে পারবে সে বলতে পারবে না। কিছু টাকা পাঠিয়েছে। ভীষণ হাতাশা ছিল মুখে। এই সুবল এখন সব আকাঙ্ক্ষার রাজ্যে নতুন বাতির মত।—তোমার শরীরে রাজা কি ময়লা, বলেই সে বগল তুলে ঘষে দিতে গেলে দেখল, কালো মসৃণ ছোট সুন্দর সব চুলের গুচ্ছ—ঠিক কলমি ফুলের মত রং। ঠিক কালো নয়, কিছুটা তামাটে রং। সুবলের কেমন কাতুকুতু লাগছিল। সে হো হো করে হাসতে থাকল।

শেফালী বলল, তুমি এমন বড় হয়ে গেছ আগে বলনি কেন রাজা?

সুবল কোন জবাব দিতে পারল না। একেবারে চুপ মেরে গেল। সত্যি ওর ভীষণ খারাপ লাগছিল। এবং ভয়ে ক্রমে গুটিয়ে যাচ্ছিল।

এ-ভাবে হৃদয়ের কাছাকাছি থাকার যে বাসনা মানুষের, মানুষ যার টানে বড় রকমের কঠিন কিছু করতে পারে না, এবং এভাবে সুবলের ব্যথিত মুখ দেখে শেফালী কেমন থমকে গেল। বলল, সুবল আমি ঠিক করিনি। তুমি এমন দুঃখ পাবে জানতাম না।

সুবলেব ভিতর এক পাপবোধ এ-ভাবে জন্ম নিলে—এই শহরের গ্লানিকর সব ছবি তাকে তাড়া করে বেড়াতে থাকে। ওর মনে হল, সকাল হলেই সে ফুলের সন্ধানে চলে যাবে।

সঙ্গে থাকবে পাখিটা। যা সামান্য সম্বল আছে এই দিয়ে সে এই শহরের বড় রকমের পাপখণ্ডনের নিমিত্ত আবার রাস্তায় নেমে গেল। সেই যে এক দেশ, যে দেশে সে জন্মেছে, কি যে পাপ ছিল, টুকুন দিদিমণির এমন অসুখ!

সে নানাভাবে ফুলের সন্ধান করে বেড়াল। বই-পাড়ার কাছে খুব বড় ফুলের দোকান আছে। সেখানে সন্ধান নিয়ে সে জেনেছে, কিছুদূর ট্রেনে গেলে, একজন মানুষ আছে। মাঠে তার কেবল ফুলের চাষ। সে

রজনীগন্ধার চাষ করতেই বেশী পছন্দ করে। ওর কেন জানি মনে হল, এই পৃথিবীতে একমাত্র সেই লোকটির সঙ্গেই তার এখন বন্ধুত্ব হতে পারে।

সুবল লোকটার সন্ধানে চলে গেল।

একটা নীল রংয়ের ট্রেনে চড়ে একটা সাদারংয়ের স্টেশনে সে নেমে পড়ল। যে লোকটা নীলবাতি নিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে তার কাছেই খবর পেল—লোকটি একটা ভাঙা কুটিরে থাকে। ওব সম্বল একটা লণ্ঠন। সে তার দুই বিঘা জমিতে নানা রকমেব ফুলের চাষ করে থাকে। বেলফুলের জন্য আছে কাঠা চারেক ভুঁই। বজনীগন্ধার জন্য আছে কাঠা দশেক। গাঁদাফুল এবং অন্য মরশুমী ফুলের চাষের জন্য সে রেখেছে বাকি জমিটা।

তার বাড়ি যেতে হলে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। সে গেলেই একটা ফুলের গুচ্ছ এনে তুলে দেবে। সেখান থেকে তোমার খুশীমত ফুল পছন্দ করে কিনে আনবে। গুচ্ছের ভিতর সে সব সময় তাজা এবং ভাল ফুলগুলো রাখে। ওর মুখে লম্বা সাদা দাড়ি। ভীষণ কালো রং মানুষটা। সে একটা লুঙ্গি পরে। মাথায় তার একটা ফেজ টুপি। মানুষটা ধার্মিক। পাঁচ বেলা নামাজ। আর ফুল ফোটানো তার কাজ। পৃথিবীতে অন্য কাজ আছে বলে সে জানে না।

মানুষটার আবার ভীষণ বাতিক। সে যে জমি থেকে মৃত্যুর জন্য ফুলের তোড়া তৈরী করে, সেই জমি থেকে কখনও ফুলশয্যার মালা গাঁথে না। সুবল লোকটির পরিচয় পেয়ে খুব খুশী। সুবল বলল, আমার খুব ইচ্ছা ফুলের চাষ করি তোমার মত।

—ফুলের চাষ কোর না। দুঃখ পাবে।

সুবল বলল, দুঃখ মানুষের জন্য। মানুষটার কাছে এসে সুবল তার মত ধার্মিক কথাবার্তা বলতে পেরে আনন্দ পাচ্ছে।

—তা হলে এই বয়সে সুখ-দুঃখ নিয়ে তোমার ভাবনা আছে?

—ভাবনা কি নিয়ে ঠিক জানি না বুড়োকর্তা। তবে এটুকু মনে হয়েছে, তুমি খুব আনন্দে আছ। তুমি শহরে যাও না?

—শহরে কোন দিন যাইনি। আগে ফুলের চাষ করতাম নেশার জন্য। এখন এটা পেশা হয়ে গিয়ে ভালই হয়েছে। শুনেছি আমার ফুলের খুব সুনাম বাজারে। মানুষেরা মরে গেলে শুনেছি আমার ফুল তাদের চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারটা ভাবতে খুব আনন্দ পাই।

—সুন্দর সুন্দর বৌরা শুনেছি বিকেলে ছাদে ঘুরে বেড়ায়। তাদের খোঁপায় আমার এইসব বেলফুলের মালা জড়ানো থাকে। বুড়ো মানুষটি সুবলকে এমনও বলল।

সুবল বলল, তুমি আনন্দেই আছ। ফুল বিক্রি করাও খুব আনন্দের। আমার তো তেমন পয়সা নেই।

বুড়ো লোকটি বলল, আমার কাছে একদিনের ধারে পেতে পার। তার বেশী নয়।

—কিন্তু আমার ঠিকানা নেই।

—ঠিকানা! মানুষটা ঠিকানার কথা বলতেই কেমন চোখ বড় বড় করে ফেলল।—মানুষের কোন আবার ঠিকানা থাকে নাকি?

—থাকে না! এই যে তোমার ঠিকানা, ফুলের মাঠ, একটা সবুজ কুটির এবং নদীর ধারে বড়রাস্তা।

লোকটি বলল, অঃ। এই ঠিকানার কোন দাম নেই। আমি তোমার ঠিকানা চাই না। তুমি তো একদিনের জন্য ধার নেবে। বাকিটা তো আমার ওপর।

যাই হোক, সুবল লোকটির কাছে অনেক বেলফুল চাইল।

লোকটি বলল, এস।

সুবল লোকটির সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

বেলফুলের জমিতে এসে বলল, তুমি এই এই গাছ, বুড়ো এক দুই

করে গাছের নম্বর বলে গেল, এগুলো তোমার। তুমি এ-সব গাছ থেকে ফুল নেবে। বলেই সে সুবলের মুখে কি দেখল। বলল, দাম অর্ধেক হয়ে যাবে। গাছের সেবা-যত্নের ভার নিলে, দাম ফুলের কমে যায়।

সুবল অর্ধেক দামেই ফুলের বন্দোবস্ত নিল।

সুবল খুব সকালে আসত। গাছে জল দিত। গাছগুলোর গোঁড়া খুঁচিয়ে নিত নিড়িকাচি দিয়ে। নদীতে সে স্নান করত। জোয়ারে জল থাকত খুব নদীতে। সে জল বয়ে আনত নদী থেকে। মাটিগুলো টেনে গেলে, অথবা গোড়া শক্ত হয়ে গেলে, সুবলকে খুব চিন্তিত দেখাত। অথবা পোকা লাগলে যে কি করবে ভেবে পেত না। বুড়ো মানুষটা তখন নানারকমের শুকনো পাতা সংগ্রহ করত বন থেকে। শুকনো কলাপাতা অথবা কচুরিপানা। সব সে আগুন জ্বেলে এক রকমের ছাই সংগ্রহ করত। ছাই ছড়িয়ে দিত গাছে গাছে পাতায় পাতায়।

আর সকাল হলেই সুবল দেখতে পেত ঝোড়ো হাওয়ায় পাতা থেকে সব ছাই উড়ে গেছে। পোকা-মাকড় সব মরে গাছের নীচে পড়ে গেছে। পাতগুলো গাছের কেমন সবুজ হয়ে গেছে। আর কি আশ্চর্য সাদা রংয়ের ফুল—চার পাশ গন্ধে ভীষণ আকুল করছে। এমন একটা ফুলের মাঠে দাঁড়ালে কোথাও দুঃখ আছে বোঝা যায় না।

এই কুটিরের পাশেই সুবল আর একটা কুটির বানিয়ে নিয়েছে। সে নদী থেকে মাটি কেটে এনেছে। বুড়ো মানুষটা তাকে সাহায্য করেছে নানাভাবে। এতদিন একা থেকে বুড়ো মানুষটার একরকমের স্বভাব হয়ে গিয়েছিল—মানুষ কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। আর যে সব ফুলের দালালরা আসত, ভারি খারাপ লোক। নানাভাবে তাকে ঠকাত। একমাত্র সুবল এক মানুষ, কেমন সরল, এবং ঠকানো কাকে

বলে জানে না। সে আসার পর তার চাষ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। এবং সময় মত আজকাল বর্ষা আসে। ভাল ভাল ফুল হয়। গোলাপগুলো কি যে বড় হয়ে ফুটছে। গোলাপ চাষের ভার এখন সুবলের উপর। ছেলেটা ভারি পরা। যেন সুবল বললে, সব তার নামেই লিখে দেবে।

এই লোকটিকে দেখে সুবলের কখনও কখনও জনার্দন চক্রবর্তীর কথা মনে হয়। খুব দাম্ভিক, কিছুতেই হার মানবে না প্রকৃতির কাছে। এই মানুষেরও একটা তেমন অহঙ্কার আছে। তার মত ফুলের চাষ এ-তল্লাটে কেউ জানে না। সে ফুলের চাষ করে যা উদ্বৃত্ত হয়েছে, একটা মসজিদ বানিয়েছে। সে সেখানে মাঝে মাঝে গরীব মানুষের জন্য শিরনি দেয়। তার স্বভাব উল্টো। একটা ইঁদারা করে দিয়েছে। সে-এসবের ভিতরেই ধর্মকে খুঁজে বেড়ায়। এবং সুবল এখানে আসার পর সে একটু যেন হাতে সময় পেয়েছে। মাঝে মাঝে চারপাশে যখন তার অজস্র গোলাপ, তখন সে একটা বড় লম্বা মানুষ হয়ে যায়। ওকে একটা ফুলের বনে ফেরাস্তার মত মনে হয়।

একদিন সকালে উঠে বুড়ো মানুষটা দেখল, সুবল ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ বসে আছে। পাখিটা খুব ওকে জ্বালাচ্ছে। সে মাত্র নামাজ পড়ে এদিকটায় এসেছে সুবলকে বলতে, যেন সুবল গোলাপের দালালি করার লোকটা এলে ভাগিয়ে দেয়। এবার থেকে সব ফুল সে সুবলকে দিয়ে দেবে। গরুর গাড়িতে সুন্দর করে স্তবকে স্তবকে কলাপাতায় মোড়া ফুলের গুচ্ছ। শেষ-রাত থেকে উঠে তুলে ফেলতে হয়। সকাল সকাল স্টেশনে ওগুলো চালান দিতে হয়। রোজ ফুল যায় না। একদিন অন্তর একদিন। কিন্তু সে এসে সুবলকে এমনভাবে বসে থাকতে দেখবে ভাবতে পারেনি।

বুড়ো লোকটা কাছে গিয়ে বলল, তোর আজকাল ফিরতে এত রাত হয় কেন রে?

সুবল তাকাল। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

বুড়ো মানুষটা এমন একটা মুখ মাঝে মাঝেই সুবলের দেখেছে। চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছে, ফুলের কুঁড়ি বেছে নিচ্ছে সুবল, সাতটা কথা বললে একটা কথার জবাব দিচ্ছে। বুড়ো লোকটা এবার কেমন ক্ষেপে গেল, বলল, সুবল ফুলের মাঠে কেউ দুঃখ নিয়ে বাঁচলে আমার ভাল লাগে না।

—দুঃখটা তুমি কর্তা কোথায় দেখলে ?

—সকালে এমন মুখে বসে আছিস কেন ?

—তুমি জান না কর্তা, আমি কতদিন থেকে তাকে খুঁজছি।

বুড়ো লোকটা বুঝতে না পেরে বলল, সে সবাই খোঁজে, কেউ পায় না। আমিও তো তাকে খুঁজছি। পাচ্ছি কোথায় ?

সুবল বলল, তুমি বুড়োকর্তা এমন কোন মেয়ে দেখেছ, কেবল যার অসুখ ? অসুখ ছাড়ে না। দাঁড়াতে পারে না, হাঁটতে পারে না। কেবল শুয়ে থাকে। মুখটা তার বেলফুলের মত সাদা।

বুড়োকর্তা হা হা করে হেসে উঠল। বলল, মেয়েই দেখিনি জীবনে। তার আবার অসুখ, তার আবার ভাল থাকা! আর তাই নিয়ে তুই মুখ গোমড়া করে রেখেছিস!

সুবল বুড়োকর্তার দুঃখটা কোথায় ধরতে পারে। এমন একজন কুৎসিত মানুষকে, কেউ হয়ত ভালবাসেনি। যখন ঘরে বিবি আনার বয়স ছিল, তার পয়সা ছিল না, তার মুখের চেহারাতে আছে, নৃশংস এক ছবি। নিষ্ঠুর মুখচোখ দেখলে কেউ কাছে আসতে সাহস পায় না।

কেবল সুবল জানে—কি কোমল আর ধর্মপ্রাণ মানুষটি। সে বলল, আমি ভেবেছিলাম, তাকে খুঁজে ঠিক বের করব। তার খুব অসুখ। আমাকে দেখলে ও খুব খুশী হয়।

অথবা তার যেমন ধারণা। সে গেলেই টুকুন দিদিমণি ভাল হয়ে যাবে। এমন এক সরল বিশ্বাস টুকুনের চোখ-মুখ দেখে তার গড়ে

উঠেছে বুঝি। সে তো কখনও টেরই পায় না টুকুন দিদিমণি অসুস্থ। সে গেলে জানালা পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারে। কত কথা। টুকুনকে নিয়ে সে কত কথা। টুকুনকে নিয়ে সে সারা বিকেল শুধু গল্প আর গল্প। এবং এ-ভাবেই মানুষের মনে অজান্তে এক অহঙ্কার গড়ে ওঠে। সে জনার্দন চক্রবর্তীর মত রুক্ষ মাঠে বান ডাকাবার চেষ্টা করছে।

বুড়োকর্তা বলল, তুমি পাবে। তাঁকে ঠিক খুঁজে পাবে। ভালমানুষেরা তাঁকে একদিন খুঁজে পায়।

সুবল বঝতে পারল বুড়োকর্তা ঈশ্বরের কথা বলছেন। সে আর বুড়োকর্তাকে ঘাঁটাল না! ঈশ্বর-বিশ্বাসেরই মতই ওর ধারণা, সে একদিন না একদিন টুকুন দিদিমণিকে ঠিক জানালায় আবিস্কার করে ফেলবে।

১৩

টুকুনকে নিয়ে সুরেশবাবু আবার একটা কষ্টের ভিতর পড়ে গেছেন। শুধু এখন শুয়ে থাকে আবার। মাঝে একটু ভাল হলে সুরেশবাবু টুকুনকে নিয়ে একটা স্পেস অডিসি দেখে এসেছেন। টুকুন স্পেস অডিসি দেখার পর কেমন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে ফেলেছে হাজার লক্ষ কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভিতর দিয়ে যখন মহাযানটি ছুটছিল, তখন নিশ্চয়ই তার পাশে ছিল সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গ্রহাণু। অথবা সেই যে এক বাতিয়ালা ছিল এক ছোট গ্রহাণুতে তার কথাও মনে পড়ছে। তার গ্রহাণুর পাশ দিয়ে যাবার সময় মহাযানটি নিশ্চয়ই উঁকি মেরে দেখেছে, বাতিয়ালা সন্ধ্যা হলেই গ্যাসের একটা বাতি জ্বেলে দিচ্ছে।

সুরেশবাবুও মনে মনে সেই পাখিয়ালাকে খুঁজছেন। তাঁর দৈবে এখনও বিশ্বাস আছে। ডাক্তারবাবু পর্যন্ত মত দিয়েছিলেন। কেবল টুকুনের মা-র জন্য সিস্টারকে ঠিকানা দেওয়া গেল না। তিনি তিন-চার দিন আগে সিস্টারকে ফোন করেছিলেন পাখিয়ালা এসেছিল কিনা আর? সিস্টার বলে দিয়েছিল—না।

টুকুন এখন আর কিছু বলে না। সে ছোট্ট রাজপুত্রের বইটাই বার বার আজকাল পড়ছে। স্পেস অডিসি দেখার পর এই গ্রহ-নক্ষত্র-সৌরজগত অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা ধারণা মনের ভিতর গড়ে উঠল—বেঁচে থাকা এই গ্রহে বড় অকিঞ্চিৎকর ঘটনা—অথবা টুকুনের মনে হয় সে কত অপ্রয়োজনীয় এই সৌরমণ্ডলের ভিতর। অন্তত ছোট রাজপুত্রের মত বাঁচারও একটা মানে ছিল। তার ছিল তিনটে আগ্নেয়গিরি, ছ'টা পাহাড়, দুটো নদী, একটা হ্রদ, একটা সমুদ্র। সে

আসার আগে সমুদ্রের ওপরটা বাওবাবের পাতায় ঢেকে দিয়েছিল, সে গ্রহাণু থেকে বিদায় নেবার সময় আগ্নেয়গিরির মুখগুলো হাঁড়ি দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল। নদীর জল কলাপাতায় ঢাকা। এবং ক'টা বাওবাবের চারা ছিল, সব উপড়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরিজ পাখিদের ডানায় ভর করে গ্রহাণু থেকে নেমে আসার সময় তার মনে হয়েছিল বাওবাবের চারা একটা বেঁচে থাকলে, ওর মূল শেকড় এত পাজি যে তার ছোট গ্রহটিকে ঝাঁঝরা করে দেবে।

টুকুন জানালা দিয়ে নানারকম ফুল ফুটতে দেখলেই রাজপুত্রের কথা মনে করতে পারে, সুবলের কথা মনে হয়। সে বিমর্ষ হয়ে যায়। খেতে তার ভাল লাগে না, ইন্দ্রকে সে আজকাল একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। মা এসে ইন্দ্রের সম্পর্কে সব গল্প করে যাচ্ছে। ইন্দ্র কলেজের পড়া শেষ হইলেই সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে চলে যাবে। এ-সব ঘটনা টুকুনের কাছে খুবই অকিঞ্চিৎকর। ওর এ-সব কথা শুনলে ভারি হাসি পায়। সে বলতে পারে, আমার কাছে এমন সব ইতিহাস লেখা আছে, যা তুমি আদৌ জান না। কত যে অকিঞ্চিৎকর—এই বিদেশ যাওয়া। মা, তুমি ইন্দ্রকে আমার ঘরে আর পাঠাবে না। ওর মুখ পুতুলের মত। সব সময় মুখটা এক রকমের থাকে। সে একটা কথা শুধু জানে,—টুকুন আজ তোমার কেমন লাগছে? শরীর তোমার কেমন?

অন্য কথা জানে না বলে টুকুনের মনে হয় ইন্দ্র এই দুটো কথাই শুধু সারাজীবন ধরে মুখস্থ করেছে। অন্য কথা সে জানে না। তার আত্মীয়-স্বজনের ছেলেমেয়েরা কেউ বড় আসে না তার ঘরে। ওর অসুখটা যদি অন্য কারো শরীরে সংক্রামিত হয়—এই অসুখ—কি যে অসুখ—কেউ টের পায় না, একটা মেয়ে সবকিছুর ভিতর কেমন সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বেঁচে আছে।

সকাল থেকেই আজ এই অঞ্চলে গণ্ডগোল চলেছে। গীতামাসি

টুকুনকে এমন বলেছিল। পাঁচিল পার হলে ফুটপাথ। লাইটপোস্টটার নীচে ত্নটো মানুষের মাথা কারা কেটে রেখে গেছে। সকাল থেকে হৈ-চৈ। পুলিস। কোথায় পাশে গুলি চলছে। তিনজন ধরাশায়ী। বিকেলে একটা বড় মিছিল যাচ্ছিল, সেখানে বোমা।

বোমা মিছিল আর নানারকমের অসুখ নিয়ে বেঁচে আছে এতবড় শহরটা। যেমন একটা অসুখ এই শহরের, সব বড বড বাড়ি, প্রাসাদের মত বাড়িগুলো রাতে ফাঁকা থাকে, নীচে ফুটপাথে লোক শুয়ে থাকে—শীতে অথবা ঝড়বৃষ্টিতে কষ্ট পায়। টুকুন বুঝতে পারে না এমন কেন হয়। যখন বাড়িগুলো ফাঁকা, লোকজন কম, ছোট সব মানুষদের সেখানে আশ্রয় দিলে কি যে ভাল হয়। কিংবা কেউ খায়, কেউ খেয়ে হজম করতে পারে না, কেউ না-খেয়ে পেটের জ্বালায় ফুটপাথে পড়ে থাকে। অথবা কি যে সব ধনাঢ্য পরিবার, তার বাবা তাকে নিয়েও মনে হয় বেশ একটা খেলায় মেতে গেছে, কত বেশী সুখ সে টুকুনের জন্য এনে দিতে পারে এমন খেলা। টুকুনের ঘরটা হল-ঘরের মত। নানাবর্ণের দেয়াল। ভিতরে চন্দনের মত গন্ধ। এবং সব সময় কি যেন গীতামাসি স্প্রে করে দিয়ে যায়। বড় বাথরুম। শ্বেতপাথরের দেয়াল। বিখ্যাত সব চিত্রকরদের ছবি। একটা ছবি বনের ভিতর একটা বাঘ। পিছনে শিকারী হাতির পিঠে। বাঘের সঙ্গে ত্নটো বাচ্চা।

আবার ওর খাটটা মেহগিনি কাঠের। নানারকমের কারুকাজ করা। খাটে সে একা শুয়ে থাকে। এত বড় খাট যে, সে একা শুয়ে কতবার এ-পাশ ও-পাশ করে কতবার যে অন্য প্রান্তে যেতে চায়—কিন্তু পারে না। সে চুপচাপ কাত হয়ে শুয়ে থাকে। তার পায়ে গীতামাসি আলতা পড়িয়ে দেয়। চুল বিনুনি করে বেঁধে দেয়। সে সিল্কের লাল-হলুদ ছোপের ফুল-ফল আঁকা কেমন লুঙ্গির মত একটা পোশাক পরে। ফুল-হাতা সাদা রংয়ের জামা। চোখ কেমন নীল

নীল—এবং বুকে সে কোন ধুকপুক শব্দ শুনতে পাচ্ছে না ভালবাসার জন্য। কেবল সেই নির্বান্ধব ছেলেটির জন্য ওর মায়া। সে এলে হয়তো উঠে বসতে পারত।

এবং এখানে চারপাশে নানা রকমের গণ্ডগোল। গণ্ডগোলের শহরে গণ্ডগোল বাদে কি আর থাকবে। এই সন্ধ্যায় যখন একটা গ্রহাণুতে এক বাতিয়ালা গ্যাসের আলো জ্বেলে দিচ্ছে, তখন কিনা এই গ্রহের সব সৌন্দর্য হরণ করে নেবার জন্য মানুষ মানুষকে অকারণ মেরে ফেলছে। টুকুন জানালায় দাঁড়িয়ে তার দোতলার ঘর থেকে দেখতে পেল, চারপাশের সব রাস্তার দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মানুষ পাঁচিল টপকে ছুটে আসছে।

দারোয়ানদের ঘরগুলোর পাশে যেখানে লম্বা গ্যারেজ, তার পাশে একটা লোক টপকে এসে কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে। সে যেন রাস্তা থেকে প্রাণ বাঁচাতে এসে অন্য একটা ট্র্যাপে পড়ে গেল। পুলিসের লোকগুলো ছুটছে। যাকে পারছে তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পাঁচিল টপকে একটা লোক এ-বাড়িতে ঢুকে গেছে, পুলিসের নজর এড়ায় নি। পুলিসও বেশ গোঁফে তা মেরে লাফ মেরে পাঁচিলের এ-পাশে এসেই দেখছে ফাঁকা।

টুকুন চুপচাপ শুয়ে দেখছে আর মজা পাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে—সেই পালানো লোকটা একটা বনকরবীর ডালে বসে আছে। নানা-রকমের লতাপাতায় গাছটা ঢাকা। এবং টুকুন একেবারে অবাক, রক্তের ভিতর তার হাজার ঘোড়া সবেগে ছুটছে, ওর মুখ-চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে, এবং সে কেমন অধির হয়ে যাচ্ছে—সে তার ভিতর আশ্চর্য এক তাজা ভাব, অথবা মানুষের যা হয়ে থাকে, সময়ে সংসারের সব নিয়ম-কানুন সহসা পাল্টে যায়, বোঝানো যায় না এমন কেন হয়, টুকুন কেমন হয়ে যাচ্ছে, টুকুন উঠে বসল খাটে। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে কেউ নেই। সে পিছনের দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে

দিল। ঘোরানো সিঁড়ি বাগানে নেমে গেছে। মালিরা কেউ নেই। এবং সে এ-সময় পাগলের মত ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে যাচ্ছে। সে কিছু দেখে ফেলেছে, সে যে নিজের ভিতর এখন নিজে নেই, অথবা তার এটাই নিজের, এতদিন সে একটা মেকি ভয়ে খাটে শুয়ে রয়েছে, এ-মুহূর্তে কোনটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না। টুকুন পাগলের মত ম্যাগনেলিয়া ফুলের গাছটা পার হয়ে গেল।

এখন যদি সুরেশবাবু দেখতে পেতেন—অথবা গীতামাসি কিংবা মা, কেউ এ-ঘটনা বিশ্বাসই করতে পারত না। ওদের চোখে এটা কোন ভৌতিক ব্যাপার হয়ে যেত।

টুকুন এবার গোলাপের বন পার হয়ে গেল। সে দেখতে পাচ্ছে পুলিসটা চারদিকে তাকাচ্ছে।

টুকুন এবার বনকরবী গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। পুলিসটা তার দিকে আসছে।

এখন সন্ধ্যা। বাগানে নানারকমের ফ্লুরোসেন্ট বাতি। টুকুন পুলিস আসার আগে ডাকল, সুবল!

সুবল এতক্ষণে লতাপাতার ফাঁকে দেখছে—দিদিমণি। সে প্রায় পাগলের মত নেমে আসছে এবং লাফ দিয়ে ঝুপ করে টুকুনের পায়ের কাছে পড়ল।

—দিদিমণি তুমি!

—তাড়াতাড়ি এস। বলে টুকুন আবার সুবলকে নিয়ে বাগানের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবলের হাতে প্লাষ্টিকের ব্যাগ। ব্যাগে কিছু রজনীগন্ধা। তার গন্ধ এখন সুবলের গায়ে। সে এখানে যে ভয়ে ছুটে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। এ-ভাবে একদিন টুকুন দিদিমণিকে আবিষ্কার করতে পারবে ভাবতে পারেনি। অনেকটা গল্প-গাথার মত। এমন সব মেলানো গল্প শেফালীবৌদি তাকে বলত। সে এতটা কখনও আশা করেনি।

আশা করেনি বলেই সে কেমন আরও গ্রাম্য সরল বালক হয়ে গেল। নিজের এই আনন্দ সে কিছুতেই হৈ চৈ করে প্রকাশ করতে পারছে না।

টুকুন ওকে যে-ভাবে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে—সে সে ভাবে সেদিকে যাচ্ছে।

টুকুনকে দেখে সুবল বিশ্বাসই করতে পারছে না, এই টুকুন দিদিমণি। খুব বেশী একটা হেঁটে এলে জানালা পর্যন্ত আসতে পারত। সে এতটুকুই দেখেছে। এমন ভাবে একেবারে স্বাভাবিক ভাবে সে কোনদিন টুকুনকে হাঁটতে দেখেনি। কি সহজ সরল ভাবে ওর হাত ধরে নানারকমের গাছের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। টুকুনের পরনে কি সুন্দর পোশাক। কেমন সকালের গোলাপের মত তাজা রং পোশাকের রংয়ে। এবং গোলাপের পাপড়ির মত নরম পোশাক। প্রায় ফ্লুরোসেন্ট বাতির আলো যেন পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

পুলিসটা এখন পাঁচিলের এদিকটায় একটা মানুষকে খুঁজছে। পুলিসটার মনে হয়েছে, যারা বোমা ছুঁড়েছিল রাস্তায় তাদের একজন কেউ হবে, কারণ লোকটার হাতে একটা প্লাষ্টিকের ব্যাগ। প্লাষ্টিকের ব্যাগ থেকে বোমা ছুঁড়ে মারা সহজ। প্লাষ্টিকের ব্যাগ আছে বলেই পুলিসটা এখনও ওৎ পেতে আছে। সুবল বাগানের ঝোপজঙ্গল থেকে বের হয়ে এলেই ধরবে। প্লাষ্টিকের ব্যাগে যে রজনীগন্ধার গুচ্ছ থাকতে পারে—কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। পুলিসেরা ফুলের কথা বিশ্বাস করে না।

টুকুন বলল, সুবল তুমি এতদিন আসনি কেন?

সুবল বলল, টুকুন দিদিমণি, এটা রাজবাড়ি?

—যা, রাজবাড়ি হতে যাবে কেন? আমাদের বাড়ি।

—তোমাদের বাড়ি? এতবড় ফুলের বাগান! এত ফুল! টুকুন দিদিমণি, আমি রোজ ফুল তুলে নিয়ে যাব এখান থেকে। তার এসব

দেখে এত আনন্দ হচ্ছে যে সে কি কথা বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না। তবু কিছু বলতে হয় বলে যেন বলা, টুকুন দিদিমণি আমি তোমাকে রোজ ফুল বিক্রি করতে করতে খুঁজেছি। শেষদিকে কেমন ভেবেছিলাম তোমাকে আর খুঁজে পাবো না। তুমি বাদে আমার তো এ শহরে আর কেউ নেই।

টুকুন বলল, সুবল তাড়াতাড়ি এস।

সুবল বলল, এটা কি ফুল গাছ?

—তোমাকে পরে চেনাব। ঐ দ্যাখো পুলিসটা বাগানের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে।

সুবল দেখল সত্যি। ওকে দেখে ফেলেছে।

টুকুন বুঝতে পারল পুলিসটার চোখে ওরা ধুলো দিতে পারবে না। কিংবা সুবলকে নিয়ে জানাজানি হলে মা আবার সুবলের এখানে আসা বন্ধ করে দেবেন। এটা বাড়ির দক্ষিণ দিক। মা-বাবা থাকেন পুবের মহলাতে। এই মহলে সে থাকে, আর ভিতরের দিকে থাকে গীতামাসি। ও-পাশ দিয়ে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে। কেউ ওর ঘরে উঠে আসতে হলেই সে টের পায় কেউ আসছে। কারণ কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হয়। সেই শব্দ এক দুই করে গুণে গুণে কি যে একটা স্বভাব হয়ে গেছে টুকুনের, কোন শব্দে কে আসে টের পায়। মা উঠে আসছেন, না বাবা, না গীতামাসি, না ডাক্তারবাবু না ইন্দ্র—সে সব টের পায়। পায়ের শব্দ কেউ এক রকমের করে না।

সে এবার দাঁড়াল এবং এটা বোধহয় একটা রক্তকরবীর গাছ। সে বাতির আলোতে ঠিক ধরতে পারছে না। গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সে পুলিসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। এবং পুলিস হামাগুড়ি দিয়ে কিছু বনঝোপের মত জায়গা পার হয়ে সামনে দাঁড়াতেই চোখ মেলে তাকাতে পারল না। একটা ফুলপরীর মত মেয়ে। যেন পাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সে চোখের পলক ফেলতে পারছে না। কোন দেবী

মহিমা টহিমা হবে। সুবল ওপাশে একটা বড় পাথরের স্ট্যাচুর নীচে বসে রয়েছে। ওকে একেবারেই দেখা যাচ্ছে না।

পুলিসটার মনে হল সে কোথাও কিছু গোলমাল করে ফেলেছে। সে বোধহয় ছুটেই পালাত। কিন্তু সুন্দর গলায় যখন টুকুন বলছে, তুমি এখানে কি চাইছ? কাকে খুঁজছ?

—আমি কিছু খুঁজছি না মেমসাব।

টুকুন এমন কথাবার্তা আরও শুনেছে। সে অবাক হল না। বলল, কেউ নেই এখানে।

—কেউ আমাব মনে হয় এই বাগানেই লুকিয়ে আছে।

—সে আমাদের সুবল। সে খুব ভাল ছেলে।

পুলিস খুব বোকা বোকা মুখ কবে রেখেছে। টুকুন বলল, সুবলের একটা পাখি আছে। সে এক আশ্চর্য পাখি। এমন পাখি আমি কোনদিন দেখিনি।

পুলিস বলল, তাই বুঝি?

টুকুন বলল, সে এসেছে এক খরাব দেশ থেকে।

পুলিস বলল, তাই বুঝি?

টুকুন বলল, সে এখন শহরে ফুল বিক্রি করে।

এবং এটুকু বলার পর টুকুন সুবলকে ইশারায় ডাকল। সুবল স্ট্যাচুর ওপাশ থেকে খুব একটা অপরাধী মুখ করে উঠে আসছে।

টুকুন বলল, এই আমাদের সুবল।

সুবল বলল, আমার নাম সুবল।

টুকুন বলল ওর একটা পাখি আছে। সুবলের দিকে তাকিয়ে বলল, সুবল তুমি পাখিটা আজ এনেছ?

—না দিদিমণি।

—কাল সুবল পাখিটা নিয়ে আসবে।

—আসব।

—আর এই ত্যাখো, বলে সুবলের প্লাষ্টিকের ব্যাগটা হাতে তুলে নিল।—ত্যাখো শুধু ফুল আছে। ফুল। সুবল এর ভিতরে ফুল নিয়ে আসে।

—ব্যাগের ভিতব আজকাল কেউ ফুল রাখে জানতাম না মেমসাব।

টুকুন বলল, ব্যাগের ভিতর অনেক কিছু রাখতে পারে। শুধু ফুল থাকবে কেন? সন্দেশ থাকতে পারে, বই থাকতে পারে।

—না আজকাল মেমসাব শুধু ব্যাগের ভিতরে বোমা থাকে। আর আমাদেবও শালা এমন বজ্জাতি বুদ্ধি, ব্যাগ দেখলেই পিছনে ধাওয়া করো। কি আছে না আছে। দেখার দরকার নেই।

টুকুন বলল, তবে তুমি যেতে পার।

পুলিস একটা সেলাম ঠুকে বলল, খুব বেঁচে গেছিস সুবল। মেমসাব দেবতা। তোকে বাঁচিয়ে দিল।

টুকুন বলল, এ-সব কেন বলছো?

—মেমসাব আমাকে তো কাউকে ধরে নিয়ে যেতেই হবে। সুবল না হলে সেটা সফল হতে পারে না।

—বিনা দোষে ধরে নিয়ে যাবে?

—আমাদের শুধু ধরার কাজ। বিচারের কাজ সরকারের।

—তার জন্য যাকে তাকে? টুকুনের আর দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না। এখন পুলিসটাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে। কিন্তু কিছুতেই যেন যেতে চাইছে না। সে বলল, বড় আজগুবি ব্যাপার। আমি যাচ্ছি।

পুলিস আর দাঁড়াল না। সে সুবলের দিকে ভীষণ কটমট করে তাকাল। এটা কি করে আজগুবি হয় সে বুঝতে পারে না। না, এরা একটা আজগুবি দেশে বাস করছে, সংসারে কি ঘটছে ঠিক খবর রাখছে না? পুলিস যাবার সময় বলল, মেমসাব যাচ্ছি। আমাব খুব ভুল হয়ে গেছে।

ভুল হয়ে গেছে বলল এজন্য যে সে জানে বড়লোকদের মেয়েরা এমন হয়ে থাকে। কোথাকার একটা ফুলয়ালার জন্য প্রাণে হাহাকার। এখন ওর সারা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। সে কোথায় যে আর একটা লোক পাবে! একজনকে ধরে না নিয়ে গেলে বড়বাবু তাকে আস্ত রাখবে না। সে এখন কি যে করে। রাস্তায় তিনজন গেছে। অ্যাম্বুলেন্স এসে ওদের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। যারা গণ্ডগোল করল তাদের পেছনে তাড়া করতে গিয়ে মরার দায়িত্ব নিতে পারছে না। তা ছাড়া এখন রাস্তায় একটাও লোক নেই। শুধু একটা কুষ্ঠরুগী আছে। তাকে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু অসুখটা বড় খারাপ। একটা খারাপ অসুখের লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া ঠিক না।

এইসব নানারকম ভেবে যখন পাঁচিল টপকে পুলিস রাস্তায় নেমে গেল তখন টুকুন কিছুটা যেন হালকা হল। সে বলল, সুবল এস।

সে সুবলকে নিয়ে এবার নরম ঘাস মাড়িয়ে হাঁটছে। সামনে সেই ঘোরানো সিঁড়ি। টুকুন খুব তর তর করে উঠে যাচ্ছে। সুবল ওর পায়ের দিকে তাকাচ্ছে। কি সুন্দর আর সতেজ মনে হচ্ছে। পায়ে আলতা। সুবলের বার বার কেন জানি মনে হচ্ছে—নীলকমল লাল-কমল ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে। সেই সব রাজপুত্রেরা বুঝি এমন বাড়িতেই থাকত। এমন একটা প্রাসাদের মত বাড়ি এই শহরে আছে, অথবা এখনও থাকতে পারে—সে সব দেখতে দেখতে কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছে। সে বলল টুকুন দিদিমণি আমি যাব কি করে?

—তোমাকে যেতে হবে না সুবল। তুমি এত বড় বাড়িতে থেকে গেলে কেউ টের পাবে না।

সুবল সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে এসেই দেখল সাদা রংয়ের কেমন মসৃণ মেঝে। একেবারে সাদা সবটা। দেয়াল, মেঝে, বারান্দা এমন কি পোশাক নানাবর্ণের যে আছে তাও অধিকাংশ সাদা রংয়ের।

সুবল বলল, আমার এ-ফুলগুলো তোমার পছন্দ হয় টুকুন দিদিমণি?

—খুব। বলে সে বুকের কাছে ফুলগুলো তুলে নেবার সময়ই মনে হল, সে তো বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। এখন এমন কি করে হচ্ছে ? এটা কি করে হচ্ছে, কি করে সে এটা করে ফেলল। ওর চোখ বুজে আসছে। সে বলল, সুবল, সুবল তুমি আমাকে ধর। আমি পড়ে যাব।

সুবল দেখল আশ্চর্য মায়া চোখে মেয়ের। ধীবে ধীরে চোখ বুজে ফেলছে। দাঁড়াতে পারছে না। বুকের ওপর ফুলগুলো ধরা আছে। বুঝি পড়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে বিড় বিড় করে বলছে এবং সুবল শুনতে পাচ্ছে, সেই নিঃশব্দ এক ভাষা থেকে সুবল টের পাচ্ছে—টুকুন তাকে ফেলে আর কোথাও যেতে বারণ করছে। এবং টুকুন দিদিমণি যেন পড়ে যাচ্ছিল। সব মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নিজের অক্ষমতার কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পায়ে আর শক্তি পাচ্ছে না টুকুন। কেমন স্থবির হয়ে যাচ্ছে।

সুবল ধীরে ধীরে টুকুন দিদিমণিকে শুইয়ে দিল। ফুলগুলি পাশে রেখে দিল। সে পায়ের কাছে বসে থাকল। চোখ মেলে না তাকালে সে এখান থেকে চলে যেতে পাবে না।

১৪

তারপর একটা খেলা হয়ে গেল। সংসারে এমন খেলা কে কবে খেলেছে জানা নেই। সুবলকে নিয়ে টুকুন নূতন এক জগৎ সৃষ্টি করে ফেলেছে।

সুবল, টুকুন চোখ মেলে তাকালে বলেছিল, টুকুন তুমি ভাল হয়ে গেছ। টুকুনকে খুব অবুঝ বালিকার মত দেখাচ্ছে। সুবলের টুকুনকে আর দিদিমণি বলতে ইচ্ছা হয় না। কারণ টুকুনকে অসহায় এবং কাতর দেখাচ্ছিল। সে যা করেছে এতক্ষণ, সিঁড়ি ধরে যে নীচে নেমে গেছে, গোলাপগাছগুলোর পাশ দিয়ে যে হেঁটে গেছে, সে কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশ্বাস না করতে পারলে যা হয়, ভিতরের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়।

সে বলল, টুকুন তোমার কোন অসুখ নেই। তুমি ভাল হয়ে গেছ।

—তুমি সুবল সত্যি বলছ?

—সত্যি টুকুন। তুমি উঠে বোস। আমি নেমে গেলে দরজা বন্ধ করে দেবে। সুবল এই বলে উঠে এসে রাস্তায় গণ্ডগোল কমেছে কিনা, না আবার কারফিউ দিয়ে দিল—এসব জানার জন্য উদগ্রীব হলে টুকুন বলল, সুবল তুমি কোথায় থাকছ?

—অশ্বিনীনগর স্টেশনে নেমে যেতে হয়।

—এত দূরে চলে গেলে কেন?

—খুব দূর না তো। শিয়ালদা থেকে বিশ মিনিট লাগে।

—তবে তো খুব কাছে।

—খুব কাছে। শুয়ে শুয়ে তোমার কথা বলতে ভাল লাগে টুকুন?

—না।

—তবে উঠে বসছ না কেন? এই ছ্যাখো বলে সে বলল, তুমি রেডিওটা চালিয়ে দাও না।

—কি হবে?

—কারফিউ দিলে বলে দেবে।

—কারফিউ হলে যাবে কি করে?

—কিন্তু যাওয়া দরকার। আমি না গেলে বুড়ো.মানুষটা ভয়ানক ভাববে।

—বুড়ো মানুষটা তোমাকে বুঝি খুব ভালবাসে?

—ভালবাসে না ছাই! কেবল কাজ। কাজ করা। কাজ করলে লোকটা সবাইকে ভালবাসে। কাল আমাদের বনে যাবার কথা আছে।

—কি করবে গিয়ে?

—সব শুকনো পাতা জড় করব। তারপর যখন সন্ধ্যা হবে, সেই সব শুকনো পাতায় খড়ে আগুন দেব।

—কি মজা!

—খুব মজা। শীতের সময় আগুন দিলে বুড়ো লোকটা বলেছে জীব-জন্তুরা পর্যন্ত সব চলে আসে।

—ওরা আসে কেন?

—আগুন পোহাতে। একটু থেকে সুবল বলল, তুমি রেডিওটা খুলে দাও, আচ্ছা টুকুন, কেউ আবার চলে আসবে না তো? কত বড় ঘর তোমার। কেউ চলে এলে কি হবে?

—চলে এলে কি হবে?

—কেউ এলে কি হবে সুবল?

—আমাকে আসতে দেবে না। তোমার মা আমাকে যদি পুলিসে দেয়!

টুকুনের মুখটা সত্যি শুকিয়ে গেল। সে এটা ভাবেনি। না বলে না কয়ে পাঁচিল টপকে সে চলে এসেছে, পুলিসে দিয়ে দিলে যা হোক ওদের একটা কাজ মিলে যাবে।

সুবল বলল, আমি আর আসব না। আমি এতটা ভাবিনি।

টুকুন বলল, আমার পাশের ঘরটায় গীতামাসি থাকে। বিকেলের খাবার দিয়ে সে নীচে নেমে যায়। উঠে এলে টের পাব সুবল। কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হবে।

—গীতামাসি তোমার দেখা-শোনা করে?

—হ্যাঁ। ওকে, ছাখো, ঠিক হাত করে নিতে পারব।

—কিন্তু তোমার মাকে টুকুন?

টুকুন উঠে বসল। যেন একটা পরামর্শ না করলেই নয়। সে বলল, এদিকে এস। সুবলকে নিয়ে ওর বাথরুমের দিকে চলে গেল। ওর দু-পাশে দুটো জলের কল। বড় বড় দুটো থাম। এবং কিছু জালালি কবুতর একসময কার্নিশে ছাদের অলিন্দে বসবাস করত, তারা এখন কেউ নেই। টুকুনের অসুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নাকি উড়ে গেছে। সুবলকে এসব দেখাল টুকুন, বলল সুবল, মা এলে আমরা টের পাব। তোমার কোন ভয় নেই। মা-র পায়ের শব্দ আমি টের পাই। কোনটা গীতামাসির, কোনটা ডাক্তারবাবুর, সব আমি জানি। ওরা এলে তোমাকে আমি ঠিক লুকিয়ে ফেলব। সে দোতলার অলিন্দে নিয়ে গেল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। সুবলের কাছে এটা প্রায় রাজার দেশ। টুকুন এক রাজকন্যার মত। সে যেন এক রাখাল বালক। তার কাছে আছে মৃত-সঞ্জিবনী সুধা। সুধা রসে মেয়েটা এখন নির্ভাবনায় হাঁটছে। সুবলের আছে এক ভালবাসার জাদুমন্ত্র, অথবা সুবলকে নিয়ে হেঁটে এই যে ঘরে পর ঘর, নানাবর্ণের ছবি, এবং সব বিচিত্রবর্ণের কারুকাজ করা খাট-পালঙ্ক পার হয়ে যাচ্ছে—এ যেন তার কাছে ভারি মজার। যেন হাজার হাজার দৈত্য আসবে

সুবলকে তুলে নিতে। টুকুনের কাছে আছে দৈত্যের প্রাণ। কোথায় ওরা দাঁড়িয়ে পাখিটার পাখা পা এবং গলা ছিঁড়বে তার যেন একটা পরামর্শ চলেছে।

এসব হলেই মেয়ের মনে হয় না তার কোন অসুখ আছে। এসব হলেই মনে হয় পৃথিবীতে বেঁচে অনেক সুখ। এক অপার অভাববোধ এই বালকের জন্য। সংসারে ছেলেটি যত অপাংক্তেয়, তত টুকুনের কাছে সে মহার্ঘ্য। টুকুন আনন্দে, কারণ যখন প্রায় সব ঠিক হয়ে গেল তখন আনন্দে প্রায় ছুটে ছুটে যাচ্ছিল। বলল সুবল তোমাকে এখানে আসার একটা সুন্দর রাস্তা দেখিয়ে দেব। তুমি ফুল বিক্রি করে রোজ এখানে আসবে। আমি কি সুন্দর ছোট্ট রাজপুত্রের গল্প পড়ে রেখেছি। তুমি আসবে বলে বসেছিলাম। তুমি না এলে কাকে আর আমার গল্প শোনাব।

কাঠের সিঁড়ির মুখের দরজাটা টুকুন বন্ধ করে দিল। কি বড় বড় শার্সির নীল রংয়ের দরজা। টুকুন অনায়াসে টেনে টেনে বন্ধ করে দিচ্ছে। সুবল ওকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে সাহায্য করলে সে বলল, আমি পারব সুবল। বলে হাসল।

সুবল যেতে যেতে বলল, এটা কি ?

—এটা পিয়ানো। বলেই টুকুন দুহাতে ঝম ঝম করে বাজাতে থাকল। কতদিন থেকে পিয়ানোটা কেউ বাজায় না। না, ইন্দ্র মাঝে দু'একদিন বাজিয়েছে। যখন টুকুন শুয়ে থাকে মা কখনও বাজান। লম্বা একটা খাতা পিয়ানোর ওপর। সুবল দেখল কেমন গোটা ঘরটা ঝম ঝম করে উঠছে। এবং ক'টা চড়াইপাখি ঝাড়-লণ্ঠনে বসেছিল, পিয়ানো বাজালে পাখিগুলো উড়ে উড়ে বাগানের ভিতর চলে গেল।

সুবল দেখছে—কি সুন্দর বাজাচ্ছে। এমন একটা সুন্দর বাজনা পৃথিবীতে আছে তার যেন জানা ছিল না। চুলগুলো বব্ করা টুকুনের।

বিনুনি বাঁধা নয়। হাতের আঙুলগুলো চাঁপা ফুলের মত। পায়ে আলতা আছে বলে খুব সুন্দর লাগছে। এবং সে পাজামার মত একটা নরম পাপড়ির মত কোমল পোশাক পরে আছে, আর লম্বা, টুকুন প্রায় তার মত লম্বা। সে বয়সানুপাতে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। সে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পেল। কারণ বড় বড় দুটো আয়না, পৃথিবীতে এত বড আয়না দিয়ে কি হয় সে জানে না। গোটা ঘরের প্রতিবিম্ব এখন এই আয়নার ভিতর। সে তন্ময় হয়ে টুকুন দিদিমণির পিয়ানো-বাজনা শুনছে।

আর তখন কাঠের সিঁড়ির মুখে কারা উঠে আসছে যেন। ওরা দুজনে এত বেশী গভীরে ডুবে আছে যে কেউ টের পায়নি, অথবা শুনতে পাচ্ছে না সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির সবাই ছুটে আসছে এদিকে। কারণ অসময়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

আশ্চর্য এক মেলডি ভেসে বেড়াচ্ছে বাড়িময়।

সুবলেরই প্রথম মনে হল দরজায় কারা আঘাত করছে। সে টুকুনকে ঠেলে দিয়ে বলল, টুকুন কারা দরজায় ধাক্কা মারছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত ব্যাপারটা হয়ে গেল। টুকুন বাজানো বন্ধ করে দিল। সুবল লুকিয়ে পড়ল টুকুনের খাটের নীচে। তারপর খুব সহাস্যে দরজা খুলে দিলে দেখল সবাই, টুকুন দরজা খুলে দিচ্ছে। ওরা হাসবে না কাঁদবে স্থির করতে পারছে না। মা বললে টুকুন তুমি পিয়ানো বাজাচ্ছিলে ?

—হ্যাঁ মা।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ মা।

টুকুনের মা টুকুনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। সে বলল, তুমি আর একবার বাজাবে ?

—এক্ষুনি ?

—তোমার বাবা এলে তাকে বাজিয়ে শোনাও না। তিনি খুব আনন্দ পাবেন।

—বাবা আসুক।

—আমি জানি টুকুন ঠিক একদিন ভাল হয়ে যাবে।

গীতামাসি বলল, কোথাকার একটা রাস্তার ছেলেকে ধরে আনতে যাচ্ছিলেন বড়বাবু।

মা বলল, আজকালকার ডাক্তারও হয়েছে তেমন। তারপর কি ভেবে বলল, একবার ইন্দ্রকে ডাকো না ?

—সে তো নেই দিদিমণি !

—কোথায় গেল ?

—সে তো এসময়ে ক্লাবে রোয়িং করতে যায়।

মার এবার মনে হল সত্যি ইন্দ্র রোয়িং করতে যায়। ইন্দ্রকে খুশী রাখার জন্য মা-র যে কি করার ইচ্ছা। কারণ এখানে বসে থাকতে চায় না ইন্দ্র। আজ ইন্দ্র এলে খুব খুশী হবে।

টুকুন এখন চাইছে সবাই চলে যাক। কিন্তু সে যে কেন পিয়ানো বাজাতে গেল! সবাই এখন এটা গল্প-গাথার মত ব্যবহার করবে। সবাই ছুটে আসবে। এখন যে-ভাবে হোক সুবলকে বের করে দিতে হবে। ওর ভিতরে সুবলের জন্য একটা দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে। এবং নানাভাবে সে চিন্তা করছে। কি করলে যে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সবাই এসে টুকুনকে দেখে যাচ্ছে। ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে এখন আবার সাদা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়বে ভাবল। কেবল সুবলের জন্য সে শুয়ে পড়তে পারছে না। খাটের নীচে একবার উঁকি দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ওদিকে কেউ গেলে পা দেখে ফেলবে। এবং এমন একটা ভয়াবহ সমস্যার মোকাবেলা সে জীবনে করেনি। এবং এইসব সমস্যা অথবা তাড়না তাকে এখন বড় বেশী স্বাভাবিক করে রেখেছে।

সে বলল, মা আমার আবার ভাল লাগছে না কেন জানি। আমার ঘুম পাচ্ছে।

গীতামাসি যারা সবাই চাকর এবং অন্যান্য সব পরিজন এসেছিল তাদের চলে যেতে বলল। গীতামাসির কাজ এখন কত বেড়ে গেছে এমন ভাব। সে বলল. দিদিমণি, টুকুন এবার ঠিক বড় হয়ে যাবে।

এ-ছাড়া টুকুনের মার কত সব পরিকল্পনা এবং মনের ভিতর এখনও ভয়টা কাটছে না। টুকুন এ-ভাবে আরও দু'একবার খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছিল। অবশ্য প্রতিবারই পাখিয়ালা সুবল ছিল কাছে। এবার সে নেই। কিন্তু এমন ম্যাজিকের মত ব্যাপারটা ঘটবে আশা করতে পারেনি।

মা বলল, টুকুন আমি তোমার জন্য একজন পিয়ানোর শিক্ষক দেব।

টুকুন বলল, আমি শোব মা। আর বসে থাকতে পারছি না।

গীতামাসি টুকুনকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিচ্ছেন।

মা বলল, এটা কি করছ গীতা?

গীতামাসি বলল, টুকুন আবার আগের টুকুন হয়ে যাচ্ছে।

খাটের নীচে যেই না শুনতে পেল সুবল, টুকুন আবার আগের টুকুন হয়ে যাচ্ছে, সে বোধহয় জোরজার করে উঠেই আসত—কেবল টুকুন চাদরটা একটু ফেলে দিয়ে ওকে একদিকে ভাল করে আড়াল করে দিচ্ছে। অন্যদিকে ওর আগের মত চোখ-মুখ হলে কেউ আর বেশীক্ষণ এখানে থাকতে চাইবে না।

টুকুন শুয়ে পড়লে মা বলল, তুমি যে বলেছিলে, বাবা এলে বাজাবে?

—কাল বাজাব মা। খুব দুর্বল লাগছে।

—তা ঠিক। একদিনে বেশী ভাল না। তুমি বরং একটু শুয়ে থাক। বাবা এলে আমরা আসব।

মা চলে গেলে গীতামাসি বলল, টুকুন এখন তোমার দুধ, একটা আপেল, দুটো সন্দেশ খাবার সময়। বের করে দিচ্ছি।

—কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি মাসি দরজাটা ভেজিয়ে দাও না।

দরজা ভেজানো কথা উঠলেই মাসি উঠে পড়বে। কারণ একা কথা না বলে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়। নিজের ঘরে গিয়ে বেশ পান-দোক্তা খেয়ে উত্তরেব বাবান্দায় চলে গেলে, নীচ থেকে যাবা উঠে আসে তাদেব সঙ্গে গল্পগুজব কবা যায়।

গীতামাসি বলল, কিন্তু এখন, তো তোমাব এ-সব খাবার সময়।

টুকুন বুঝতে পাবল, না-খাইয়ে ছাডবে না। সে বলল, তুমি বেখে যাও, আমি ঠিক খেয়ে নেব।

—অন্যদিন আমাব সামনে তুমি খাও। আজ কেন এমন বলছ ?

—আজ তোমার সামনে খাব না। কিছুতেই খাব না।

টুকুনেব জিদ উঠলে একেবারে কেলেঙ্কাবি কাণ্ড। সেজন্য ভয়ে ভয়ে গীতামাসি বাইরে বেব হযে এলে সে নিজে উঠে গেল। দরজা বন্ধ কবে দিল। ডাকল, সুবল বাইবে এস। ওরা সবাই চলে গেছে।

সুবল বেব হয়ে এলে টুকুন বলল, তুমি আমার সঙ্গে এস।

সুবল বলল, আমার ফুলের থলেটা দেখছি না।

—ওটা আমি ঠিক জায়গায় রেখে দিয়েছি। তুমি যে কি বোকা না! ওটা দেখলে ওরা বলত না, এই থলেটা কার, কি করে এমন একটা বিশ্রী থলে এখানে আসতে পারে। দরকার পড়লে ডিটেকটিভ লাগিয়ে দিত।

সুবল শহরেব অনেক ব্যাপার যেমন ঠিক বোঝে না, তেমনি ডিটেকটিভ কথাটাও বুঝতে পারল না। সে বলল, ডিটেকটিভ কি টুকুন ?

—ওরা চোর গুণ্ডা বদমাস ধরে বেড়ায়। কেউ যদি খুন হয়, কে খুনটা করেছে তাকে খুঁজে বের করে।

—আমার সামান্য থলেটার জন্য এতবড় একটা ব্যাপার তবে ঘটে যেতে পারে।

—সুবল তুমি জান না, এটা যে কি অসামান্য অপরাধ! আমার মা-র চোখ দেখলে সব টের পাই সুবল।

ওরা বাথরুমে ঢুকলেই সুবল বলল, জল দেখলেই চান করতে ইচ্ছা হয় টুকুন। বাঃ কি মজা! পাতাল থেকে ফোয়ারার মত জল উঠে আসে কি মজা প্রথম প্রথম ভাবতাম। খরা অঞ্চল থেকে আসার পর, দিনে কতবার যে রাস্তার কলে চান করতাম।

—তুমি চান করে নেবে?

—তোমার চানের ঘরটায় কি সুন্দর গন্ধ। মারবেল পাথরে কারুকাজ করা সব পাথরের দেয়াল—কি মসৃণ! সুবল দেয়ালের গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে কি যেন দেখছে। ভীষণ মসৃণ। হাত পিছলে পিছলে যাচ্ছে। নানারকম গন্ধ সাবান। তেল। স্যামপু সব। এসব সে ঠিক চেনে না, কি দিয়ে কি হয়, এবং মনে হয় সুবলের শরীরে ঘামের গন্ধ। টুকুন সুবলকে হাত ধোয়ার জন্য বাথরুমে নিয়ে এসেছিল। যা খাবার আছে সে সুবলকে খেতে দেবে। কিন্তু এখানে এসে সুবলের যে কি হয়ে গেল—সে চান না করে খাচ্ছে না। সে খুব পরিশ্রম করে —তার চোখে-মুখে আশ্চর্য দৃঢ়তা। টুকুন এসব দেখে ভাবল, চান করে নিলে তাকে আরও বেশী তাজা দেখাবে।

টুকুন বলল, সুবল তুমি চান করবে?

—মন্দ হয় না, টুকুন।

টুকুন শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে বলল, এটা দিয়ে এভাবে জল পড়বে। বাথরুমের সব বুঝিয়ে দিয়ে। বলল, তুমি চান করে নাও। বাইরে আমি দাঁড়াচ্ছি। সুবল বলল, টুকুন, আমি দরজা বন্ধ করে দেব।

টুকুন দরজা বন্ধ করার কারণ খুঁজে পেল না। সুবল তো তার কাছে ছোট্ট এক বালক বাদে আর কিছু না। সে তো সেই যেন দুই শিশু নদীর পারে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে কোন জামাকাপড় নেই। কেবল ওরা ছুটছে।

টুকুন বলল, আমাকে তোমার লজ্জা কি?

সুবল বুঝতে পারল টুকুন দিদিমণি এখনও স্বাভাবিক নয়। সে বাথরুমের দরজাটা খোলাই রাখল। সে একটা তোয়ালে পরে নিয়ে জামা পাজামা পাশের ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখল।

টুকুন বেশ মনোরম চোখে দেখছে। সুবলেব কি সুন্দব হাত। পুষ্ট বাহু। এবং পিঠের শক্ত কাঁধ খুব মজবুত। সে কলেব নীচে বসে গায়ে মাথায় সাবান মাখছে। বস্তুত সুবলেরও একটা অসুখ হয়ে গিয়েছিল—সে খরা অঞ্চল থেকে চলে এসে এখন কলকাতা নগবীতে এত প্রাচুর্য বিশেষ করে জলের—ভাবা যায় না। সে এখনও ফাঁক পেলে যেখানে সেখানে চান করে নেয়। শরীরে ওব কি যে গরম বেঁধেছে কিছুতেই ঠাণ্ডা হচ্ছে না। সে এখানে এসেও এই লোভ সামলাতে পারেনি।

টুকুন বলল, আমি তোমাকে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছি।

সুবল জানে, টুকুনের কোন ইচ্ছাকে অবহেলা করতে নেই। টুকুন কত বড়, কত বড় বাড়ির মেয়ে, টুকুন যা বলবে তাকে এখন তাই করতে হবে। সে এভাবেই বুঝে ফেলেছে, এর ভিতর এক নতুন প্রাণের সাড়া দেখা দিচ্ছে। এখন কিছুতেই সেখানে ভাঁটার টান আনলে চলবে না। সে বলল, তুমি টুকুন করতে পারবে?

—বা রে পারব না কেন?

—আমার বিশ্বাস হয় না টুকুন—সেই রাজার ঘোড়ায় চড়ে যাবার কথা মনে আছে? হরিণ ধরতে যাচ্ছে রাজা। হরিণ প্রাণের ভয়ে

ছুটছে। রাজা, ঘোড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছুটিয়ে দিচ্ছে। পাথরে পাথরে ঘসা লেগে ঘোড়ার খুরে আগুন লেগে গেছে।

—সত্যি কি সুন্দর হরিণ না। টুকুন সুবলের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কি সুন্দর মজবুত সুবল। টুকুন জল ঢেলে বলল, আমিও চান করব। সে বলল, আমাকে সাবানটা দাও। সে একেবারে শিশুর মত জলের নীচে খেলা করতে থাকল। সুবলও কখন এমন হয়ে গেছে। ওরা দুজনে গল্প করছিল—পাশের ওদিকটায় যে দরজা বন্ধ আছে এবং কেউ আর এদিকটায় আসতে পারবে না ওরা জানে।

এবং এভাবে কি হয়ে যায়। সুবল স্নানের সময় শরীর থেকে সব জল শুষে নিতে গিয়ে দেখল, তোয়ালেটা কি করে কখন শরীর থেকে খসে পড়ে গেছে। সে তোয়ালে ব্যবহারের নিয়মকানুন ঠিক জানে না। আর টুকুন ওকে অপলক দেখছে। স্থির। চোখে বিস্ময়। সে, টুকুনের এমন চেহারা দেখে একেবারে ফ্রিজ হয়ে গেছে। দুজনেই দুদিকে একটা ফ্রিজ শটের মত। সুবলের যেন মুহূর্তের জন্য কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল।

১৮

সুবল চলে যাবার পর গোটা ব্যাপারটা টুকুনের মাথায় কেমন একটা অদ্ভুত নেশা ধরিয়ে দিল। সে ভিতরে ভিতরে ভীষণ একটা অভাবের কথা ধরতে পারছে। সে সংসারে খুব একা—পৃথিবীতে যে মৃত্যু এবং গ্রহাণুতে চলে যাওয়া বাদে অন্য কিছু আছে তার জানা ছিল না। সে এটা যে কি দেখে ফেলল। ওর চোখ বুজে আসছে। সুবল আবার কখন আসবে—শুধু প্রতীক্ষা।

ওর চোখে এখন কিছুটা স্বপ্নের মত ঘটনাটা ঝুলে আছে। এক আশ্চর্য মহিমাময় শরীর সুবলের। এবং শরীরের সর্বত্র এক কঠিন মানুষ, কি শক্ত, অথচ ভারি কোমল, লাবণ্যে ভরা, লম্বা সুবল, যার শিশুর মত সরল মুখ এখন আরও সুন্দর মনে হচ্ছে। সে একটা মানুষের শরীর, এবং শরীরের সবটা একসঙ্গে এভাবে কখনও দেখতে পায়নি।

ওর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। বাবা এঘরে কিছুক্ষণ এসে বসে থেকে গেছেন। নানারকম প্রশ্ন করেছেন। বলেছেন, টুকুন তুমি আমাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাবে না? ডাক্তারবাবু এসেছেন, তিনিও শুনতে চান।

টুকুন কেবল বলছিল, বাবা আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। সে ইচ্ছা করেই হাই তুলছে। বলছে, আমাকে তোমরা আর কষ্ট দিও না।

রাতে গীতামাসি একটা কম আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। আলোটার রং কেমন তামাটে। এবং এই আলোটা না জ্বালালে, অন্যদিন টুকুনের ঘুম আসত না। আজ অন্যরকমের। সে গীতামাসিকে বলেছে—সবুজ আলোটা জ্বালিয়ে দেবে?

—সবুজ আলো জ্বালালে তুমি তো ঘুমাতে পার না।

—তুমি দাও গীতামাসি। তামাটে রং আমার আজ ভাল লাগবে না।

টুকুন গীতামাসিকে আরও বলেছিল, এই ছাখ আমার বালিশের নীচে কিছু রজনীগন্ধা আছে। ওগুলো রূপোর ফুলদানিতে রেখে আমার মাথার কাছে রেখে যাও। আমার চারপাশে আরও কিছু রাখ, যাতে আমাকে আরও সুন্দর দেখায়। শেষপর্যন্ত 'আমাকে সুন্দর দেখায়' সে বলতে পারেনি। কেমন লজ্জা এসে গেছিল। তার এমন একটা অনুভূতি এতদিন কোথায় যে ছিল! ওর শির শির করছে শরীরটা। এবং চাদর দিয়ে গোটা শরীরটা ঢেকে রাখতে ইচ্ছা হচ্ছে। এটা যে কি হয়ে যাচ্ছে ভিতরে। ওর জল-তেষ্টা পাচ্ছে। সে টিপয় থেকে হাতির দাঁতের মিনা-করা জলদানি তুলে জল খেল। তার হাত কাঁপছে। ঠোঁট কাঁপছে। ভিতরে কিসের যেন ঝড়। যেন কোথাও বাদলা দিনে সে বৃষ্টি-ভিজে এক বড় মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে। ওর পায়ে সবুজ ঘাসের চিহ্ন। ওর চোখে-মুখে বৃষ্টির ছাট।. পরনে সাদা সিল্ক লতা-পাতা আঁকা নীল রংয়ের। পায়ে তেমনি আলতা। হাতের আঙুলগুলো লম্বা, লম্বা নখে নীল রংয়ের পালিশ। নখগুলো কিছুটা লম্বা, কিছুটা উজ্জ্বল, সে হাতের ওপর হাত রেখে নিজের সুন্দর হাত পা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। সে আর টুকুন থাকছে না। সে কল্যাণী হয়ে যাচ্ছে। সে কল্যাণী মজুমদার হয়ে যাচ্ছে। সে তার ভাল নামটা অথবা বড় হয়ে যে নামটা ব্যবহার করার কথা, কতদিন পরে মনে করতে পারছে।

টুকুন পাশ ফিরে শুলো। সেই গ্রহাণুর ছোট্ট রাজপুত্রের কথা কিছুতেই মনে আসছে না। অথবা সেই মরুভূমির কথা। মরুভূমিতে যদি সেই মানুষটা এখনও তার উড়ো জাহাজটা ঠিক করে উঠতে না পারে—তার খুব কষ্ট। তার বাড়ি-ঘর, যদি তার স্ত্রী থাকে—খুব

একটা কষ্টের ব্যাপার—সে এখন কেবল এসব মনে করতে পারছে।

ওর আঙুলে রক্তের তাজা একটা ভাব জেগে যাচ্ছে। সে এই শরীরে মনোরম এক স্বপ্ন নিয়ে শুয়ে আছে।

সুবল আর তার কাছে এখন শুধু পাখিয়ালা নয়। সে একজন মানুষ। ওর শরীরে এক সুন্দর রাজপুত্রের বাস। সে টের পেয়েছে—এই শরীরে ঈশ্বর এমন কিছু দিয়েছেন যার সৌরভ মানুষকে বড় করে তোলে। মানুষ বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়। তার কাছে এই অর্থটার মানে জানা ছিল না। সুবল আজ তাকে কি যে করে দিয়ে গেল।

সুবল, সুবল এক মানুষ, লম্বা, কালো চুল, চোখ লম্বা, নাক সামান্য চাপা। ওর ঘাড় শক্ত। পিঠ চওড়া। বুকের পাশের দুভাগ এবং দুই হাতের নীচে সামান্য বনরাজি নীলা। সে যখন স্নান করছিল—সেইসব কারুকাজ করা সুন্দর সুদৃশ্য এক শরীরে কি যে সব আকর্ষণের খাঁজ রেখে দিয়েছে।

সে একটা তাজা সিংহের ছবি একবার তুলেছিল ক্যামেরাতে। ছবিটা তার দেখতে খুব ভাল লাগত। সেই তাজা সিংহের সঙ্গে সুবলের শরীরের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

টুকুনের চুল জামা, পাজামা ভিজা। টুকুনকে কোথাও মেয়ে মনে হয় না। শুধু মুখে মেয়ের মত নরম এক ছবি। যা খুব কষ্টের আর দুঃখের মনে হচ্ছিল।

কোথাও ঘণ্টা বাজছে। রাত এখন বারোটা। কোথাও রেল-গাড়ির শব্দ। না, সে নিজের ভিতরই এক রেলগাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। গাড়িটা তাকে নিয়ে ছুটছে। গাড়িতে সে এবং সুবল। এক সাদা জ্যোৎস্নায় তার সুবলের হাত ধরে বেড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্রর কথা মনে হল। কাল ইন্দ্র এলে সে আর ঠিকমত বুঝি কথা বলতে পারবে না।

গীতামাসি এসে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমি শোও।

—তুমি শুয়ে পড়োগে?

—বড় বাবু কি বললেন?

বাবা বললেন, টুকুন এবার তুমি সত্যি ভাল হয়ে গেছ।

ওরা কেউ বেশীক্ষণ ছিল না। এমন একটা উত্তেজনার ভিতর বেশী
ময় টুকুনকে বিরক্ত করা ঠিক না। বাড়ি থেকে চারপাশে সব মানুষের
াছে খবর পৌঁছে যাচ্ছে টুকুন ভাল হয়ে গেছে। টুকুন কতকাল পরে
িয়ানো বাজিয়েছে। টুকুনের রক্তকণিকারা আবার উদ্যমশীল হচ্ছে।

এইভাবে এই সংসারে কোথাও কখন কি-ভাবে যে খরা লেগে যায়।
টা কখনও মানুষের শরীরে, প্রকৃতির ভিতর এবং কলকারখানায়
তে পারে। সুরেশবাবু জানেন, চারপাশে যে এত ঘেরাও লক-
াউট এবং শ্রমিকেরা নিজেদের দাবী সম্পর্কে সচেতন—অথচ কাজ
চ্ছে না, উদ্যমশীল না হলে যা হয়ে থাকে, একটা জাতি মরে যাচ্ছে।

তিনি বেশীক্ষণ ছিলেন না। মা-মাসিরা কি যে কলরব করে গেছে!
াতামাসি বলেছে, ওর শরীর খারাপ করবে। টুকুন এত ভিড় সহ্য
রতে পারবে না। আবার কেউ কেউ ভাবছে, টুকুনের তো এমন
কি আরো দুবার তিনবার হয়েছে। সুতরাং খুব একটা আশা করা
াল না।

গীতামাসি বলল, টুকুন না ঘুমালে শরীর আবার খারাপ করবে।

—আমার ঘুম আসছে না গীতামাসি। সে দেখল পায়ের হাঁটুর
পরে ওর ফ্রক উঠে গেছে। সে তাড়াতাড়ি শরীর ঢেকে দিতে গেল।
ই হাটু এই বয়সে বের হয়ে থাকা কেমন সঙ্কোচের। সে বলল, আমি
ড়ি পরব গীতামাসি।

—কাল থেকে পরবে।

—না। আমি এখন পরব।

জিদ ঠিক আছে। গীতামাসি মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। তবু

কিছু বলার উপায় নেই। শাড়ি এলে টুকুন বলল, দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। তুমি যাও গীতামাসি। সে গীতামাসিকে যেন জোরজার করেই বের করে দিল। রেডিওটা খুলে দিল। ছায়াছবির গান হচ্ছে। সে প্রতিটি গানের সঙ্গে এখন গলা মেলাচ্ছে। সে ঘরেই আয়নার সামনে দাঁড়াল। তার কোন কষ্ট হচ্ছে না হাঁটতে। সে যে কি করে শরীরে এমন শক্তি পাচ্ছে! এবং কখনও কখনও যেন মনে হয় সে একটা হালকা পাখির মত এখন এই ঘরে গানের সুরের সঙ্গে ভেসে বেড়াতে পারে।

সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখল। কত দিন পর সে আয়নার সামনে যেন দাঁড়াল। এতবড় আয়নায় সে কবে থেকে নিজের মুখ দেখতে ভুলে গেছিল। সহসা যেন মনে পড়ছে—মুখ না দেখলে, আয়নায় মুখ না দেখলে, কি করে বড় হয়ে যাচ্ছে বোঝা যাবে না।

সে দাঁড়িয়ে আয়নায় মুখ দেখল। ধীরে ধীরে সবুজ হালকা ফ্রকটা খুলে ফেলতে থাকল। শরীরে মাংস লাগতে চায় না। তবু সে বুকে হাত রাখল। ধীরে ধীরে হাত বুলাল। ওর কেন জানি কান্না পাচ্ছে। কেন জানি শরীরের ভিতর আশ্চর্য যে চেতনা নিয়ে বড় হবে স্বপ্ন দেখছে, সেখানে তার কিছু জন্ম নিচ্ছে না। যেন এখন থেকে সে প্রতিদিন এ-ভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেবল অপেক্ষা কর এবং স্মৃতি, কি যে স্মৃতি মানুষের—সুবল তার কাছে একটা প্রথম আদিম মানুষ, যে মানুষের আদিমতা নিয়ে সোজা সহজভাবে তাকিয়েছিল। এবং দৃশ্যটা ভাবতে কি যে ভাল লাগছে! সে যেন এমন একটা দৃশ্য ভেবে ভেবে সারারাত ভোর করে দেবে। হয়তো সকালে ফুল ফোটার মত দেখবে, সে-ও শরীরের ভিতর ক্রমে ফুটে উঠছে। ওর ভীষণ ভাল লাগছে এভাবে ভাবতে!

এবং এসব ভাবনাই মেয়েকে এক সকালে সত্যি সত্যি বড়

করে দিল। সে আয়নায় দাঁড়িয়ে এ-সব কি দেখছে! সে যে বড় হচ্ছে তার প্রমাণ শরীরে ভেসে উঠছে। কতকালের রাত জাগা, অথবা সুবল এলে ওকে নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে এই হলঘরের মত ঘরে অথবা দক্ষিণের বারান্দায় এবং কথা আছে সে যখন গান গাইবে, অথবা পিয়ানো বাজাবে, কিংবা রেডিওর গানের সঙ্গে গলা মেলাবে—তখন এই ঘরে কেউ থাকবে না। সে ওর খুশী মত সুবলকে নিয়ে এক আশ্চর্য সুন্দর জগৎ তৈরী করেছে—যা সে কোনদিন ভুলে যেতে পারবে না। ইন্দ্র আসে ঠিক, তবু ইন্দ্র এলে সে কেমন উদাসীন হয়ে যায়। কারণ ইন্দ্রের স্বভাবটা কিছুটা কেন জানি আজকাল মেয়েলী মনে হচ্ছে। বরং এই সুবল যার কিছুটা সন্ন্যাসী তরুণের মত মুখ, যে খুব সৎ এবং যে সব সময় নিজের মত করে ভাবে—যে ছোট্ট রাজপুত্রের গল্প শুনে হেসেছিল, বলেছিল—সে আর তার গ্রহাণুতে ফিরে যেতে পারবে না। পৃথিবীর গাছ পাখি ফুল ফল এমন সে আর পাবে কোথায়। কেউ এখানে এলে আর কোথাও যেতে চায় না। বড় মায়া আর ভালোবাসায় পৃথিবী মানুষকে আটকে রাখে। টুকুনের মনে হয়েছিল, সুবলই তার সেই ছোট্ট রাজপুত্র। তাকে বাদ দিয়ে সে কিছুতেই বাঁচতে পারে না। সুবল তার ছোট্ট গ্রহাণুতে আর ফিরে যেতে পারবে না।

১৬

একটা বাওবাব গাছের বড় দরকার সুবলের, এমন মনে হ'লে—চারপাশে যা কিছু, যেমন একটা নদী আছে, নদীর পারে বন আছে আর এ পারে আছে ফুলের উপত্যকা, এর ভিতর বাওবাবের চারা লাগিয়ে দিলে বেশ একটা সুন্দর পৃথিবী সে গড়ে তুলতে পারত, এবং এমন উপত্যকায় একদিন ওর ভারি ইচ্ছা টুকুনকে নিয়ে আসবে। সে আর টুকুন। বুড়ো মানুষটা আজকাল আর ঘর থেকে বের হতে পারে না। সুবল তার জন্য সুন্দর টালির ঘর করে দিয়েছে। লাল টালি, মাটির দেয়াল, দেয়ালে নানা রকমের কারুকাজ, ফুলফল লতাপাতা সব ছবিতে আঁকা।

বুড়ো মানুষটা চলাফেরা তেমন আজকাল করতে পারে না বলে, সে তার জন্য আর বুড়ো মানুষটার জন্য রান্না করে। নামাজের সময় হলে সে মনে করিয়ে দেয়—এখন তোমার কর্তা জহোরের নামাজ। বুড়ো মানুষটা চোখে আজকাল ভাল দেখতে পায় না। কোথাকার কে সুবল এসে এখন এই ফুলের উপত্যকায় রাজা হয়ে গেল প্রায়। সে সুবলকে সব দিয়ে যাচ্ছে। কারণ বুড়ো মানুষটার তো কেউ নেই। সে সুবলকে সব দিয়ে যেতে পেরেছে বলে ভীষণ খুশী। এমন ভাবে সে হাল্কা হতে পারবে কখনও ভাবতেই পারেনি। বড় চিন্তা ছিল তার, এমন সুন্দর একটা ফুলের উপত্যকা কাকে দিয়ে যাবে। ওর তো কেউ নেই। যারা আছে তারা সব ফুলের দালাল। কি লোভ বেটাদের। এসেই একটা বড় রকমের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলত—তা মিঞা, তুমি এমন একটা কাজ করলে কি করে!

—কি করে আবার? পরিশ্রম করে?

—শুধু পরিশ্রমে হয়?

—কেন হবে না?

—হয় না মিঞা।

তারপর সে থেমে একটু কি ভাবত, তারপর বলত, হ্যাঁ, আর আছে অহঙ্কার। আমার হাতের অহঙ্কার। আল্লা আমার সঙ্গে আমার অহঙ্কারের জন্ম দিয়েছেন।

সে ঠিক ঠিক বুঝতে না পারলে বুড়ো মানুষটা বলত, আমি চাই আমার মত এমন ফুলের চাষ কেউ আর করতে পারবে না। দিনমান খেটে, রাতে নদী থেকে জল এনে, রাতে কখনও বনে পাহাড়ে সব পাতা পুড়িয়ে এমন সব সার তৈরী করতাম—ভেবে অবাক হবে, সে সার না দিলে—ফুল কখনও এমন বড় হয় না। একটু থেমে সে ফুলের গাছ-গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত। তারপর বলত, আমি চাই না দুনিয়ায় আমার চেয়ে কেউ বেশী ফুলের চাষ ভাল জানুক।

সুবলের সঙ্গে সুখে দুঃখে ইমানদার মানুষটা এমন বলত।—আমার একটা লোভই আছে সুবল, কেবল জমি কিনে ফুলের চাষ বাড়িয়ে যাওয়া।

বুড়ো লোকটা আরও সব গল্প করত ওর সঙ্গে। সে ফিরে যখন বন থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে রাতের আহার তৈরী করত—তখন বুড়ো মানুষটার গল্প আরম্ভ হত। কারণ সে চোখে দেখতে পায় না বলে, রাজ্যের সব গল্প মনে করতে পারে। সুবলকে সে সব দিয়ে দেবার পরই কেমন আরও বেশী বুড়ো হয়ে গেল। সুবল যাদের নিয়ে চাষবাস বাড়াচ্ছে তাদের সন্ধ্যা হলেই ছুটি দিয়ে দেয় বলে, জায়গটা কেমন আরও বেশী নির্জন হয়ে যায়। নদীতে কখনও নৌকার লগির শব্দ কানে আসে। বৈঠা মেরে কেউ হয়ত গান গেয়ে চলে যায়। আর সূর্যাস্ত হলে যখন হাতপা ধোবার জল এনে দেয় টিউকল থেকে বুড়ো মানুষটা কেমন আন্দাজে গল্প আরম্ভ করে দেয়। নীচে যে সব

ঘাসের চটান আছে তার একপাশে সুবল রান্না আরম্ভ করে দেয়। খুব সোজা রান্না। নদী থেকে মাছ আসে। বুড়ো মানুষটা চাপিলা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। বিকেলে সেই মানুষটা এসে বেশ কটা বড় মাছ রেখে দিলে আন্দাজে হাত দিয়ে টের পায় মাছগুলো খেতে খুব ভাল লাগবে।

বুড়ো মানুষটার সামনে একটা হ্যারিকেন জ্বালা থাকে। মাদুরে সে বসে থাকে। পা দুটো তার ভাঁজ করা। মাথায় সাদা কাপড়ের টুপি। নানা রকমের কারুকাজ করা আছে টুপিতে। খুব সূক্ষ্ম সুতোর কাজ। সুবল ওর লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, টুপি, রোজ ধুয়ে রাখে। খুব সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার সখ এই মানুষটার, যেমন সে ভাবে এই সরল পৃথিবীতে আল্লা অথবা ভগবান যেই হোক না সব কিছু রেখে দিয়েছেন মানুষের জন্য। মানুষ সেটা পরিশ্রম করে পাবে ওর খুব ভাবতে কষ্ট হয়, সে কিছু এখন আর করতে পারে না। কাজ না করলে ঈশ্বর চিন্তা হয়। মাঝে মাঝে সে যখন এমন ভাবে তখন তার হাই ওঠে। সুবলের মাছের ঝোল টগবগ করে ফুটছে। সে সুন্দর কালোজিরে সাম্তরে বেগুন দিয়ে জিরে লঙ্কার কেমন সব সুস্বাদু খাবার করে। অথবা সে যখন মাছ সাতলায় তার ঝাঁঝ নাকে লাগলে বেশ খিদেটা বেড়ে যায়। তখন আর বুড়ো মানুষটা বসে থাকতে পারে না। সে বারান্দা থেকে নেমে সুবলের কাছে চলে গেলে, মনে হয় বেশ একটা নির্জন পৃথিবীতে তারা বেঁচে আছে। অনেক দূরের বন থেকে কিছু জীবজন্তুর ডাক, অথবা পাখপাখালির আওয়াজ এবং সে চুপ করে থাকলে পৃথিবীর যাবতীয় কীটপতঙ্গের আওয়াজ টের পায়। সে তখন চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। কিছুটা যেন গল্প করে সময় পার করে দেওয়া অথবা গল্প করে খিদের কথা ভুলে থাকা। তাই ওর গল্পে এমন সব কথা থাকে—বুঝলি, আল্লা আমাদের খুব সরল।

সুবলের স্বভার অন্য রকমের।—তুমি আবার কেন চাচা বাইরে

এলে। ঠাণ্ডা না লাগলে বুঝি চলে না! সুবলের মাঝে মাঝে সখ হলে বুড়ো মানুষটাকে চাচা বলে ডাকে। এমন একটা ডাক খোঁজ সে চায়! সে ভালবাসে সুবল তাকে চাচা বলে ডাকুক।

সে উনুনের পারে বসে কেমন কিছুটা তাপ নেবার মতো হাত বাড়িয়ে বলল, তোর উনুনের আঁচটা ভাল লাগছে। তারপর কেমন যেন সরল মানুষের মতো বলা, আমার খুব খিদে লেগেছে সুবল। তুই আমাকে খেতে দে। তোর কেবল কাজ আর কাজ।

—তুমি না বললে চাচা, আল্লা মানুষের জন্য পৃথিবীতে সব কিছু রেখে দিয়েছেন। পরিশ্রম করে তাকে সেটা পেতে হবে।

—খিদে লাগলে সব ভুলে যাই।

—আমি তো তোমার জন্য তাড়াতাড়ি করছি। সারাদিন পর দুটো খাবে—

—আমি কাঠ ঠেলে দিচ্ছি। তুই যা! কলাপাতা কেটে আন।

—রাতে কেউ গাছ থেকে পাতা কাটে!

—ওরা যে বলল, তুই কেটে রাখিস নি।

ওরা মানে যারা কাজ করে। কাজের শেষে ফিরে যাবার সময় বুড়ো মানুষটার কাছে এসে ওরা দাঁড়ায়। বলে, চাচা যাচ্ছি।

—যা। একটু থেমে বলে সুবল তোদের টাকা পয়সা দিয়েছে?

—দিয়েছে চাচা।

—আমাদের জন্য দু জোড়া কলাপাতা কেটে রেখে যাস। নিত্য এটা কেমন বলার স্বভাব মানুষটার।

ওরা বলল, সুবল বলেছে কেটে রাখবে। আমাদের কাজ সারতে সারতে একটু দেরি হয়ে গেল চাচা।

—ও কি করছে?

—আসছে। নলচিতা গাছের দুটো বেড়া কার গরু ভেঙ্গে দিয়ে

গেছে। আজ সারাদিন আমরা ওটাই করলাম। ও ঘুরে ঘুরে দেখছে আরও কোথাও এমন হয়েছে কি না।

—আমাকে ও আজকাল কিছু বলে না।

—বললে তুমি কষ্ট পাবে।

--আমি কষ্ট পাব কেন ?

—তোমার এমন সুন্দর বাগান কেউ নষ্ট করলে কষ্ট পাবে না ?

—সে তো শুনছি খুব চাষবাস বাড়াচ্ছে।

—ওর জন্য আমাদের এখন আর সহরে যেতে হয না চাচা। সুবল আমাদের শহরের চেয়ে বেশী পয়সা দিচ্ছে।

এমন বললেই বুড়ো মানুষের যা হয়—সেই ঈশ্বরপ্রীতির কথা, অর্থাৎ আল্লা আমাদের খুব সরল। তিনি পৃথিবীতে চান সরল এবং ভাল মানুষেরা বাঁচুক। তারপরই তিনি সেই মহামহিমের জন্য কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখেন, যেন বুঝতে পারেন, আছেন, চারপাশেই আছেন তিনি। সব লতাপাতার ভিতর, ফুলফলের ভিতর এবং সব গ্রহনক্ষত্র আর সৌরলোক, যা কিছু আছে চারপাশে—তিনি আছেন। কোন উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। তিনি রাজার রাজা। তিনি সবচেয়ে প্রাজ্ঞ। যা কিছু আছে আকাশে, আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সব তাঁর। তিনি জানেন সব কিছু—। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁর অন্তর্লোকের রহস্য। তিনিই জানেন একমাত্র কি আছে সামনে আর কি আছে পিছনে। তাঁর আসন আকাশ আর পৃথিবীর ওপরে বিস্তৃত আর এই দুইয়ের তিনি নিশিদিন রক্ষাকারী। তিনি তার জন্য এতটুকু ক্লান্ত বোধ করেন না। আর সেজন্য তিনি মহীয়ান, মহামহিম।

সুবল তখন এসে বলল, চাচা তুমি খাবে।

মানুষটার চোখমুখ কেমন উদাসীন দেখায় তখন। চুপচাপ বসে থাকে। খাবার কথা সে ভুলে যায়। তাকে যে খেয়ে নামাজ পড়তে হবে সে যেন তা আর মনে রাখতে পারে না। সেই থেকে, অর্থাৎ

সেই যখন পরিশ্রমী মানুষেরা চলে গেল, এবং সে বসে থাকল একা মাদুরে—তারপর সুবলের ফুলের চাষবাস দেখে ফেরা, এবং এসব কেমন যেন তার উদাসীনতার ভিতর পার হয়ে গেছে। সে যে উত্তাপ নেবার জন্য উনুনের পাশে বসেছিল, সেও কিছুটা বোধ হয় সেই অন্তর্যামীর ইচ্ছা, সে যে খিদে লেগেছে বলেছে, সেও বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা। এবং এই বুড়ো মানুষের যা স্বভাব খেতে খেতে কেমন আনমনে বসে থাকা তাও।

সুবলেরও স্বভাব হয়ে গেছে, খাও চাচা। তোমায় মাছ বেছে দিচ্ছি। এই বলে সে বেশ ডেলার ওপর মাছ রেখে দিলে হাত টিপে টিপে টের পায় মানুষটা—সুবল বড় যত্নে সব কিছু করে যাচ্ছে।

সে তখন বলবে, সুবল তুই তোর ধর্ম মানিস?

—ঠিক বুঝি না চাচা। ধর্মের কথা মনে হলেই সেই জনার্দন চক্রবর্তীর কথা মনে হত। আর আমাদের ছিল সুবচীন দেবীর মন্দির। ওর ভীষণ বিশ্বাস ছিল, দেবীর ক্রোধে আমাদের দেশটায় খরা এসে গেল।

বুড়ো মানুষটা বলল, তোরা সবাই চলে এলি, সে থেকে গেল।

—ওর ছিল প্রচণ্ড অহঙ্কার। ও ছিল ঠিক তোমাদের মুসার মত।

রাতে যখন ওরা শোয়, ঘরের দু পাসে দুটো বাঁশের মাচান, মাচানে নকশি কাঁথার বিছানা, তার পাশে ফুল, বেল ফুল, রজনীগন্ধা, অথবা গন্ধরাজ ফুল এবং কখনও সব নীল অপরাজিতা, জবা ফুল, চামেলি, চাঁপা কত যে ফুল নিয়ে বেঁচে আছে এই উপত্যকা আর তার ভিতর আছে একটা লাল টালির ঘর, সেখানে সুবল আর চাচা রাতে শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে কেবল নানারকম গল্প করে যাওয়া। বুড়ো মানুষটা খুব বেশী মুসার গল্প বলতে ভালবাসত। সেই থেকে সুবল একটা মানুষের সঙ্গে কেবল জনার্দন চক্রবর্তীর মিল পায়, তার নাম মুসা। মুসার মত আত্মবিশ্বাস ছিল মানুষটার। কেবল লাঠিটা ছিল

না হাতে। অথবা যে লাঠি ছিল, সেটা বুঝি ঈশ্বরপ্রদত্ত ছিল না। না হলে মুসা সেই যে তাঁর লোকদের জন্য জল চাইলেন, আর তখনই দৈববাণী, তোমার আসা (লাঠি) দিয়ে পাথরে মারো। যেই মুসা তার লাঠি দিয়ে পাথরের পর পাথর ছুঁড়ে গেল, আশ্চর্য, নীল পর্বত-মালার নীচে, শুকনো মরুভূমিতে বারোটি জলের প্রস্রবণ। জলপান করো মনুষ্যগণ। আল্লাহ্ যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও আর পান করো। অন্যায়কারী হয়ে দেশে অপবিত্র আচরণ করো না।

যখন সেই উপত্যকায় সাদা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে থাকত, আর ফুলেরা ফুটতে থাকত, এবং সব ফুলেদের ফোটার ভিতর আশ্চর্য উল্লাস থাকত, বুড়ো মানুষটা শুয়ে শুয়ে তা টের পেত। সে বলত, সুবল আমাকে নিয়ে একটু ঘুরে বেড়াবি। আমাকে নিয়ে একটু গোলাপের বাগানে নিয়ে যাবি। অথবা চামেলি গাছটার নীচে তুই আর আমি কিছুক্ষণ বসে থাকব।

ছেলেমানুষ সুবল। সারাদিন খাটাখাটনি করে তার ঘুম পায়। সে এখন সপ্তাহান্তে যায় বড় শহরে। টুকুন এখন কত বড় আর লম্বা হয়েছে। সে যায় সদর দরজা দিয়ে। টুকুন আরও সুন্দর করে সাজে তখন। এবং যে দিনটাতে সে শুনেছে ইন্দ্র আসে না। টুকুনের ভয় কেন যে ইন্দ্রকে নিয়ে। সেতো কোন পাপ কাজ করে নি। টুকুন দিদিমণির মুখ চোখ, এবং যখন সেই পিয়ানোতে একটা সিল্কের পাঞ্জাবী আর পাজামা পরে চোখ বুজে গান গায়, ওর ববকরা চুল ঘাড়ে রেশমের মতো উড়তে থাকে তখন সে কেমন এক আশ্চর্য সুষমা টের পায় টুকুনের শরীরে। ঈশ্বর টুকুনকে যেন এতদিন অপবিত্র করে রেখেছিল। টুকুনের। টুকুনের শরীর দেখে অর্থাৎ টুকুনের সবকিছু মা হবার জন্য যখন উন্মুখ, টুকুনকে কি করে আর ঈশ্বর অপবিত্র রাখেন। পবিত্র মুখে সুবলের জন্য ভীষণ মায়া। সুবলও যখন আসে বেশ সুন্দর

পোশাকে আসে। সে তার ঘাড়ে একটা রঙ বেরঙের ব্যাগ রাখে। ব্যাগে থাকে যাবতীয় সব কেয়া ফুল। সুবল এলেই সব মানুষেরা টের পায় সুন্দর সুগন্ধে গোটা বাড়িটা ম ম করছে। অথচ কেউ টের পায়, না, একজন মানুষ গ্রাম থেকে চলে আসছে, সদর দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, ঘোরানো সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে, এবং এ-সময় টুকুন ঠিক থাকবে। অন্য দিকের দরজা ঠিক বন্ধ থাকবে—কিন্তু রোজ এখন এটা করতে পারে না। টুকুন ভাল হয়ে গেছে বলে তাকে ইন্দ্রের সঙ্গে পার্টিতে যেতে হয়, সে ভাল হয়ে গেছে বলে তাকে ইন্দ্রের কাছে গাড়ী চালানো শিখতে হয়। ভাল হয়ে গেছে বলে আত্মীয়স্বজনরা, বন্ধুবান্ধবেরা তাকে ঘিরে থাকতে ভালবাসে। অথচ সুবল টের পায়—বড় অস্বস্তি টুকুনের। সে এখন যা ভাবছে. একটা বাওবাব গাছের চারা পেলেই টুকুন দিদিমণিকে এখানে নিয়ে আসতে পারবে। এবং এত সব ভাবনায় সে রাতে বড় ক্লান্ত থাকে। ওর ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু বুড়ো মানুষটা টের পেয়েছে ফুলেরা ফুটছে। সে সাদা জ্যোৎস্নায় বসে চুপি চুপি ফুলেদের ফুটতে দেখবে। এবং মনে হয় যে তখন মহামহিম আল্লাহ্‌র করুণা সব ফুলে ফুলে আশ্চর্যভাবে টের পায়। বুড়ো মানুষটা চুপচাপ তখন কেবল গাছের নীচে বসে থাকতে ভালবাসে।

সেও বসে থাকে চাচার সঙ্গে। সামনের জমিটা বেল ফুলের। হেমন্তের শেষাশেষি এটা। শীতকাল আবার আসবে। এখন সাদা জ্যোৎস্নায় শীতটা ওদের বেশ লাগছিল। একটা পাতলা কাঁথা বুড়োর গায়ে দিয়েছে সুবল। এমন জবুথবু হয়ে বুড়ো মানুষটা এখন ফুলের সৌরভ নিচ্ছে।

এখন দেখলেই সুবলের বলতে ইচ্ছা হয়, চাচা তুমিতো অনেক জানো, এখানে কোথায় বাওবাব গাছ পাওয়া যায় বলতে পার?

অনেকক্ষণ পর বুড়ো মানুষটা সুবলের দিকে তাকায়।—কিরে আমাকে কিছু বলছিস।

. —একটা বাওবাবের চারা না হলে যে চলছে না।

—এটা এখানে পাবি কোথায়? সেতো ছোট্ট রাজপুত্রের দেশের গাছ।

এমনি হয়, কারণ ওদের কথা কিছুই সংগোপনে থাকে না। সুবল যে সব গল্প টুকুনের কাছে শুনে আসত, সব এসে হুবহু বুড়ো মানুষটাকে বলত। ইদানীং তো সুবলের সন্ধ্যার পর কথা বলার আর কেউ থাকে না। কেবল বুড়ো মানুষটার সঙ্গে যত কথা। সে উনুনে মাটির হাঁড়িতে ভাত সেদ্ধর সময় অথবা যখন ডাল সেদ্ধ হয় উনুনে এবং আগুনের তাপে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে যায়—তখন নিবিষ্ট মনে যত রাজ্যের গল্প সে চাচার সঙ্গে জুড়ে দেয়।

—ছোট্ট রাজপুত্রের দেশে যদি আগ্নেয়গিরি থাকে, যদি নদী থাকে, এবং সমুদ্র থাকে তবে আমাদেব পৃথিবীতে একটা বাওবাব থাকবে না

—তা বটে। বলে কেমন একটা হাই তুলল।

—তোমার ঘুম পাচ্ছে চাচা। এবারে ওঠো।

—তোর ঘরে শুয়ে থাকতে এখন ভাল লাগবে!

—খুব।

—তুই তবে মানুষ না।

—তা যা খুশি বলতে পার।

কেমন আসমান, তারা, চাঁদ, আর ছাখ যেদিকে চোখ যায় তোর মনে হবে একটা ফুলের জগতে বসে আছিস। দূরের জোৎস্নায় কেমন ফুলের সৌরভ ভেসে যাচ্ছে ছাখ।

বুড়ো হলে কিছু এমন ধরনের কথা বলেই থাকে। সুবল সেজন্য মনে কিছু করে না। কেবল মাঝে মাঝে কথায় সায় দিয়ে যায়। এবং কথা না থাকলে টুকুনের কথা ঘুরে ফিরে আসে।

—জানো চাচা, টুকুন দিদিমণি এখন গাড়ি চালাতে শিখছে।

টুকুনের জন্য তোর খুব কষ্ট সুবল। কারো জন্য কোন কষ্ট মনে মনে পুষে রাখবি না। তবে দুঃখ পাবি।

—তুমি বুড়ো হয়ে গেছ বলে এমন কথা বলছ।

বুড়ো হলে মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পারে সুবল।

সুবল এবার বলল আমার কোন কষ্ট নেই। আমি গাঁ থেকে এসেছি। জলের জন্য এসেছিলাম। এখন ফুল বেচে খাই! তুমি আছ, এমন একটা ফুলের উপত্যকা আছে আর কিছুদূর গেলে নদী, তার পারে বন আছে, আমার দুঃখ কি চাচা।

—তোর কথা শুনলে আমি সব বুঝি। তোর কতটা কষ্ট আমি ধরতে পারি।

ওরা এ-ভাবে কখনও সকাল করে দেয়। এবং যখন ফুলের দালালেরা আসে, সুবল ফুল তুলে দেয় তাদের। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো মানুষকে খাইয়ে এবং নামাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে সুবল চলে যায় নদীতে। সে নদীর পারে সব ছেড়ে জলে নেমে যায়। তার এ-ভাবে নদীর জলে সাঁতার কাটতে ভীষণ ভাল লাগে। ও-পাশে বন, বনে নানারকম গাছ, সে সব গাছের নাম জানে না, বুড়ো মানুষটা জানে। সে আগে মাঝে মাঝে বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে বনে আগুন জ্বালতে গেলে কখনও কখনও সে কিছু গাছের নাম জেনে নিয়েছে। বাকিগুলো জানা হয়নি। জানতে জানতে কখন বুড়ো মানুষটা চোখে কম দেখতে থাকল। তাকে আর রোজ নিয়ে সে নদীর ওপারে যেতে পারত না। তাকে একা একা বনের শুকনো পাতা ঘাস কুড়িয়ে আনতে হত সারের জন্য। এবং এই সার তৈরী করা সে বুড়োর কাছেই জেনেছে। তিনি বলেছেন, তোমায় এই দুনিয়াতে আল্লা সব দিয়ে দিয়েছেন, তুমি বাপু করে কম্মে খাও। এমন কিছু নেই যা সংসারে অবহেলার। গাছ তার অতিরিক্ত সব

কিছু অর্থাৎ পাতা ডাল, সময় হলে পরিত্যাগ করে, তুমি তা থেকেই অমূল্য সব বস্তু নির্মাণ করে নিতে পার। বুড়ো মানুষটা আল্লার কথায় এলেই কেমন সাধুভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে।

সুতরাং সাঁতার কাটতে কাটতে সে কখনও নদীর ওপারে ওঠে বনে ঢুকে যায়। বনে কোন মানুষের ছায়া থাকে না। বড় শহর থেকে ঘণ্টা খানেকের পথ ট্রেনে এলে, এবং একটা বড় মাঠ পার হয়ে গেলে এমন একটা নদী, এমন একটা ফুলের উপত্যকা, এমন একটা ছোট্ট বন, সবুজ লতাপাতা ঘাস নিয়ে ক্রমে ঈশ্বরের পৃথিবীতে বড় হচ্ছে টের পাওয়া যায় না।

সুবল বেশ হেঁটে যাচ্ছিল। তার একা একা এই বনের ভিতর একজন আদিম মানুষের মত হেঁটে যেতে ভাল লাগছিল। সেই যে সে মুসার গল্প শুনেছে, সেই যে সে আদম ইভের গল্প শুনেছে, অর্থাৎ প্রাচীনকালে মানুষেরা বনে পাহাড়ে থাকত, অথবা প্রথম মানুষ আদম ইভের জ্ঞানবৃক্ষের ফল চুরি করে খাওয়া সব তার একসঙ্গে মনে পড়ছে। এবং মনে হয় সে বেশ ছিল, ভাল ছিল, যেন সে ট্রেনে চড়ে শহরে চলে এসেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেছে। কেমন তার উচ্চাশা, এবং আকাঙ্ক্ষা তাকে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে খুব ছোট করে দিচ্ছে। এমন মনে হলেই চুপচাপ একটা গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টুকুন দিদিমণির কথা মনে হয়। দিদিমণির সেই রুগ্‌ণ মুখ, বিবর্ণ ছবি চোখে ভেসে ওঠে—তারপর সে কি করে যে আশ্চর্য এক পাখির খেলা দেখিয়ে দিদিমণিকে নিরাময় করে তোলার সময় তার জানা ছিল না, এক আশ্চর্য যাদুকরের খেলায় সে দিদিমণির ভিতরে ভালবাসা সঞ্চার করেছে। পৃথিবীতে বুড়ো মানুষটাই কেবল মাত্র তার কষ্টটা বুঝতে পারে। সে যে নিশিদিন ফুল ফুটিয়ে বেড়ায় কেউ জানে না তার দুঃখটা কোথায়। টুকুন দিদিমণির সঙ্গে সে এখন একা একা কথা বলতে পারে। সে সেজন্য এখন বনে ঢুকে গেলে দেখতে পায় যেন সে ছোট্ট

রাজপুত্র হয়ে গেছে। একটা বাওবাবের নীচে সে আর টুকুন দিদিমণি দাঁড়িয়ে। বুড়ো মানুষটা যাচ্ছে হেঁটে! ফুলের সৌরভ তখন কেবল ভেসে আসছিল। বুড়ো মানুষটা তখন লাঠি তুলে যেন বলছে, সুবল তোর ঈশ্বর তোকে অহঙ্কার দিক, তুই ভালভাবে বেঁচে থাকতে শিখ। ঈশ্বরের পৃথিবীতে ভালবাসার দাম সবচেয়ে বেশী। তাকে হেলা ফেলা করতে নেই।

১৭

ইন্দ্র বলল, বেশ হাত দেখছি।

—বেশ বলছ ?

—এমন একটা জ্যামের ভিতর থেকে বেশ কায়দা করে গাড়িটা বের করে দিলে।

—তাহলে আমি একা একা চালাতে পারব বলছ ?

—সেতো কবে থেকে তুমি চালাতে পার।

—তবে মা দিচ্ছে না কেন ?

—মাসিমার ভীষণ ভয়।

টুকুনের বলতে ইচ্ছা হল ভয় না হাতি। মা একা ছেড়ে দিচ্ছেন না, পাশে সেই যে যুবক বড় হচ্ছে ফুলের উপত্যকায়, সেখানে সে না চলে যায়। মা টের পেলে বলেছিল একদিন, টুকুন এটা তোমাকে মানায় না।

টুকুন যেন বুঝতে পারছে না, এমনভাবে বলেছিল, কি মানায় না মা ?

—তুমি তা ভাল করেই বোঝ।

টুকুনের মনে হল, সেটা সে আজও ঠিক বোঝে না। সে আসত পালিয়ে পালিয়ে। পাঁচিল টপকে আসত। তার এমন নিত্য আসার সময় একদিন ধরা পড়ে গেলে—বাড়িতে হৈ চৈ। মা, বাবা, সব মানুষেরা ওকে বলেছিল, ছিঃ ছিঃ টুকুন, তুমি কত বড় বংশের মেয়ে।

টুকুনের বলার ইচ্ছা হয়েছিল, সে এলে আমি মা, আমার ভিতর থাকি না। কি সুন্দর এক জগতের সে বাসিন্দা মা। সে তার ফুলের

উপত্যকায় নিয়ে যাবে মা, সেখানে গেলে মানুষের বুঝি কোন দুঃখ থাকে না!

মা বলেছিল, আমাদের দিকটা একবার ভেবো।

সুবল কিছু বলছিল না। সে সত্যি অপরাধ করে ফেলেছে। তার আসা উচিৎ হয়নি এ-ভাবে। সে কিছুটা মাথা নীচু করে রেখেছিল। কেবল মজুমদার সাহেব পাইপ টানতে টানতে কেমন একটা মজা অনুভব করেছিলেন। এবং সে যে একেবারে ভীষণ কিছু করে ফেলেনি সেটা যেন মজুমদার সাহেব হ্যাঁ বা নার ভিতর কিছুটা প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি এমনভাবে কথা বলেছিলেন যে, ছাখো সুবল, তুমি এভাবে না এসে সদর দরজা দিয়ে এলেই পার। তুমি তো সুবল ফুল বিক্রি করে খাও। তোমার তো মানুষের ভালো দেখাই স্বভাব। তুমি কেন তবে এভাবে আসবে।

সুবলও ভেবেছিল, তা ঠিক, এ-ভাবে না এসে সে সদর দিয়েই আসবে। সে বলেছিল, আমি সদর দিয়েই তবে আসব।

টুকুনের মার চোখ মুখ ভীষণ খারাপ দেখাচ্ছে। কি নির্লজ্জ বেহায়া ছাখো। মান অপমান বোধটুকুও নেই। টুকুনের মা কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তবে এতদিন নচ্ছার ছোঁড়াটা এভাবে পালিয়ে এসে কিনা করেছে। সে বলল, তুমি আসবে না। এলে তোমাকে পুলিশে দেব।

টুকুন বলল, পুলিশে দেবে কেন মা? সে চোর না মিথ্যাবাদী!

—দেখছো মেয়ের সাহস! বলেই টুকুনের মা ভীষণ জেদী মেয়ের মত দুপদাপ কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এল। এবং মজুমদার সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, সব তোমার আস্কারাতে। তুমিই এ-জন্য দায়ী।

—রাগ করছ কেন? ব্যাপারটা একবার ভেবে ছাখো না!

—ভাববার কি আছে! তুমি বরং ভাবো। তোমাদের যা খুশি

করবে। আমি কিচ্ছু বলব না। টুকুনের মার এটুকু বলেই যেন কেমন মনে হল, সে সব ছেড়ে ছুড়ে দিলে সবাই আরও জাহান্নমে যাবে। বরং সে রাগটুকু প্রবল বেখে দুঃখী মেয়ের মত মুখ কবে বলল, এতবড় বাড়ি, তুমি এতবড় মানুষ, তাব মেয়ে এমন হলে মান সম্মান আমাদের থাকবে।

আর তখনই মজুমদার সাহেব দেখলেন, পার্লাবে বেশ লোকজন জমে গেছে। সদর থেকে দারোয়ান হাজিব। আমলা কর্মচাবিরা হাজির। তিনি বললেন আপনারা যান। এবং এই যান বলতেই যান—একেবারে কথাই কেমন নাটকের কুশীলবেব মত যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন মাত্র আছেন, তিনি, টুকুনেব মা, টুকুন আর সুবল। মজুমদার সাহেব বললেন, সুবল বোস। তারপব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের সুবলের চোখ দুটো ভারি সুন্দর।

টুকুন বলল, ওর মুখটাও ভারি সুন্দব। আর সুবল কি লম্বা, না বাবা!

টুকুনের বাবা বললেন, সুবল তুমি ভীষণ সুপুরুষ হতে পারতে। কেবল নাকটা তোমাকে বেইমানি করেছে।

সুবল এসব বুঝতে পারছে না। ওর চেহারার প্রশংসা হচ্ছে। সে সাদা পায়জামা পরেছে। ঝোলা গেরুয়া পাঞ্জাবী। সে রংবেরঙের ব্যাগ রেখেছে বগলে। ভিতরে নানা বর্ণের ফুল। এবং আশ্চর্য গন্ধের ফুল। এই ঘরে এমন ফুলের সৌরভ যে বেশিক্ষণ রাগ নিয়ে বসে থাকা যায় না। ফুলের সৌরভে মন প্রসন্ন হয়ে যায়। এবং সবারই যখন মন প্রসন্ন হয়ে যাচ্ছিল, বাড়ির সবারই অর্থাৎ দাসী-বাঁদিদের পর্যন্ত তখনও কিনা টুকুনের মা মন ভীষণ অপ্রসন্ন রেখেছে। সেই ছোঁড়া তিন চার বছর যেতে না যেতে কি হয়ে গেল। ট্রেনের সুবল আর এ-সুবল একেবারে আলাদা মানুষ। আর বেশ জালটি

পেতেছে। অসুখ ভাল করার নামে সেই যে ছারপোকার মত লেগে থাকল আর যাবার নাম নেই। সে বলল, বাপু তুমি এখানে আসবে না। আমি সোজা কথার মানুষ, সোজা ভাবে বুঝি। টুকুন এখন বড় হয়েছে। সুবলও যে বড় হয়েছে। সুবলও যে বড় হয়েছে সেটা বলল না।—খুব খারাপ এভাবে আসা।

—আর আসব না। সুবল এমন বলে উঠতে চাইলে, মজুমদার সাহেব লক্ষ্য করলেন টুকুনেব চোখ মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

তিনি কি বুঝতে পেরে বললেন, না না, তুমি আসবে বৈকি!

টুকুনেব মুখ চোখ ফের এটুকু বলে লক্ষ্য করতেই বুঝলেন, যে রক্তশূন্যতা সহসা তিনি দেখতে পেয়ে ছিলেন, একথাব পর তা আবার কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি এবাব বললেন, বোজ আসবে না। ওব তো এখন অনেক কাজ। পড়াশোনাটা আবার আরম্ভ কবতে হচ্ছে। সকালে ইন্দ্র আসে। বিকেলে ওকে ইন্দ্র গাড়ি চালানো শেখায়। বুধবার সন্ধ্যায় টুকুন ক্লাবে সাঁতার শিখতে যায়। সোমবার রাতে গীটার বাজনা শিখছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ খুব ব্যস্ত টুকুন। টুকুনের ভাল তো তুমি চাও। তুমি বরং এক কাজ করো। রবিবার বিকেলে তুমি আসবে। টুকুন সেদিন ফ্রি থাকার চেষ্টা করবে। কি বলিস টুকুন!

এসব শুনে টুকুনেব মা কি যে করবে ভেবে পাচ্ছিল না। মানুষটা যে দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে। কোথাকার কে একটা ছেলে—তাকে মুখের ওপর বলতে পারছে না, না তুমি আসবে না। কি অসহায় চোখ মুখ মানুষটার। টুকুনের মার এসব ভাবতে ভাবতে মাথাটা কেমন গরম হয়ে যাচ্ছে। ওর নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছিল। মেয়েটাকে এভাবে একটা অপোগণ্ড মানুষের সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছে! মান সম্ভ্রম বলে কিছু নেই আর কি আশ্চর্য মানুষটা, সুবলের সংগে কথা বলছে ঠিক সমকক্ষ মানুষের মত।—তুমি সুবল এখন কি

করছ ? আহা ঢং ! সে নিজের কাপড়ের আঁচল অস্থির বসে একবার আঙ্গুলে জড়াচ্ছে আবার খুলছে। ওপরের সিলিং ফ্যানটা পর্যন্ত তাকে ঠাণ্ডা করতে পারছে না। ঘড়িতে সাতটা বাজে। চার পাশে নানা রকম আলো জ্বলছে। দেয়ালে সব বিচিত্র ছবি। নানা রঙের ছবি। কোথাও বাঘ হরিণের পেছনে ছুটছে। কোথাও শিকারী, টুপি খুলে গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার কোন ছবিতে সূর্যের রং চড়া। আর সূর্য ওঠার নাম নেই অথচ একদল রাজহাঁস জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। এবং ঝাড় লণ্ঠনে একটা চড়ুই পাখি, আলো আঁধারের খেলায় এসময় বেশ মেতে গেছে। ঠিক নীচে জেব্রার মুখে সুবল, সে এসেছিল টুকুন দিদিমণির কাছে এবং এভাবে এক পবিত্র মুখ মহিমময় হয়ে দেখা দিলে চড়াই পাখিটা ডাকতে ডাকতে কার্ণিশে গিয়ে বসল।

এটা চড়াই পাখি না সুবলের পাখি রাতের বেলায় টের পাওয়া কঠিন। এবং কঠিন বলেই পাখিটা নিজের খুসীমত কার্ণিশে বসে বেশ ডেকে চলেছে। সে বুঝতে পারছিল বুঝি বেচারা টুকুনের মা বেশ বিপাকে পড়েছে। এই বিপাক থেকে রক্ষা পাবার কি যে উপায় স্থির করতে না পেরে খুব অস্থির-চিত্ত হয়ে গেছে।

এবং এভাবে টুকুনের সঙ্গে মাত্র ররিবার এক বিকেল, একটা বিকেলই মাত্র সুবল থাকে তার সঙ্গে। সপ্তাহে এসময়টা টুকুনেব খুব মনোরম। সে যেন এসময়টার জন্য সারাটা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকে। আজ শনিবার ইন্দ্র ওকে রেড রোডে নিয়ে এসেছে। রেড রোডে ইন্দ্র গাড়ির ষ্টিয়ারিং টুকুনের হাতে দিয়ে বেশ চুপচাপ বসে আছে। টুকুন নানাভাবে বেশ অনায়াসে গাড়ি চালাতে পারছে বলে ইন্দ্রের ভাবনা কম। আর টুকুন সেই স্ল্যাকস এবং ঢোলা ফুলহাতা সার্ট অর্থাৎ ফুলফল আঁকা সিল্কের পাতলা পোষাক পরে বেশ অনায়াসে গাড়ি চালিয়ে মাঠের চারপাশে, কখনও গঙ্গার ধারে ধারে আবার এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসের পাশ দিয়ে এসে মেডিকেল কলেজ ঘুরে সোজা

ফুলবাগান পার হয়ে ভি-আই-পি। তারপর আরও সোজা লেক টাউন, কৃষ্টপুর এবং দমদম বিমান ঘাঁটি ডাইনে ফেলে কোন গ্রামের ভিতর গাছের ছায়ায় সহসা গাড়ি থামিয়ে দিলে মনেই হয়না কিছু কাল আগেও এ মেয়ের কথা ছিল মরে যাবে। আগামী শীতে অথবা বসন্তে মরে যাবে। সুবল এসে ঠিক এক যাদুকরের মত তাকে কি করে যে ভাল করে তুলেছে?

এভাবে টুকুন আজ বিশ্বাসই করতে পারে না, তার একটা অসুখ ছিল। সে যে শুয়ে থাকত সব সময় এবং হেঁটে যেতে পারত না, এমন কি দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না, কিছুতেই সে তা বিশ্বাসই করতে পারে না। সে যেন এমনই ছিল। তার কথা ছিল অনেক দূর যাবার। ঠিক মানুষের খোঁজে সে আছে। ইন্দ্র চেষ্টা করছে ওর পাশে পাশে থাকার। কিন্তু ইন্দ্রকে সে এখনও তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। ইন্দ্রকে পাত্তা দিলে মা খুব খুশী হবে—অথচ সে কেন যে পারে না। বেশ এই যে গাছের নীচে সে এবং ইন্দ্র বসে আছে, ইন্দ্র ফ্ল্যাকস থেকে টুকুনকে চা ঢেলে দিচ্ছে, সবটাই কেমন আলগা মানুষের মত ব্যবহার। এবং চা ঢেলে দেবার সময় ইন্দ্র দেখল, কি সুন্দর আঙুল, চাঁপার ফুলের মত ছুঁয়ে দিলেই কেমন মলিন হয়ে যাবে—আর বাহুতে কি লাবণ্য—এবং টুকুনকে এত বেশি ঐশ্বর্যময়ী মনে হয় যে, একটু ছুঁতে পেলেই—সব হয়ে যায়—সে এই ভেবে টুকুনের পাশে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলে, টুকুন বলল, তুমি আমাকে একজায়গায় নিয়ে যাবে?

—কোথায়?

এমন একটা জায়গা, যেখানে কেবল ফুল ফোটে।

—জায়গাটা কোথায় আমার চেনা নেই।

সুবল সেখানে থাকে।

—সেই ফুলয়ালা সুবল!

সেই ফুলয়ালা সুবল, কথাটা তার ভাল লাগে না! সুবল সম্পর্কে

সে আরও কিছু বলতে পারত, কিন্তু ইন্দ্র এই নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করবে। মাকে গিয়ে বলবে। সুবলকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা তার ভাল লাগে না। মার কাছে সুবল ভীষণ একটা শয়তানের মত। সুবলকে কি ভাবে জব্দ করা যায়, অথবা সুবল একটা উইচ্, সে মন্ত্রের দ্বারা বশ করেছে টুকুনকে, এসব গ্রাম্য লোকেরা নানারকমের তুকফাক জানে, এমন এক সুন্দর রূপবতী কন্যা আর ধন দৌলত দেখে টুকুনকে সুবল বশীকরণ করেছে, এসব মা সব সময় ভেবে থাকে। আত্মীয় স্বজনের কাছে মা এসব বলে না। কেবল ইন্দ্রের বাবা এলে মা সব বলে। কি যে করা এখন! কারণ মার ইচ্ছা কোন শুভ দিনে ইন্দ্র এসে ওর হাত ধরুক এবং এই যে কলকাতা শহর, রাস্তা ঘাট, অথবা মেমরিয়েল —কখনও কখনও উটকামাণ্ড একটা বড় নীল উপত্যকায় ইন্দ্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, এসব হলেই মা ভাবে টুকুন নিরাময় হয়ে যাবে। টুকুনের একটা অসুখ ছেড়ে আর একটা অসুখ এবং এটা মার কাছে ভীষণ অসুখ। বরং মার ইচ্ছা টুকুন আবার শুয়ে থাকুক, সে আর উঠতে না পারলে কোন কষ্টই যেন নেই তার, তবু যে পারিবারিক সম্ভ্রম বজায় থাকে। মেয়েটা যা করছে, কিছুতেই পারিবারিক সম্ভ্রম আর রাখা যাচ্ছে না। মার হতাশ মুখ দেখলে টুকুন তা টের পায়।

টুকুন দেখল, বেশ একটা জায়গা, এমন নিরিবিলি জায়গায় তার বসে থাকতে ভাল লাগে। কাল সুবল আসবে। সুবল বলেছে, একটা বাওবাবের চারা পেলেই লাগিয়ে দেবে তার উপত্যকায়। এবং গাছটা ডাল পালা মেলে ধরলে টুকুনকে নিয়ে যাবে। টুকুনকে এসেই যা সব গল্প করে তার ভিতর থাকে, কেবল বুড়ো মানুষটা। নদীতে যে সে সাঁতার কাটে তাও বলে থাকে এবং কখনও তার কিছু ভাল না লাগলে নদীর ওপারে যে বন আছে, বনের ভিতর সে একা একা হেঁটে বেড়ায়—সে সব কথাও বলে।

অথবা টুকুনের ভারি সুন্দর লাগে যখন সুবল বলে, মাঠের ভিতর

শীতের জ্যোৎস্নায় ভাত ডাল রান্না ও মাছের ঝোল রান্না। জ্যোৎস্নায় কলাপাতা বিছিয়ে ঘাসের ওপর খাওয়া ভারি মনোরম। এসব বললে, টুকুনের সেই ছোট্ট রাজপুত্রের মতই মনে হয়, সুবল এমন একটা দেশের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে যেখানে তাকে আজ হোক কাল হোক চলেই যেতে হবে। সুবল কলাপাতা কেটে আনবে গাছ থেকে, সে ডাল ভাত রান্না করবে। রান্না করতে সে ঠিক জানে না। সুবল তাকে ঠিক শিখিয়ে নেবে। সে যা জানে না সুবলের কাছে জেনে নেবে বিকেল হলে সে এবং সুবল যাবে নদীতে। কোন মানুষ-জন না থাকলে নদীর অতলে ডুবে ডুবে লুকোচুরি খেলতে তার ভীষণ ভাল লাগবে।

ইন্দ্র দেখছে, টুকুন অনেকক্ষণ কিছু কথা বলছে না। কেমন চোখ বুজে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে।

ইন্দ্র বলল, কি ভাবছ টুকুন?

—ভাবছি, সুবল এখানে কোথায় বাওবাব পাবে?

—ইন্দ্র বলল, বাওবাব মানে?

—বা তুমি জান না, বাওবাব এক রকমের গাছ, খুব পাতা, ওর শেকড় অনেকদূর পর্যন্ত চলে যায়।

এমন গাছের নাম তো আমি জীবনে শুনিনি বাবা।

—টুকুন কেমন অবাক হল, বলল, বলছ কি, তুমি বাওবাব গাছের নাম জানা না! সে কি!

ইন্দ্র বলল, সুবল তোমার মাথাটি বেশ ভাল ভাবে খেয়েছে।

—তুমি ইন্দ্র যা জান না, তা বলবে না।

—তবে কে এসব খবর দিচ্ছে তোমাকে।

—কে দেবে? বইয়ে এসব লেখা আছে।

—কোন বইয়ে?

টুকুন ওর সেই বইটার নাম করলে ইন্দ্র বলল, ওগুলো রূপকথা।

টুকুন বলল, মানুষের জীবনটাতো রূপকথার মত। তাই না!

এই যে সুবল কে কোথাকার মানুষ, এখন ফুলের গাছ কেবল লাগায়। কতরকমের সে ফুল নিয়ে আসে।

ইন্দ্র কেমন ক্ষেপে গেল এসব শুনে। মাসিমা ঠিকই বলছেন, তোমার একটা অসুখ সেরে আর একটা হয়েছে।

টুকুন লাফ দিয়ে উঠে বলল—সেটা কি?

—এই যে তুমি সব রূপকথা বিশ্বাস করছ।

—তোমরা বুঝি কর না?

—আমরা কি করি আবার?

—অনেক কিছু কর। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ভাবছে মা।

ইন্দ্র এবার কেমন মিউ মিউ করে জবাব দিল, সেটার সঙ্গে রূপ কথার কি মিল আছে?

—মায়ের কাছে এটা রূপকথার সামিল। মা তোমাকে নিয়ে খুব স্বপ্ন দেখছে। অথচ জানো, মা জানে না, আমি বিয়ে খা করছি না।

—সেটা তোমার ইচ্ছায় হবে বুঝি?

—কার ইচ্ছায় তবে?

—মাসিমা মোসোমশাইয়ের।

টুকুন উঠে দাঁড়াল। কি যেন খুঁজছে মত। সে বলল কোথায় যে সুবল বাওবাব পাবে! নদীটা ওর ফুলের জমি ভেঙ্গে নিচ্ছে। বাওবাবেব চারা নদীর পাড়ে পাড়ে লাগিয়ে দিতে পারলে খুব ভল হত। ওর শেকড় অনেক দূর চলে যায়। ছোট্ট গ্রহাণুর পক্ষে যা খুব খারাপ পৃথিবীর পক্ষে তা খুব দরকারী।

১৮

রাত থাকতেই সুবলের ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস। তখন আরও চার পাঁচ জন লোক আসে। ওরা একসঙ্গে কাচি দিয়ে চার পাশ থেকে, যে সব ফুল ঠিকমত ফুটে গেছে, আর বড় হবে না, সে-সব ফুল তুলে নেয়। প্রত্যেকের সঙ্গে বেতের ঝুড়ি থাকে। ফুলটা রেখে দেবার সময় খুব যত্নের দরকার হয়। রাস্তায় চার পাঁচটা ছোট গাড়ি থাকে। গাড়িগুলো ছোট রেলগাড়ির মত দেখতে। গাড়িতে বেশ নানাভাবে চৌকো মত ঘর। এবং এক একটা ঘরে ছোট ছোট ফুলের চুবড়ি সাজানো। কেবল রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলো সে আঁটি করে বেঁধে রাখে। মাঝে মাঝে ফুলের ওপর জল ছিটিয়ে দিতে পারে। সে অন্ধকারেই বুঝতে পারে কোথায় কে কি করছে। বেশ বড় এই ফুলের উপত্যকা। নদী ঢালুতে নেমে গেছে। নদীর পাড়ে দাঁড়ালে লাল ইটের দেয়াল এবং টালির ছাদের ঘরটা আশ্চর্য মায়াবি মনে হয়। সে অন্ধকারেও টের পায় জল তুলে আনছে সবুর মিঞা। সে ভাড়ে জল আনছে। নিতাই তোলা ফুলে জল দিয়ে যাচ্ছে। কালু এখন তৈরি, যাবে ষ্টেশনে ফুল নিয়ে। সে অবশ্য ইচ্ছা করলে গাড়ি নিয়ে শহরে চলে যেতে পারে। কখনও কখনও দেরি হয়ে যায়, তখন অন্য জায়গা থেকে ফুল চলে আসে, ফুলের দাম ঠিক ঠাক পাওয়া যায় না। ভোর রাতে যে গাড়িটা যায়, এবং যে গাড়িতে এ অঞ্চল থেকে ডাব, মুরগি, হাঁস ডিম যায় শহরে, সেই গাড়িতে সুবল তার সব ফুল তুলে দেয়। দালালদের ফুল দিলে সে ঠিক পড়তা করতে পারে না। মোটামুটি ফুলের কারবারে অনেক মানুষ জন খাটছে। এবং মাইল দুই গেলে, এক জনপদ গড়ে

উঠেছে। ফুল সব মানুষদের—এ অঞ্চলের, এমন কি যারা শহরে গেছিল—তারা পর্যন্ত ফিরে এলে তাদের নিয়ে বেশ একটা ফুলের চাষ বাস করে দিলে বুড়ো মানুষটা খুব খুশী।

সে বুড়ো মানুষটার জন্য একটা বড় কাঞ্চন গাছের নীচে বেদি বাঁধিয়ে দিয়েছে। দিনের নামাজ বুড়ো সেখানে করে নেয়। রাতেও সেখানে মানুষটা নামাজ পড়ে। এবং চার পাশে থাকে তখন সাদা কাঞ্চন ফুল। বিকেলে কোন কোন দিন গাড়িতে ফুল যায়। তখন সুবল বেশ সুন্দর একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পায়ে সাদা কেড্‌স এবং হাতে কিছু রজনীগন্ধা নিয়ে যখন গাড়ির মাথায় বসে থাকে, বুড়ো মানুষটার মনে হয়, সুবল যাচ্ছে ফুলের গাড়ি নিয়ে—সুবল না হলে এমন একটা ফুলের গাড়ি কে যে চালায়। যখন দু পাশের মাঠ এবং ঘাস মাড়িয়ে গাড়ি যায়, সাদা কাঞ্চন গাছটার নীচে সে দাঁড়িয়ে থাকে। ভীষণ এক উজ্জ্বল রোদ খেলা করে বেড়ায়। নদী থেকে হাওয়া উঠে আসে। এবং সুন্দর এক জীবন। এ-ভাবে যখন মানুষেরা টের পায় ফুলের জমিটা ওদের—কি আপ্রাণ উৎসাহ তাঁদের তখন পরিশ্রম করায়।

কোনো কোনোদিন সে ফুল নিয়ে ষ্টেশনে যায় না। দুপুরের খাবার অথবা রাতের খাবার এখন কালু তৈরি করে দেয়। সে যতটা সময় এ-সব করবে, ততটা সময়ই তার নষ্ট। সে চাষাবাসের কথা তখন ভাল করে ভাবতে পারে না। সেজন্য সে যখন বিকেলে চুপচাপ ফুলের উপত্যকা ধরে হেঁটে যায় তখম চারপাশের সব কিছু কেমন মহিমময় হয়ে যায়। সে এ-ভাবে একটা নিজের পৃথিবী গড়ে তুলেছে। সবাই চায় তার নিজের একটা পৃথিবী থাক। সবাই চায় সেই পৃথিবীর সে রাজা হয়ে থাকবে। যেমন বুড়ো মানুষটা ফুলের চাষ সম্পর্কে প্রায় রাজার মত, যেমন জনার্দন চক্রবর্তী তার বিশ্বাস সম্পর্কে প্রায় ঈশ্বরের সামিল—সুবল যেমন একসময় ভাবিত, টুকুন দিদিমণি মরে যেতে পারে, এমন মেয়ে অসময়ে মরে গেলে ভীষণ কষ্টের।

এবং এ ভাবে সে যখন চার পাশে তাকায়—দেখতে পায় সব রাস্তার ধারে ধারে গন্ধরাজ ফুল। গ্রীষ্মকাল চলে যাচ্ছে। বর্ষা আসছে। ক'দিন আগে খুব বৃষ্টি হয়েছে। ফল ফুলের গাছগুলো ভীষণ তাজা। সে নতুন কলম করছে গোলাপের। গোলাপের ডাল কেটে সে মাথায় গোবর ঠেসে দিয়ে কাদামাটিতে পুতে রেখেছে। সামান্য বৃষ্টি পেয়ে কাটা ডালগুলো কুঁড়ি মেলেছে। সে এ-সব দেখতে দেখতে যায়। এখানে রাস্তার দুপাশে সব বড় বড় গন্ধরাজ ফুলের গাছ। গাছের পাতা কি আশ্চর্য সবুজ! এবং চারপাশে গাছের সাদা ফুল। নীচে নুড়ি বিছানো পথ। বৃষ্টিতে এতটুকু কাদা হয় না। সবুজ ঘাস রাস্তার ওপর। এবং হেঁটে টের পাওয়া যায় বুড়ো মানুষটার টালির বাড়িটা অথবা ওর ঘরটা এবং এই চাষবাস মিলে জায়গাটা যেন একটা পুরানো কুঠিবাড়ি হয়ে গেছে। কত সব আশ্চর্য কীট পতঙ্গ উড়ে এসে বাসা বেঁধেছে। কিছু সোনা পোকা পর্যন্ত সে এই ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছগুলোর চারপাশে আবিষ্কার করেছিল। এবং এখানে উড়ে এসেছে নানাবর্ণের পাখি। আর এসেছে ছোট্ট সব খরগোস, কাঠবিড়ালি। এখানে এসে যেই সবাই জেনে ফেলেছে—সুবলের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা খুব আনন্দের।

আর এভাবেই সুবল তার এই পৃথিবীতে ছোট্ট রাজপুত্রের মতো বেঁচে থাকতে চায়। সে আর যায় না, টুকুন দিদিমণির বাড়িতে। সে টের পায় তাকে নিয়ে ভীষণ একটা ঝড় উঠেছে টুকুন দিদিমণির বাড়িতে। সে টের পেয়েই গত দু রোববার একেবারে ডুব মেরেছে। এমন কি বড় শহরে ফুল নিয়ে গেলে পাছে তার লোভ হয় একবার টুকুন দিদিমণির সঙ্গে দেখা করার, সেজন্য সে নিজে আর শহরে যাচ্ছে না। স্টেশন পর্যন্ত গিয়েই ফিরে আসে। ফুলের সব বিক্রি-বাট্টা, যারা কাজ করে তাদের ওপর। ওর যেন কেবল ইচ্ছা সে কত বড় ফুল আর কত বেশী ফুল চাষবাস করে তুলতে পারছে, এবং এ-ভাবে

সে সবার জন্য এবং নিজের জন্য অর্থাৎ এই যে ঈশ্বর পরিশ্রমী হতে বলছে, সে কতটা পরিশ্রমী হতে পারে তার যেন একটা প্রতিযোগিতা। বস্তুত সে চাইছিল কাজের ভিতর ডুবে গিয়ে টুকুন দিদিমণির কথা ভুলে যেতে।

সুতরাং বিকেল হলেই যখন তার লোকেরা গাছে গাছে জল দিয়ে যায়, যখন জমির আগাছা বেছে নবীন উঠে দাঁড়ায় এবং বুড়ো মানুষটার ছবি কাঞ্চন ফুলের গাছটায় ছায়ায় ভেসে ওঠে—তখন সে গাছের পাতায় পাতায়, ফুলের পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে জীবনের সৌরভ খুঁজে বেড়ায়। ভাবতে অবাক লাগে টুকুন দিদিমণির ওপর তার ভীষণ একটা লোভ আছে। ঠিক সেই অজিতদার স্ত্রীয় মত যেন। এবং এ-ভাবে সে মাঝে মাঝে নিজেকে ভীষণ অপরাধী ভেবে ফেলে। যত তার বয়স বাড়ছে, টুকুন দিদিমণির ওপর তত তার লোভ বাড়ছে। এবং এটা টের পেলেই সে আর এইসব ফুলেরা যে সৌরভ নিয়ে বেঁচে থাকে তা মনে করতে পারে না। এবং শেষটায় সে দিশেহারা হয়ে গেলে কঠিন অসুখের ভিতর যেন সেও পড়ে যাবে। সে বলল, যেন নিজেকে শুনিয়ে বলল—আমি খুব খারাপ মানুষ টুকুন দিদিমণি। এতদিনে আমি এটা টের পেয়েছি।

আর তখনই সেই উপত্যকার ওপাশে যে একটা বড় রাস্তা চলে গেছে, মনে হল সেই রাস্তায় একটা গাড়ি এসে থেমেছে। এখন বিকেল। সূর্যাস্তের সময় গাছ পালার ভিতর দিয়ে রোদ লম্বা হয়ে পড়েছে। গাড়িটা নীল রঙের। ভীষণ ঝকঝকে। আর সূর্যাস্তের বেশী দেরি নেই। ফলে সূর্য তার আশ্চর্য লাল রং নিয়ে এক্ষুনি গাছপালার ওপর ছড়িয়ে যাবে। এবং এমন একটা সৌন্দর্যের ভিতর হাল্‌কা সিল্‌কের পোশাক পরে যদি কেউ ফুলের উপত্যকায় নেমে আসে—যেখানে কেউ নেই, আছে সুবল, আর বুড়ো মানুষটা, তার যত রাজ্যের নানাবর্ণের ফুল, নদীর নির্মল জল। ওপারে বন। বনের

গাছপালা যখন ভীষণ নিবিড় তখন সুবল অপলক না তাকিয়ে থাকে কি করে। ক্রমে অনেকটা হেলে দুলে সে যেন চলে আসছে। সুবল দৃশ্যটা বিশ্বাস করতে পারছেনা। তার কাছে কিছুটা স্বপ্নের মত লাগছে। সে চোখ মুছে ভাল করে দেখছে সব। সে মুগা রঙের পাঞ্জাবী পরেছে। পায়ে তার ঘাসের চটি, এবং সে আজ ধুতি পরেছে। বিকেল হলেই স্নান করার স্বভাব সুবলের। সে বেশ পরিপাটি সেঁজেগুজে যখন নদীর ঢালুতে একটু চুপচাপ বসে থাকবে ভাবছিল, যখন ফুলের গাড়িটা টংলিং টংলিং শব্দ তুলে মাঠের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তখন কিনা আশ্চর্য সুন্দর এক মেয়ে, প্রায় যেন রাজকন্যার সামিল, পায়ের গোঁড়ালিব ওপর সামান্য শাড়ি তুলে প্রায় যেন ধীরে ধীরে উড়ে আসছে।

সুবল কাছে এলেই বুঝতে পারল, টুকুন দিদিমণি।

সুবল এবাব হাত তুলে গন্ধরাজের ডাল ফাঁক করে ডাকল টুকুন দিদিমণি।

টুকুন, চারপাশে তাকাল সে সুবলকে দেখতে পাচ্ছে না। সুবল যে গন্ধরাজ ফুলের গাছগুলোর ভিতর চুপচাপ অদৃশ্য হয়ে আছে টুকুন টের পাচ্ছেনা। সে চিৎকার করে বলল, সুবল তুমি কোথায়?

—আমি এখানে টুকুন দিদিমণি।

—আমি যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনা সুবল।

—তুমি আমাকে দেখতে না পেলে হবে কেন। কাছে এস। কাছে এলেই টের পাবে আমি ঠিক এখানে আছি।

কি ভীষণ প্রতীক্ষায় মগ্ন চোখ মুখ টুকুনের। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল কেবল ফুল আর ফুল। কত যে ফুল ফুটিয়ে রেখেছে সুবল। সুবল যে গন্ধরাজের গাছগুলোর পাশে পাশে হাঁটছে টুকুন টের পাবে কি করে। সেতো কেবল দেখছে, ফুল আর ফুল। আর দেখছে, বড় একটা কাঞ্চন ফুলের গাছ। সাদা ফুলে ছেয়ে আছে। নীচে পরিপাটি

করে কিছু বিছানো। এবং বুড়ো মত একজন মানুষ বসে আছে। বরফের মত সাদা দাড়ি, পরিপাটি সাদারঙ গায়ে লম্বা আলখেল্লা, পরনে খোপকাটা লুঙ্গি মাথায় সাদা টুপি। হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে। মুখ কি প্রসন্ন! হাত সামনে রেখে সে আছে মাথা নীচু করে। চুল এত সাদা যে দূর থেকে একটা বড় কদম ফুলের মত লাগছে। আর আশ্চর্য মানুষটা ওর গলার স্বরে এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না। মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। নিবিষ্ট মনে বুঝি ঈশ্বর চিন্তা করছে। এমন ঈশ্বর চিন্তা মানুষের এখন থাকে সে যেন টুকুনের জানা ছিল না। সে বুঝতে পারল—এই সেই বুড়ো মানুষ। সুবল যার গল্প কতবার করেছে। বলেছে, টুকুন দিদিমণি আমার দেশটা তোমার রাজপুত্রের ছোট্ট গ্রহাণুব চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়।

টুকুন দেখল, সত্যি এটা একটা আলাদা দেশ। যেন দুঃখ দৈন্য বলে এখানে কিছু নেই। কেবল ফুলের আশ্চর্য সৌরভ। এবং এই সৌরভের ভিতর বসে আছে এক বৃদ্ধ মানুষ। টুকুন মুখে আঙ্গুল রেখে ইসারা করল অর্থাৎ যেন বলছে এটা ঠিক হবে না সুবল, মানুষটা প্রার্থনায় মগ্ন তখন এস তুমি আমি বসে ওকে চুপচাপ দেখি।

আর তখন সুবল এসে পাশে বসলে বেশ সুন্দর দৃশ্য তৈরি হয়ে যায়। এক বুড়ো মানুষ, বয়স যে কত, কে জানে তার সঠিক বয়স কি, সে নিজেও হয়ত জানে না, তার বয়স বলে কিছু আছে, এই পৃথিবীর যেন সে আদিমতম মানুষ, সুন্দর করে এই পৃথিবীর শেষ রস গন্ধ শুষে নিচ্ছে। এখন তাকে দেখলে এমনই মনে হয়।

কিছু কাঞ্চন ফুলের পাঁপড়ি তখন ঝরে পড়ছিল ওদের ওপর। হাওয়ায় দুটো একটা পাঁপড়ি বেশ উড়ে উড়ে দূরে চলে যাচ্ছে। কেমন একটা বাতাসের হিল্লোল। ক-দিন আগে বৃষ্টিপাতের দরুন দারুণ সবুজ আভা, এবং তার ভিতর অজস্র ফুলের সুবাস এসে যেন যথার্থ এক অন্য গ্রহাণু সৃষ্টি করছে।

আর তখন সেই মানুষ যদি চোখে দেখতে পেত তবে দেখত একটা ছবির মত মেয়ে ঘাসের ওপর বসে আছে। স্থির। নিশ্চল। এতটুকু নড়ছে না। সুবলকে পর্যন্ত চেনা যাচ্ছে না। সুবল যে সত্যি সুমগ্ন তবে বুড়োমানুষটা তা বুঝতে পারত। অথচ আশ্চর্য বুড়ো মানুষটা বুঝতে পারছে সামনে সুবল এবং একটা মেয়ে বসে আছে। চাষবাসের এই যে ফুল ফল, এবং পাশের সবুজ গন্ধ, সব মিলে এই মেয়ে কি যে মহিমময় মনে হচ্ছে। সে যেন তার ঈশ্বর চিন্তায় এমন এক জগৎ আবিষ্কার করে ফেলে তন্ময় হয়ে যায়! কোন দুঃখ থাকেনা সেখানে কোন জড়া নেই। তার কাছে মানুষের ছোট খাট সুখ দুঃখেরও মানে বড় বেশী। সে সেই নিরাকার আবরণহীন অস্তিত্বের কথা যত বারই ভাবুক না কেন-কি জানি, কেন যেন সে বার বার সেখানে তার এই ফুলের উপত্যকাকেই আবিষ্কার করে ফেলে। এবং সে এ-ভাবে বুঝতে পারে তার কাছে সব চেয়ে সুন্দরতম জায়গা, এই ফুল, ফলের উপত্যকা। যা কিছু সুখ, যা কিছু আকাঙ্ক্ষা সব সে এর ভিতর ঈশ্বর প্রাপ্তিব মত টের পায়। সে কিছুটা অনুমানের ওপর বলল, তোরা।

—আমরা চাচা।

—এই তোর সেই মেয়েটা।

সুবল হাসল।—কোন মেয়েটা?

—যে মেয়েটা ভাবত, আর বাঁচবে না।

—হ্যাঁ চাচা সেই মেয়ে।

—এখন কি ভাবছ মেয়ে?

—আমি আপনাকে দেখছি। কিছু ভাবছি না।

টুকুন দুষ্টু মেয়ের মত কথা বলল।

—আমাকে। আমিঁতো বুড়ো মানুষ।

—বুড়ো মানুষ এমন সুন্দর হয় জানতাম না।

সুবল বলল, চাচা কিন্তু দেখতে পায়না।

টুকুন বলল, যাঃ।

—হ্যাঁ।

—তবে আমাদের যে বলল, তোরা!

—ওর আর একটা ইন্দ্রিয় তৈরি হয়েছে। সে টের পেয়ে যায়। তার এই নিজের হাতে তৈরি ফুলের উপত্যকাতে কে এল কে গেল। কোন গাছে কি ফুল ফুটেছে সে এই কাঞ্চন ফুল গাছটার নীচে বসে ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে।

টুকুন বলল, আমার অসুখ, আমি বাঁচবনা, আপনাকে এমন কে বলেছে।

বুড়ো মানুষটার যা স্বভাব, দাড়িতে হাত বোলানো এবং যেন এ-ভাবে বলে যাওয়া—টুকুন সুবলতো কাজের ফাঁকে জল আনার সময়, অথবা সব আগাছা বেছে দেবার সময় কেবল একজনের কথাই বলে থাকে—সেতো তুমি। তোমার নাম টুকুন দিদিমণি। তুমি বিছানাতে একটা মমির মত শুয়ে থাকতে। সুবলের মুখ দেখলে তখন বুঝতে পারতাম—সে নানাভাবে তোমাকে ভালো করার চেষ্টা করছে। ঠিক সে যেমন এই ফুলের উপত্যকায় এসে চারপাশে যা কিছু আছে, সব কিছু নিয়ে মগ্ন হয়ে গেল, তেমনি সে মগ্ন ছিল, তুমি কি কি করলে আনন্দ পাবে—সুবল কতভাবে যে তখন এই সব মাঠে বড় বড় নানা বর্ণের ফুল ফোটাবার চেষ্টা করেছে। সুবল তোমার জন্য সব চেয়ে দামী ফুলের গুচ্ছ নিয়ে যেত। এ-ভাবে আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। ঈশ্বরের পৃথিবীতে তুমি একটা অসুখে ভুগছিলে। অসুখটা ছিল তোমার মনের। তোমার বড় বেশী ছিল বিশ্বাসের অভাব। তোমার সব আকাঙ্ক্ষা মরে যাচ্ছিল। সুবল আবার তোমাকে আকাঙ্ক্ষার জগতে ফিরিয়ে এনেছে। এখন তোমার ভাবনা, মানুষ এমন আশ্চর্য পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় কি করে। সে কেন মরে যায়—কেমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে কেউ কোথাও এক দণ্ড থাকতে পারে

তোমার বিশ্বাস হয় না। এ-ভাবে আমি টের পেতাম—যে মানুষ, তোমাকে আকাঙ্ক্ষার জগতে ফিরিয়ে আনল—তার কাছে তুমি একদিন না একদিন আসবেই। কতদিন বলেছি তোর টুকুন দিদিমণিকে আসতে বলিস এখানে। দেখে যাক—পৃথিবীর আর একটা ছোট জায়গা আছে —যেখানে মানুষেরা কেবল ফুল ফোটায়। মানুষ তার নিজের স্বভাবেই সুন্দর পৃথিবী গড়তে ভালবাসে।

টুকুন বলল, চাচা তুমি সত্যি দেখতে পাওনা।

—যাঃ দেখতে পারব না কেন! এখন আমি সব চেয়ে ভাল দেখি। এতদিন যা আমার চোখের আয়ত্তে ছিল তাই দেখতাম। এখন তো আরও অনেক দূরের জিনিস এই ধর হাজার লক্ষ মাইল দূরে এই সৌরলোকের কোথায় কি আছে সব যেন নিমেষে দেখে ফেলি। সুবল আমাকে যে ছোট্ট রাজ পুত্রের গল্প শুনিয়েছিল আমি এখন তার মত এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে নিমেষে চলে যেতে পারি। কোন কষ্ট হয় না। না দেখলে কি করে টের পেতাম তুমি আজ আমার বাগানে এসেছ।

এ-ভাবে এক বুড়ো মানুষ তার ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে এখন সব কিছু দেখতে পায়। আগে সুবল ওর কোরান শারিফ পাঠের জন্য একটা ছোট্ট মত কাঠের র‍্যাক করে দিয়েছিল। বিকেল হলেই বুড়ো মানুষটা কাঞ্চন ফুলের গাছটার নীচে গিয়ে বসত। চোখে ভারি কাচের চশমা লাগিয়ে সে নিবিষ্ট মনে পড়ে যেত সুর ধরে। তার সে নানা রকম ব্যাখ্যা শোনাতো সুবলকে। সুবল বসে বসে শুনত সব। একটু মানাযোগের অভাব দেখলেই ধমক লাগাত। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থাকবে না কেন ঃ আল্লা ঈশ্বর তো আলাদা নন। সে সুর ধরে পড়ে গেলে ওর চোখে মুখে আশ্চর্য সুষমা ভেসে উঠত। এবং এ-ভাবেই এক এক করে শুবল যেন গোটা বইটার মানে জেনে ফেলেছিল। যেমন সে দেখেছিল জনার্দন চক্রবর্তী চণ্ডিপাঠ অথবা গীতাপাঠ করে সবাইকে

টু—১৫

তার ব্যাখ্যা শোনাতো এখানেও তেমনি কিছু হচ্ছে অথচ আশ্চর্য সব বাদ দিয়ে যা মনে থেকে যায়-সবটাই যেন মানুষের ভালোর জন্য বড় বড় মানুষেরা সব কাব্য রচনা করে গেছেন।

সুবল বলল, এখন সময় পাই না। এখন শুক্রবারে চাচার জন্য নীলপুর থেকে আসে আক্রম খাঁ। সে সারাটা দিন নামাজের ফাঁকে ফাঁকে চাচাকে কোরন পাঠ করে শোনায়।

টুকুন বলল, আর কি ভাবে দিন কাটে তোমার ?

—আমার এ-ভাবেই দিন কেটে যায়।

সুবল কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। পাশে টুকুন হাঁটছে। ফুলের সৌরভের কাছে টুকুন দিদিমণির দামী প্রসাধন কেমন ফিঁকে হয়ে গেছে। সে বলল, এটা শ্বেত করবী। বলে সে কটা ফুল হাতে তুলে নিলে টুকুন বলল, আমাকে দাও।

এবং টুকুন ফুল কটা নিয়ে খোঁপায় গুজে দিল। ববকাট চুলে আজ নকল চুল বেঁধে খোঁপা করেছে দিদিমণি। এবং খোঁপায় ফুল গুজে দিলে টুকুন দিদিমণিকে আর শহরের মেয়ে মনে হয় না, কেমন এক বনের দেবী হয়ে যায়। ওর বড় ইচ্ছা একদিন সে টুকুন দিদিমণিকে নিয়ে ও-পারের বনে যায়। এবং সারাদিন বনের ভিতর চুপচাপ বসে থাকা, অথবা গল্প, দিদিমণি আর কি কি নূতন বই পড়েছে, সুবল তো বই পড়তে পারে না, টুকুন দিদিমণির সঙ্গে দেখা হলেই নানা রকম গল্প শোনার ইচ্ছা এবং টুকুন দিদিমণি কি যে সব সুন্দর সুন্দর পৃথিবীর খবর নিয়ে আসে। তার ইচ্ছা বনের দেবীকে ঠিক একদিন বনে নিয়ে যাবে। এবং বনের ভিতর ছেড়ে দিয়ে সেই যে সে একজন কাঠুরের গল্প শুনেছিল, কাঠুরে রোজ কাঠ কাটতে যেত বনে, এবং দেখতে পেত এক ছোট্ট মেয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, সে মেয়েকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে যেত, ফলে তার কাঠ কাটা হত না, সে কাঠ না কেটেই চলে আসত এবং এভাবে সংসারে তার ভারি অভাব—অথচ সে

দেখে বনের ভিতর রোজই মেয়েটা রাস্তা হারিয়ে ফেলে, এবং তাকে গ্রামের পথ ধরিয়ে দিতে হয়। কাঠুরিয়ার কাঠ কাটা হয় না। এবং এভাবে কাঠুরিয়া জানে না, এক বনের দেবী তাকে নিয়ে খেলা করছে। তারপর সে অভাবের তাড়নায় আর বাড়ি ফিরে না গেলে একটা ফুলের গাছ দেখিয়ে বলেছিল ছোট্ট মেয়েটা একটা চাঁপা ফুল রোজ এ-বনে ফুটবে। সেটা তুই নিয়ে যাবি। সে কথামত চাঁপা ফুল বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখেছিল—চাঁপা ফুল স্বর্ণচাঁপা হয়ে গেছে। একটা ফুল বিক্রি করলে তার অনেক টাকা হয়ে যায়। সে রোজ বনে এসে সেই ফুলটা কখন ফুটবে সেজন্য বসে থাকে। বসে থাকতে থাকতে মনে হয়, এই বনের কোথায় যেন এক শ্রীহীন রূপ ফুটে উঠছে। সেই মেয়েটি, যে তাকে নিয়ে খেলা করে বেড়াতো তাকে না দেখতে পেলে বুঝি ভাল লাগে না, এই চাঁপা ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে সে রোজ রোজ কি করবে! সেই মেয়েটা তাকে যে এ-ভাবে বেল্লিক করে দেবে সে ভাবতেই পারে না। সে দেবীর দেখা পেয়েও পেল না। সে বলত, বনের দেবী তুমি আমার কাছে এমন ছোট্ট হয়ে থাকলে কেন! বনের দেবী তুমি আমাকে এমন লোভে ফেলে গেলে কেন। আমার যে এখন হাজার অভাব। বেশ ছিলাম মা জননী, কাঠ কাটা, কাটা কাঠ বেঁচে পয়সা, স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে মিলে আহার—তারপর সন্ধ্যা হলে আমার বউ পিঁদিম জ্বালাত। আমার সুখ ছিল, স্বস্তি ছিল, এখন মা জননী এত টাকা আমার, অথচ দ্যাখো বউটার রেলগাড়ি না হলে চলে না। এবং সেই গল্প মনে হলে সুবলের মনে হয় টুকুন দিদিমণি বনের দেবী হবে ঠিক, কিন্তু ছোট্ট মেয়ে সেজে তার লোভ বাড়াবে না। সে বলল, দিদিমণি ওপারে একটা সুন্দর বন আছে। যখন কিছু ভাল লাগে না, নদী সাঁতারে আমি ওপারের বনে উঠে যাই। চুপচাপ গাছের নীচে বসে থাকি।

এভাবে ওরা কথা বলতে বলতে অনেকদূর চলে এসেছে। সামনে

সেই ছোট্ট নদী। যেমন ছোট্ট উপত্যকা নিয়ে সুবলের ফুলের চাষ তেমনি ছোট্ট নদী নিয়ে, ছোট্ট একটা বন নিয়ে সুবল বেশ আছে। আর কি নির্মল জল নদীতে। টুকুন নেমে যাবার সময় দুপাশের জমিতে দেখল অজস্র অপরাজিতা ফুটে আছে। নানা রকম বাঁশের মাচান ছোট ছোট। সেখানে ফুলের লতা বেয়ে বড় হচ্ছে, সজীব হচ্ছে। একেবারে সবুজ রঙ, ফুলের রঙ নীল, ভিতরটা শঙ্খের মত সাদা। এবং টুকুনের ইচ্ছা হল এ-ফুলের একটা লম্বা মালা গাঁথে। ফুলেব সৌরভ নেই কোন। অথচ কি সুন্দর নরম ফুলের মালা! এমন মালা হাতে গলায় পরে, সর্বত্র ঠিক নুপুরের মত বেঁধে রেখে কেমন সেই যেন শকুন্তলা প্রায় তপোবনে তার ঘুবে বেড়ানো। টুকুন বলল, আমি নদীতে সাঁতার কাটব।

—এত অবেলায় সাঁতার কাটলে অসুখ হবে।

টুকুন বলল, আমি তুমি সাঁতার কেটে সুবল ওপাবে উঠে যাব। বনের ভিতর হারিয়ে গিয়ে দেখব, কি কি গাছ আছে। তুমি গাছেব নাম বলে যাবে, আমি গাছ চিনে রাখব। কত বড় হয়েছি, অথচ গ্যাখো কোনটা কি গাছ ঠিক চিনি না।

সুবল বলল, বনের ভিতর গেলে আমার কেবল ভয় হয় তুমি বন-দেবী হয়ে যাবে।

—তা হলে কি হবে?

—তুমি আমাকে লোভে ফেলে দেবে।

—সে আবার কি!

—সে একটা লোভ। সোনার চাঁপা ফুল। পেলে আর ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয় না। তখন অসুখটা বাড়ে।

টুকুন দেখেছে, সুবল চিরদিন এ-ভাবেই কথা বলেছে। কথায় কেমন হেঁয়ালি থাকে, সে কখনও ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অথচ মনে হয়, সুবল যা বলে তা সত্যি। সে সঠিক মানে না বুঝলেও

সুবলের কথা শুনতে তার চিরদিন ভাল লাগে। সে বলল, সোনার চাঁপা ফুলটা কি?

—সে একটা লোভ দিদিমণি।

—সেটা কি?

—সেটা একটা কাঠুরিয়ার গল্প।

—কে বলেছে?

—আমাদের বুড়া কর্তা।

—তবে শুনতে হয়। বলে সে শাড়ি সামান্য তুলে নদীর জলে সামান্য নেমে গেল। বালির জন্য পা দেবে যাচ্ছে না। কি সুন্দর আলতা পরেছে টুকুন দিদিমণি। জলের নীচে পায়ের পাতা মাছরাঙ্গার মত দেখাচ্ছে। সুবল এমন দেখলেই কেমন লোভে পড়ে যায়। ওর শরীর ফুলের সৌরভের মত কাঁপে। সে টের পায় চোখ মুখ কেমন জ্বালা করছে। কিন্তু টুকুন দিদিমণিকে সে কেন জানি ছুঁতে ভয় পায়। কি সব আশ্চর্য সুবাস শরীরে মেখে রাখে। কি নরম সিল্ক পরে থাকে, আর কি রঙবেরঙের লতাপাতা আঁকা পোশাক! সবটা এমন যে সে ভাল করে চোখ তুলে কখনও কখনও দেখতে ভয় পায়। এবং এমন হলেই সে বলে, বেশ ছিল কাঠুরিয়া। টুকুন একটু জল অঞ্জলীতে নিয়ে কি দেখে ফেলে দেবার সময় বলল, কি দেখছিল?

—এই তোমার বেশ ছিল। সে পরিশ্রমী মানুষ ছিল। কাঠ কাটত। কাঠ বিক্রি করত। কাঠ বিক্রির পয়সায় চাল ডাল এবং সবাই রাতে বেশ পেট ভরে খেত। তারপর কি ঘুম এল। কোন হুঁস থাকত না। সকাল হলে সে শরীরে ভীষণ জোর পেত। তার কোন রোগভোগ ছিল না।

টুকুন বলল, সে তবে সুখী লোক ছিল?

—খুব। সে নদী পার হত সাঁতরে। গায়ে তার অসুরের মত শক্তি। সে তার পরিশ্রমের বিনিময়ে খাদ্য পোশাক এবং আশ্রয়

পেত। একটু থেমে সে বনের দিকে চোখ তুলে কি খুঁজল। তারপর বলল, বুড়ো কর্তা বলেছে, এটাই নাকি ঈশ্বরের বিধান। তার পবিত্র পুস্তকে বুঝি এমনই লেখা আছে। সে এখানে একটু সাধু ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করল। কাঠুরিয়া ঈশ্বরের নিয়ম থেকে সরে গেল। বনদেবী তাকে লোভে ফেলে নিরুদ্দেশে গেল।

টুকুন দেখল কেমন উদাসীন চোখে সুবল ওকে দেখছে।

—কি দেখছ সুবল?

—তোমাকে দেখছি টুকুন দিদিমণি। কাঠুরিয়া তারপর থেকে ফুলটার জন্য রাতে ঘুম যেতে পারত না।

—আমাকে দেখে সেটা তোমার মনে হল?

—তোমাকে দেখে কিনা জানি না, আজকাল আমার মাঝে মাঝেই এমন হয়।

—সেজন্য আমাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছো!

—ছেড়ে ঠিক দিইনি। যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তোমার মা এ-জন্য ভীষণ কষ্ট পায়। কেউ কষ্ট পেলেই আমার খারাপ লাগে। বলে সে বালির চরের দিকে হেঁটে যেতে থাকল। ওপারের বনের ছায়া ক্রমে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ওদের দুজনের ছায়াও বেশ লম্বা হয়ে নদীর চর পার হয়ে যাচ্ছে। ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। একজনের শরীরে সব সহরের সুগন্ধ। অন্য জন ফুলের সৌরভ শরীরে মেখে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতেই বলা, কাঠুরিয়ার তখন বড় ভয়, সেই চাপা ফুলটা কে না কে চুরি করে নিয়ে যায়!

—কার আবার দায় পড়েছে—কে জানে যে বনে সোনার চাঁপা ফুটে থাকে।

—জানতে কতক্ষণ। সেতো ততদিনে লোভে পড়ে গেছে। সে শহরে যায়—স্যাকরার দোকানে ফুলটা বিক্রি করে, ওরা লোক লাগাতে পারে—ছাখো তো রোজ মানুষটা ফুল পায় কোথায়? সেজন্য সে রোজ

এক দোকানে চাঁপা ফুল বিক্রি করে না আজ শহরের উত্তরে গেলে, কাল দক্ষিণে। এভাবে সে চিন্তা ভাবনায় বড় উদবিগ্ন থাকে। সে একদিন দেখতে পায় আয়নায়, সব চুল পেকে যাচ্ছে, মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। সে কেমন অল্প বয়সে বুড়ো মানুষ হয়ে যাচ্ছে। আর যা হয় সে চাঁপা ফুলটা চুরি যাবে বলে, রাত না পোহাতে বনে চলে যায়। তারপর বনের পাতালতার ভিতর নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকে। চারপাশের পোকামাকড়েরা ওকে কামড়ায়। সে এটুকু ভ্রূক্ষেপ করে না। সেতো জানে না এভাবে লোভের কীটেরা তাকে দংশন করে ক্রমে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

সুবল এবার বালির চরে বসে পড়ল। এখন ওদের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ে নেই। বরং ছায়াহীন এক মাঠ, দূরাগত পাখির ডাকের মত তাদের কেমন নির্জন পৃথিবীতে যেন নিয়ে এসেছে। সুবলের যা হয়, এমন এক নিরিবিলি নির্জন পৃথিবীতে বসে থাকলেই বুঝি তার ভাল ভাল কথা বলতে ভাল লাগে। সেজন্য বোধহয় সাধু ভাষায় ক্রমে কথা বলতে পারলে ভীষণ খুসী হয়। সে বলল, টুকুন দিদিমণি কাঠুরিয়া দিন রাতের বেশী সময়টাই বাড়ির বাহিরে থাকত। সে যখন ফিরত শহর থেকে গাড়িতে তাকে বড় ক্লান্ত দেখাত। ফিরে এসে দেখত, বৌ তার রেল গাড়িতে চড়ে কোথায় গেছে। ছেলেরা বলত, মায়ের ফিরতে রাত হবে বলে গেছে বাবা।

টুকুন বলল, এভাবে সুখী মানুষটা পরিশ্রম ছেড়ে দিয়ে দুঃখী মানুষ হয়ে গেল।

—এভাবে টুকুন দিদিমণি মানুষটা কষ্টের ভিতর পড়ে গেল।

এবং এ-ভাবেই টুকুনের মনে হয় তার বাবাও একটা ভীষণ কষ্টের ভিতর পড়ে গেছে। বাবার জীবনের সঙ্গে কাঠুরিয়া জীবনের কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে। টুকুন বলল, জানো বাবার জন্য আমার ভারি কষ্ট লাগে। কাঠুরিয়ার মত বাবাও আমার দুঃখী মানুষ। বাবাও আমার

আরও কত গাড়ি, কত বাড়ি বানানো যায়—সেই আশায় একটা বড় রেলগাড়িতে চড়ে বসে আছে। কিছুতেই নামতে চাইছে না।

সুবল সহসা অন্য কথায় চলে এল। বলল, কোথায় যে একটা চারা পাই। ওটা পেলেই আমার এ-ফুলের উপত্যকা ভরে যাবে। আমার আর কিছু লাগবে না।

টুকুন বলল, আমিও গাছটা খুঁজছি। বাবাও খুঁজছেন।

কিন্তু কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ গাছটা আসলে পৃথিবীতেই নেই।

তারপর ওরা আর কোন কথা বলল না। চুপ চাপ বসে থেকে এই সব বন উপবনের নানারকম বর্ণাঢ্য শোভার ভিতর ডুবে গেল। ওরা শুনতে পাচ্ছে—কীটপতঙ্গেরা সব ডাকছে। পাখির নদী পার হয়ে যাচ্ছে। খরগোসেরা দল বেঁধে শস্যদানা খাবার লোভে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। আরও কত কি—কি যে আশ্চর্য মহিমময় এই পৃথিবী। অথচ কখন সোনার চাঁপা ফুটবে, সেই আশায় একটা গিরগিটির মত গাছের ডাল দেখছে কাঠুরিয়া। চারপাশে তার এত বড় পৃথিবী, আর এমন সুন্দর দিন গাছ পালার ভিতর বর্ণাঢ্য সব শোভা নিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, সে জানতেও পারছে না। লোভ তাকে সব কিছু থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।

টুকুনের আজ এখানে এসে কেন মনে হল, মানুষেরা ক্রমে গিরগিটি হয়ে যাচ্ছে। সুন্দর দিনগুলি তারা আর ঠিক ঠিক দেখতে পাচ্ছে না। কাঠুরিয়ার মত বনে জঙ্গলে শুয়ে আছে, কখন সোনার চাঁপা ফুটবে গাছে, আর খপ করে তুলে নেবে। তারা কিছুতেই পরিশ্রমী হবে না। পরিশ্রমী না হলে সুন্দর দিনেরা মানুষের কাছ থেকে ক্রমে সরে যায়।

এই ফুলের জগতে সুবলকে দেখে কেবল টুকুন কেমন এখনও সাহস পায়। সুন্দর দিনেরা ঠিক ঠিক কোথাও একদিন আবার এ-ভাবে ফিরে আসে। এবং এ-ভাবে মানুষেরা পৃথিবীতে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকে।

১৯

তখন শহরে মিছিল যাচ্ছে। মিছিলে স্লোগান—ঘোরাও চলছে, চলবে। স্লোগান আমাদের দাবি মানতে হবে।

বড় বড় লাল শালুতে দাবির ঘোষণা। বেশ বড় বড় করে লেখা—বেতনের একটা নিম্নতম হার।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে মিছিলের দিকে চেয়ে এক ভিখারিনী, পাগলিনী-প্রায়, ভীষণ হাসছিল। আব হেঁকে হেঁকে বলে যাচ্ছিল— দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।

মজুমদার সাহেবের ড্রাইভার বলল—স্যাব, আর এগুনো ঠিক উচিত হবে না।

মজুমদার সাহেবের ড্রাইভার খুব পুরানো লোক। এবং কি হবে না হবে সেটা তার মনে করিয়ে দেবার স্বভাব। সে বলল—মিছিল শেষ হলেই গাড়ি জ্যামে পড়ে যাবে।

মজুমদার সাহেব টুবাকো টানেন। পাইপে ধোঁয়া উঠছে না। তিনি বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে ফের কটা টান দিয়েও যখন দেখলেন ধোঁয়া উঠছে না, তখন কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। ক্লাবে আজ একটা বড় রকমের লাইসেন্সের লেনদেনের ব্যাপার আছে। ট্যাগুন সাব আসবেন। তাঁকে খুশি করার ব্যাপারও একটা আছে। মিস ললিতাকে সেজন্য তিনি ফোনে বলে রেখেছিলেন, আর রাস্তায় নেমে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপারের ভিতর আটকে যাওয়া! তিনি কেমন বিরক্ত মুখে বললেন—দিন দিন এসব কি যে হচ্ছে বুঝি না।

ড্রাইভার বলল—স্যার বরং গাড়ি বাড়িতে নিয়ে যাই।

কোনো উপায় নেই বুঝতে পারলেন। কেবল তারা যাচ্ছে। আর

চারপাশে গাড়ির হর্ন। এভাবে ক্রমে এই রাস্তা একটা গাড়ির পিঁজরাপোল হয়ে যাবে কিছুক্ষণের ভিতর। তিনি যে এখন কি করেন! তাঁর হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে। অথবা এই সব মিছিলের মানুষদের ধরে শহরের বাইরে বের করে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি বললেন—ছাখো ব্যাক্ করতে পারো কিনা।

এবং তখনই পাগলিনী হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে—ছ ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। হাতে তার লাঠি। লাঠির মাথায় পালক। পাগলিনীকে ভীষণ দাম্ভিক মনে হচ্ছে। মজুমদার সাহেব বললেন—ছাখো পাশ কাটাতে পারো কিনা!

তারপর ফিরে এসে ফোন। প্রোগ্রাম ক্যানসেল। ভিতর বাড়িতে এ-সময় কারো থাকার কথা না। টুকুনের যাবার কথা আছে একাডেমিতে। ইন্দ্রকে নিয়ে যাবে। এখন টুকুন ভীষণ ভালো গাড়ি চালাতে পারে। ওঁর ইচ্ছা হাতের সব কাজ হয়ে গেলে একবার গাড়িতে স্বামী-স্ত্রী-টুকুন সবাই কাশ্মীর যাবেন। খুব জমবে। টুকুনের মা নিশ্চয়ই দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডারের চাঁদা আদায়ের জন্য মিঃ তরফদারের কাছে গেছে। সেখান থেকে ফিরতে ওর রাত হবার কথা।

অথচ এমন একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ক্যানসেল করে মনটা খচ্‌খচ্ করছিল। তবে তিনি ট্যাণ্ডন সাবকে জানেন, ভীষণ লোভী মানুষ। আশ্চর্য সৎ টাকা-পয়সার ব্যাপারে। এক পয়সা ঘুষ তিনি নেন না কথিত আছে। তবে যে দেবতা যাতে খুশি। ললিতা সম্পর্কে এমন একটা ছবি তৈরি করে রেখেছেন ট্যাণ্ডন সাবের মনে যে তাঁর আর সূর্যাস্ত না দেখে উপায় নেই। নদীর পাড়ে খোলামেলা বাতাসের ভিতর একটা নিরিবিলি গাছের ছায়ায় ট্যাণ্ডন সাব আর ললিতা। সব ব্যবস্থা মজুমদার সাহেব নিপুণভাবে করে রেখেছেন। অথচ সেই সময়টায় কিনা মিছিলের লোকগুলি—কাজ না করে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে পয়সা কামাতে চায়! কি যে স্বভাব মানুষের এবং এটা বাঙালিদের

ভিতর খুব বেশি এমন মনে হলে তাঁর কেন জানি মনে হয় আর এ-জাতিটাকে বাঁচানো গেল না। খুব যে আপসোস চোখমুখে। বিরক্ত ভাবে তিনি তাঁর নিচের ঘরটাতে ঢুকে গেলেন।

রামনাথ তেওয়ারি, ব্যক্তিগত খানসামার কাজও করে, এ সময়ে সাহেবের ফাইফরমাশ খাটার সে মানুষ, মুখ লম্বা করে দাঁড়িয়েছিল—কি যে আদেশ করবেন তিনি।

এবং রামনাথ তেওয়ারি ভাবতেই পারে নি, এমন অসময়ে সাহেব তার কুটিরে ফিরে আসতে পারেন! তার পোশাক আশাক ভারি বিশ্রী—সে তাড়াতাড়ি প্যাণ্টের বোতাম আঁটতে ভুলে গেছে। সে দাঁড়িয়ে ছিল অ্যাটেনশান হয়ে। পাগড়ি তার ঠিক ছিল না। স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ হতেই তার মনে হলো কি যেন দেখছেন, মজুমদার সাব।

সে একটু হকচকিয়ে কেমন বোকার মতো হেসে দিল।

তারপর যা হয়, তাঁর অঙ্গুলি সংকেতই যথেষ্ট। রামনাথ দেখল ওর প্যাণ্টের বোতাম আলগা। নিচে কিছু পরার স্বভাব নেই বলে এমনটা হয়। সে জানে আরও ক-বার তার এমন হয়েছে। এবং মজুমদার সাবের লাস্ট ওয়ার্নিং ছিল। রামনাথ এখন ভীষণ কুপোকাত। সে বলল—সাব আর হবে না।

মজুমদার সাহেবের মনটা ভালো না। তিনি তাঁর অ্যাটাচড বাথরুমে এখন ঢুকে বেশ ঠাণ্ডা জলে স্নান করবেন। তাঁর বাঁধানো দাঁত এখন টেবিলে একটা মোমের বাটিতে ভেজানো থাকবে। এবং তখন কিনা রামনাথ হাতজোড় করে দাঁড়াল! সাহেব কেমন অবাক চোখে তাকালেন। এ-ব্যাপারে যে তিনি একটা লাস্ট ওয়ার্নিং ওকে দিয়ে রেখেছিলেন, বেমালুম ভুলে গেছেন। টুকুনের মা-র ফিরতে অনেক রাত হবে। মিছিল টিছিলের ব্যাপার দেখিয়ে একটা বেশ অজুহাত তৈরির সুবিধা পেয়ে যাবে।

কারণ এই শহরে মিছিলের পরই জ্যাম আরম্ভ হয়। এবং জ্যাম

ভাঙতে ভাঙতে রাত যে কত হয় কত হতে পারে কেউ যেন জানে না। এবং এ-ভাবে টুকুনের মা যত রাত করেই ফিরুক মজুমদার সাহেব কিছু বলতে পারেন না। রাত তাঁরও হয়। তবে তিনি একটা ব্যাপারে ভীষণ ভালো মানুষ, টুকুনের মাকে খুব ভালোবাসেন। ললিতার মতো মেয়েরা ট্যাগুন সাবদের মতো মানুষের ভোগে লাগে —মজুমদার সাব সেখানে সামান্য কৌশলী ব্যাগু-মাস্টার মাত্র।

এবং এভাবে আজকের ব্যাগু-মাস্টার মজুমদার সাহেব নিজে হয়ে যাচ্ছেন। বাথরুমে স্নান করার সময় তাঁর কথাটা মনে পড়ল। মাথায় শাওয়ারের জল। হাতে নানা রঙের পাথর সব—দামী, ভাগ্য ফেরানোর ব্যাপারে সেই যৌবন কাল থেকে পরে আসছেন। এখন দু-আঙুলে দশটা—ক্রমে বয়েস বাড়লে বিশটা হয়ে যাবে। বাথরুমের আলোটা সাদা মতো দেখাচ্ছে। পেটে চর্বি, এবং লোমশ শরীর থেকে টুপটাপ জল পড়ছে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে টুকুনের মা-র কাছে নিজেকে কেমন একটা বনমানুষ মনে হলো। ভাবল, টুকুনের মা-র আসতে দেরি হওয়া স্বাভাবিক। মুখে চোখের ভয়ঙ্কর ঈর্ষা কেমন এক উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো হয়ে গেলে অয়না থেকে চোখ তুলে নেন তিনি। খুব সুগন্ধযুক্ত সাবানের ফেনার ভিতর লম্বা টবে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা জলে কি যে ভালো লাগে পাইপ টানতে। এবং অনেক টুকিটাকি কাজ তিনি এভাবে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা জলের ভিতর সেরে ফেলতে পারেন। রামনাথ তখন তাঁর অনেক কাছের মানুষ হয়ে যায়। দরজায় পাহারা—আভি কোই মাত ঢোকনা। সাব নাহানে মে গিয়া।

—রামনা-থ।

রামনাথ বুঝল, বাবুর নকল দাঁত এবার তাকে দিয়ে আসতে হবে। অথচ কি যে বয়স! এমন সামান্য বয়সে দাঁত কেন পড়ে যায় সব সে ভাবতে পারে না। সব না এক পাটির কিছু অংশ সে জানে না। এমন একটা মোমের পাত্রে তা ঢাকা থাকে, এবং সে

যখন ভিতরে দিয়ে আসে তখন সাহেবের মুখে এমন একটা ফুলো ভাব থাকে যে দেখলে মনে হবে তাঁর একটা দাঁতও পড়ে নি এবং রামনাথ জানে না, মেমসাব আজও জানে কিনা, দাঁত নকল না আসল। কনফিডেনসিয়াল সব। সে এ-ঘরের টু শব্দটি দরজার বাইরে বের হতে দেয় না। এখানে এই স্নানের সময়টুকু স্নানের ঘরে ঢুকলেই তাঁর বের হতে হতে দু-ঘণ্টা—রামনাথের মনে হয় ঠাণ্ডা জলে কি সব গন্ধদ্রব্য একটার পর একটা ঢেলে তিনি আশ্চর্য এক নীল সমুদ্রের বাসিন্দা হয়ে যেতে চান। সে তখন যেই খোঁজ করুক না—সাব নাহানে মে হ্যায়। বাস তার এক কথা। এমনকি তখন মেমসাব কেমন সন্তর্পণে চলাফেরা করেন। তিনি পর্যন্ত ঢুকে বলতে সাহস পান না, আমি দেখব, দাঁত আসল না নকল।

তারপর যা হয়ে থাকে···নকল দাঁতের শৌখিনতা মানুষের মনে সেই কবে থেকে যেন। সে জানে বোঝে নকল দাঁতেরা খুব উজ্জ্বল হয়। পুরানো দাঁত পরে থাকতে বুঝি ভালো লাগে না মানুষের। উজ্জ্বল দাঁত পরে, হাসিটুকু উজ্জ্বল রেখে, সব সময় মানুষ তার নিজের গোড়ালি উঁচু রাখতে হয়। এবং এর ভিতরই থেকে যায় অসুখটা। টুকুনের ছিল—কিন্তু মজুমদার সাব অথবা মেমসাহেবের কোন অসুখ নেই কে বলবে। প্রাচুর্য অনায়াস হলে মানুষের নকল দাঁতের দরকার হয়। মজুমদার সাব এটা যে বোঝেন না তা না। খুব বোঝেন। উদ্যম বিহনে কিবা পূরে মনোরথে—উদ্যমই সব। অথচ কোথায় যে মানুষেরা উদ্যম বিহনে ভুগে ভুগে অনায়াস প্রাচুর্যের লোভে কখনও মিছিলের ভিতর, কখনও কারখানার ভিতর, আবার কখনও বড় বাড়ির সদরে এক কঠিন অসুখ—আর এ-ভাবে একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বের মতো ঘটনাটা আবিষ্কার করে কেমন তিনি উৎফুল্ল হলে দরজার ও-পাশে ক্রিং ক্রিং করে ফোন বেজে উঠল।

তিনি রামনাথের গলা পাবেন আশা করে বসে আছেন—কে রে? তিনি রামনাথকে উদ্দেশ করে বাথরুম থেকে বললেন।

—সাব ইন্দ্র দাদাবাবু।

—ইন্দ্র দাদাবাবু।

—হ্যাঁ সাব।

—ছোঁড়াটা জ্যামে পড়ে গেল বুঝি!

—তা কিছু বলছে না।

—তবে কি বলছে?

—মেমসাবকে চাইছে।

—ধর। আসছি।

তিনি একটা নীল রঙের তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে বেশ ছুটে এসে ফোনটা ধরলেন—হ্যালো কে?

—আমি ইন্দ্র বলছি মেসোমশাই!

—কি ব্যাপার!

—ব্যাপার খুব ভীষণ।

—রাস্তায় আটকা পড়েছ?

—রাস্তায় না, একাডেমিতে। পাশের একটা দোকান থেকে ফোন করছি।

—আটকা পড়েছ মানে?

—টুকুন আমাকে না বলে না কয়ে কখন বের হয়ে গেছে গাড়ি নিয়ে।

—কোথায় গেছে?

—জানি না।

—কখন গেছে?

—অনেকক্ষণ।

—গেছে যখন, ঠিক ফিরে আসবে। মজুমদার সাব এইটুকু বলে

ফোন ছেড়ে দেবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র মনে হচ্ছে আরও কিছু বলবে। কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন সে কিছু বলতে ইতস্তত করছে।

—টুকুন আমাকে বলল, একটু বোসো। আমি আসছি।

—আসছি যখন বলেছে, ঠিকই চলে আসবে।

—সে বাড়ি ফিরে যায় নি তো?

—তোমাকে না নিয়ে বাড়ি ফিরবে কি করে।

—কি জানি, ওর যা মেজাজ।

—কতক্ষণ হলো গেছে?

—ঘণ্টা দুইর ওপর হবে।

মজুমদার সাবের মুখ সামান্য সময়ের জন্য খুব উদ্বিগ্ন দেখাল তারপর ভাবলেন কোনো জ্যামে পড়ে গেছে। তিনি বললেন—আজ তোমাদের বের হওয়া উচিত হয় নি। কি করে যে ফিরবে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার তো যাবার কথা ছিল ওদিকে, কিন্তু কিছুতেই যেতে পারলাম না। রাত দশটার আগে জ্যাম ছাড়বে বলে মনে হয় না।

—এদিকে তো শুনছি মাঠে ভীষণ গণ্ডগোল। পুলিশ আর জনতার খুব মারধর হচ্ছে। যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।

—তোমার তো দোকানে থাকা উচিত হবে না এ-সময়। টুকুন ফিরে এসে তোমাকে না পেলে ভাববে।

—কিন্তু এমন হওয়া তো উচিত না। কেমন বেপরোয়া। হুশ করে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। সোজা রবীন্দ্র সদন পার হয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেল।

—কোথায় যেতে পারে তোমার মনে হয়।

—কি করে বলব। তবে কদিন থেকেই বলছিল ওর বাওবাব গাছের খুব একটা দরকার।

—বাওবাব গাছ! সে আবার কি!

—সে আমিও জানি না। সুবল একটা বাওবাবের চারা খুঁজছে।

—কত রকমের যে গাছ আছে পৃথিবীতে।

ইন্দ্র মনে মনে হাসল। মেয়ের মতো বাপেরও বুঝি একটা রোগ আছে। মেয়েটা কোথায় গেল, একটুকু চিন্তা করছে না। সে এবার বলল—মাসিমা কোথায় ?

—এ সময় তো তুমি জানো ও বাড়ি থাকে না। আমিই কেবল অসময়ে বাড়িতে। একটু থেমে বললেন—শোনো, তুমি দেরি করো না। ও এসে তোমাকে জায়গামতো না দেখলে খুব চিন্তায় পড়ে যাবে।

ইন্দ্র এবার হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না। সে বলল—ঠিক আছে, যাচ্ছি। সে মজুমদার সাবকে কিছু বলে চটাতে ভয় পায়। টুকুনের সায় নেই, মেসোমশাইরও সায় না থাকলে ওর হিসাব উল্টে যাবে। সে ভয়ে বলতে পারল না—টুকুন আমাকে এসে না দেখলে ভীষণ খুশি হবে, সে এতটুকু ঘাবড়ে যাবে না। বললেই যেন সে ধরা পড়ে যাবে—সে খুব অক্ষম, টুকুনকে সে এতদিনেও হাত করতে পারে নি। এবং অন্য যুবকেরা তো বেশ গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়িয়েই আছে —এক ফাঁকে এই সাম্রাজ্যের ভিতর কি করে লাফিয়ে পড়া যায়। টুকুনের এক মাস্টারমশাই পর্যন্ত—ছোঁড়া খুব দামী গাড়িতে আসে পড়াতে। মেসোমশাইর কাছে ওর খুব সুনাম। আর আশ্চর্য যে একজন পেটি শিক্ষক কি-ভাবেই বা আশা করে টুকুনের মতো মেয়েকে পাবার- -তবে যে টুকুনের অসুখ। অসুখ না থাকলে এমনভাবে সে একটা পাখিয়ালার জন্য বাওবাবের চারা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ ইন্দ্রর খেয়াল হলো, যা, মেসোমশাই ফোন ছেড়ে দিয়েছে। সে হঠাৎ কি ভাবতে গিয়ে বলতে পারল না, আমি ঠিক জানি ও কোথায় গেছে! কিন্তু ওটা যে আর বলা হলো না! মেসোমশাই ফোন ছেড়ে দিয়েছে। সে আবার ভাবল ডায়াল ঘুরিয়ে বলবে—কিন্তু তক্ষুনি মনে

হলো টুকুন যদি চলে আসে। সে সত্যি যদি ওকে না দেখে ভীষণ ঘাবড়ে যায়! এমন ভাবতে ইন্দ্রের ভীষণ ভালো লাগে এবং ভালো লাগাটা সে কখনও সত্যি সত্যি মনে মনে মেনে নেয়। কি হবে সব জানিয়ে—মেয়েটার অসুখ, বড় কঠিন অসুখ এক—যা সে নিত্যদিন দেখে দেখে কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। কোথাকার এক পাখিয়ালা, কোথাকার এক পেটি শিক্ষক—যারা সহবত জানে না। তারা পর্যন্ত টুকুনের কাছে খুব দামী মানুষ।

ইন্দ্র সুতরাং রাস্তা পার হয়ে যায়। সেই গাছটার নিচে গিয়ে বসে থাকে। এবং গাড়িগুলোর যাওয়া-আসার পথে সে কেবল ভাবে —এই বুঝি টুকুন এল। ক্রমে রাত বাড়ে এভাবে। ওর ভালে লাগে না। মাকে ফোন করে গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলবে ভাবল। মা জিজ্ঞাসা করবে—কি হলো, তোকে তো টুকুন পৌঁছে দিয়ে যায়। আজ তোর এমন কথা কেন! সে কেন জানি তার মাকেও বলতে ভয় পায় —মা, টুকুনের অসুখে আমাকে জড়াচ্ছ কেন। মেয়েটা আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না। তারপরই মনে মনে ভীষণ রাগ, এবং এক কঠিন মুখ, সে-মুখ যে তার নিজের সে ঠিক তখন বুঝতে পাবে না। কেমন নৃশংস মুখ হয়ে যায়। পেটি শিক্ষকের কথা সে ছেড়ে দিতে পারে, তার ওপর সে ভরসা রাখতে পারে; কিন্তু মনে হয় বার বার সে হেরে যাবে একজনের কাছে—তার নাম সুবল—এক পাখিয়ালা। ফুলের রাজ্য তৈরি করে সে এক স্বপ্নের দেশের মানুষ হয়ে গেছে টুকুনের কাছে। তার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, টুকুনের স্বপ্নটাকে সে যে ভাবে পারে ভেঙে দেবে। এবং তার আজই ইচ্ছা হলো, একবার গোপনে সে সুবলের দেশটা দেখে আসবে—কিসের আকর্ষণ, এমনভাবে তাকে ফেলে পালিয়ে যাবার কি এমন আকর্ষণ। তারপরই কেন জানি সে জোর করে হেসে দেয়—কি যে সব আজেবাজে সে ভাবছে! টুকুন না বলে গাড়ি নিয়ে গেছে বলে অভিমানে যত সব বাজে সন্দেহ। হয়তো

এক্ষুনি এসে পড়বে। কোথাও জ্যামে-ট্যামে আটকে গেছে। তা ছাড়া যদি...যদি...একটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট! ওর কেমন ভয় ধরে গেল। এভাবে বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না। সব খুলে বলা দরকার। একটা ট্যাক্‌সি—এই ট্যাক্‌সি। এ-ভাবে দুবার তিনবার ট্যাক্‌সি ডেকে শেষবার পেয়ে গেলে—সোজা টুকুনদের বাড়িতে। সে এসেই বলল—টুকুন ফেরে নি মাসিমা?

মাসিমার মুখ ভীষণ ভার। জ্যামে তিনিও আটকে গিয়ে অসময় বাড়ি ফিরে এসেছেন। হাতের এতটা সময় কি যে করেন! মিঃ তরফদারের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তাঁর খুব খারাপ লাগছে। এবং তখন যেন হাসতে হাসতে বলা—শুনছ, টুকুন ইন্দ্রকে গাছতলায় বসিয়ে গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে গেছে।

—ভালো করেছে।

মেজাজ ভালো না থাকার ব্যাপারটা মজুমদার সাব বেশ ধরতে পেরে মনে মনে হাসছিলেন।

এবং ঠিক পরে পরেই ইন্দ্র এসে যখন বলল—মাসিমা টুকুন ফেরে নি! কেমন হুঁশ ফেরার মতো তিনি ঘড়ি দেখলেন—মেয়েটার জন্য কেমন প্রাণ কেঁদে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার—তুমি কি। মজুমদার সাবকে ভীষণ গালাগাল—তুমি এত বড় নিষ্ঠুর। আমার একটা মাত্র মেয়ে তাও তুমি এমনভাবে চুপচাপ আছ।

—আরে ঠিক চলে আসবে। মনে হয় সুবলের কাছে গেছে।

—সেই পাখিয়ালাটা! ছিঃ ছিঃ। তুমি এখনও চুপচাপ বসে আছ? ইন্দ্র, তুমি পরিমলকে ধরো তো।

—আরে করছ কি! পুলিশ কমিশনার-টমিশনার আবার ডাকছ কেন? আমি তো আন্দাজে বললাম।

টুকুনের মা ঘড়ি দেখছে কেবল। নটা বেজে গেছে। যখন পাখিয়ালার কাছে যায় নি, হয়তো মীনাদের বাড়ি গেছে, মীনার কথা

মনে হতেই জোনার কথাও মনে হলো। যা খামখেয়ালী মেয়ে। টুকুনের মা সব ওর বান্ধবীদের এক এক করে যখন ফোন শেষ করে উঠবে তখন সবার চোখে অন্ধকার। এবার বোধ হয় পুলিশ কমিশনার-টমিশনার দরকার আছে। কিন্তু এত বড় বাড়ির একটা ব্যাপার, স্ক্যাণ্ডাল হতে কতক্ষণ—আরও কিছু সময় দেখা দরকার। হয়তো কিছুই হয়নি। পুলিশে ছুঁলেই আঠারো ঘা। সুতরাং ইন্দ্র, মজুমদার সাব, টুকুনের মা এবং মজুমদার সাবের পার্সোনেল সেক্রেটারি চুপচাপ কি করা যায় ভাবছিলেন—তখন মনে হলো কেউ বলতে বলতে আসছে—টুকুন দিদমণি আসছে।

ওরাও দেখল টুকুন দিদিমণি আসছে ভীষণ সজীব। পেছনে ধীর পায়ে আসছে সুবল। কত লম্বা দেখাচ্ছে ওকে। খুব হাসিখুশি। বাড়ির ভিতর যে এতটা ব্যাপার ঘটবে সুবল যেন বুঝতে পেরেছে তবু সে এতটুকু আমল না দিয়ে বলল—টুকুন দিদিমণি একাই ফিরতে চেয়েছিল, এতটা রাস্তা একা আসবে—ঠিক সাহস পেলাম না।

মজুমদার সাব খুব সংযত গলায় বললেন—এভাবে টুকুন তোমার যাওয়া উচিত হয় নি। আমরা খুব ভাবছিলাম।

ইন্দ্র বলল—আর একটু হলেই পরিমল মামাকে ফোন করব ভেবেছিলাম।

টুকুনের মা বলল—তুমি আর বাড়ি থেকে কোথাও বের হবে না।

সুবল বলল—আমি যাচ্ছি টুকুন দিদিমণি।

মজুমদার সাব বললেন—না, বোসো।

টুকুনের মা বলল—না, তুমি যাও সুবল। অনেক রাত হয়েছে।

সুবল বলল—সেই ভালো।

টুকুন বলল—একটু দেরি করে গেলে কিছু হবে না। এগারোটার লাস্ট ট্রেন পেয়ে যাবে। একটু কফি করে দাও মা।

মা যে কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। মেয়েটা এত বেহায়া। ইন্দ্র বুলল—এটাও একটা অসুখ।

টুকুন বলল—কি অসুখ!

—এই অসুখ!

মজুমদার সাব খুব বিব্রত বোধ করছেন। তিনি বললেন—তুমি আর এসো না সুবল। তোমাকে নিয়ে সংসারে খুব অশান্তি।

টুকুন ভাবল, সবাই তবে তোমরা শান্তিতে আছ! সুবল এলেই যত অশান্তি। ঠিক আছে। সে বলল—সুবল, আমি কাল যাব।

টুকুনের মা থ, মেয়ের এত সাহস! লোকটা তুকতাক করে একেবারে মাথাটা খেয়েছে। এবং সুবল যখন চলে গেল, তখন টুকুনের মা-র ভীষণ মাথা ধরেছে। কি যে হবে। কবে একবার ওর বাবা একটা বেয়াড়া চাকরকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন, এবং জলের কুয়োতে ফেলে দিয়ে মাটিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কেন যে বাবা এমন করেছিলেন, সে জানত না। কেবল সে দেখেছে ঐ চাকরটার মৃত্যুর পর মা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সব সময় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এবং চোখ উদাস। এখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে বাবা বেশি বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। সে শেষ পক্ষের মেয়ে। বাবার সঙ্গে মা-র বয়সের তফাৎ কত যে বেশী ছিল, সে যেন সেটা এখনও অনুমান করতে পারে না। মা-র চোখ মুখ কি পবিত্র ছিল, মা বড় করে সিঁদুরের টিপ কপালে দিতেন। খুব মোটা করে আলতা পরতে ভালোবাসতেন, মা-র চোখে মুখে ছিল অসীম লাবণ্য। মা কখনও কঠিন কথা বলতে জানতেন না। ঝি-চাকরদের কাছে মা ছিলেন দেবীর মতো, অথচ বাবার সংশয় ভীষণ এবং এই সংশয় থেকে সংসারে ভীষণ ঝড় উঠেছিল।

এসব কথা মনে হলে মাথা ধরাটা আরও বেড়ে যায়। টুকুনের জন্য তার এমন একটা কিছু মনে হয়েছে। এবং সে যেতে যেতে দেখল

বড় বড় আয়নায় ওর প্রতিবিম্ব পড়ছে। সে নিজের মুখের দিকে নিজেই তাকাতে পারছে না। ভীষণ কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখ। সমাজে সে মুখ দেখাবে কি করে! মিঃ তরফদার এ-নিয়ে বেশ রসিকতা করবেন। কান গরম হয়ে যাবে। পায়ের রক্ত মাথায় উঠে আসবে। সে তার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে দেখতে পেল—দেয়ালের সব বড় বড় ছবি ওর দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে। অথবা সব ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে যাচ্ছে। এবং ওর পিছনে ছুটে আসছে। আর ঘড়িতে তখন সাড়ে দশ। রেল স্টেশনে গাড়ি ছাড়ার শব্দ। কেমন বেহুঁশের মতো সে তার ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। আর একটু বাদে এ-ঘরে সেই কাপুরুষ মানুষটা ঢুকবে। মুখে লাগানো তার নকল দাঁত। ওকে চেটেপুটে খাবার জন্য আসবে। সে এসে যাতে ওকে চেটেপুটে না খেতে পারে সেজন্য দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ দেখলে মানুষটা ফিরে যাবে এবং সারা রাত ছটফট করবে বিছানায়। ওর ঘুম আসবে না। সকাল হলে সে মানুষটার কাছে যা চাইবে ঠিক পেয়ে যাবে। সে জানে সারা দিন পর শরীর চেটেপুটে খেতে না দিলে মানুষটার কামনা-বাসনা মরে না। সে তার মেয়ে টুকুনকে সুস্থ করে তোলার জন্য আবার কি করা যায় ভেবে যা স্থির করল সে বড় নৃশংস। ভাবতেও ভয় হয়।

২০

আর তখন টুকুন দরজা টরজা পার হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল প্রায় সে ছুটে ছুটে সিঁড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেছে কি যে মহার্ঘ বস্তু তার শরীরে আছে—যা সুবলের কাছে গেলেই ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। নদীতে স্নানের দৃশ্য মনে হলে সে কেমন লজ্জায় গুটিয়ে আসে। ওর চোখ মুখ তখন বড় সুষমামণ্ডিত মনে হয়। তার কাছে সুবল এক আশ্চর্য মানুষ। সে এতক্ষণ সুবলের ফুলের উপত্যকায় জ্যোৎস্না রাতে চুপচাপ বসেছিল পাশাপাশি। ফুলেরা সব ওর শরীরের চারপাশে বাতাসে দুলেছে। আর সেই বুড়ো মানুষের সুর ধুয়ে পড়ে যাওয়া সব সুরা বাতাসে এক সুন্দর সজীবতা গড়ে দিয়েছিল। মাঝে মাঝে সুবল সেই সব সুরার অর্থ করে দিলে—মনে হত আশ্চর্য এই জীবন—সে আছে মানুষের পাশাপাশি—যার শরীরে আছে নানা বর্ণের ফুলের সৌরভ।

সে এ-ভাবে এমন একটা মুগ্ধতার ভিতর আছে যা ভাবা যায় না ঘরে ঢুকেই সে পিয়ানোর রিডে ঝম ঝম শব্দ তুলে হাত চালাতে থাকল। এবং আশ্চর্য সব সিমফনি গড়ে তুলতে চাইছে সেই সব শব্দের ভিতর। যেমন যেমন সে সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধ্যা এবং রাতের প্রথম দিকে সাবা জ্যোৎস্নায় ঘোরাঘুরি করেছে সে ঠিক তেমনি রিডের ওপর হাত চালাতে থাকল।

প্রথমে সে গোটা রিডের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে দু' হাতের আঙুল চালিয়ে গেল। যেন সে সুবলের কাছে যাবে বলে মোটরে যাচ্ছে ঝড়ের বেগে। তার রাস্তাটা ঠিক জানা নেই। রিডে যে জন্য মাঝে মাঝে টুকুনের হাত কাঁপছে। হাত কাঁপলেই মনে হয় ইতস্তত মোটরটা রাস্তা

ভুল করে ফেলছে। ভুল করেই ফের শুধরে নিচ্ছে—তখন আবার দু' হাতের সমস্ত আঙ্গুল কোমল লতার মত দুলে দুলে যেন সুতার বাঁধা সরু সরু সব পুতুলের হাল্কা পা রিডগুলোতে কখনও অল্প, কখনও বেশী এবং কখনও ছোট ছোট অক্ষরে লিখে যাবার মত তার মনের উদবিগ্ন ভাব এবং আকুতি ফুটিয়ে তুলতে চাইছে।

এ-ভাবে একটি মেয়ে এমন সব সুর তুলে ফেলছে এমন সব সুন্দর ঝংকার তুলছে পিয়ানোতে যে সমস্ত বাড়িটা যেন সুরের ঝংকারে ভাসছে। কখনও হাল্কা মেঘের ওপর—কখনও জলে গলে যাবার মত, আবার মনে হয় স্থির হয়ে আছে বাড়িটা—সাদা জ্যোৎস্নায় সব কেমন করুণ হয়ে আছে।

ঘরে ঘরে কেউ আর ঘুমোচ্ছে না এখন। সুরের ইন্দ্রজালের ভিতর সবাই ডুবে যাচ্ছে। এমন ঝংকার যে—মনে হয় কোথাও দু'জন পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে, কোথাও ওরা দুজন পাশাপাশি সাঁতার কাটছে নির্মল জলে। আবার মনে হচ্ছে বনের ভিতর দাপাদাপি। একজন আগে ছুটে যাচ্ছে আর একজন পিছনে। পাতা পড়ার শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। বনের মর্মর শোনা যাচ্ছে আবার শোঁ শোঁ ঝড়ের বেগে গাছের ডালপালা ভাঙার শব্দ! আর খুব কান পাতলে বোঝা যায় এখন টুকুন যে ঝংকার তুলছে রিডে, সবই নদীতে নেমে যাবার আগের দৃশ্য। প্রথমে দু'জনে ধীর পায়ে জলে নামছে। খস খস শব্দ। শাড়ি হাঁটুর ওপর উঠে আসছে। তারপর ঝুপঝাপ—দু'জনে নেমে যাচ্ছে। জলে সাঁতার কাটছে। খুব লঘুপক্ষ হয়ে জলে ভেসে যাচ্ছে। এত আস্তে এখন পিয়নোতে আঙ্গুলগুলো নড়ছে টুকুনের যে মনে হয় আঙ্গুলগুলো অবশ হয়ে গেছে। টুকুন চোখ বুজে বাজাচ্ছে। এবং সেই দৃশ্যের ভিতর জলের নীচে ডুব দেবার শব্দ, অথবা পা দুটো ঠিক মাছের মত যে খেলছে জলের নীচে তার শব্দ, অথবা লুকোচুরি খেলার জন্য গভীর জলে ক্রমে ডুবে যাওয়া, ডুবতে ডুবতে গভীরে ডুবে যাওয়া

আরও তলায় এবং শেষে কিছু জলের ওপর ফুটকরি তোলার আওয়াজ —সবটাই এখন নিপুণভাবে টুকুন রিডের ওপর বিস্তার করার চেষ্টা করছে।

আর চার পাশে ওপরে নীচে যত কামরা আছে, যত মানুষ আছে এই প্রাসাদের মত বাড়ীতে তারা ভেবে অবাক হচ্ছে, টুকুন প্রায় যাদুকরের মত এক অবিশ্বাস্য সিমফনি একের পর এক বাজিয়ে যাচ্ছে। একটা বাজাচ্ছে—শেষ করছে বাজনা, মিনিটের মত বিরতি তারপর আবার, ঝমঝম শব্দ। যেন ভীষণ বেগে প্রপাতের জল নেমে আসছে। বাড়িটা জলের নীচে ডুবে যাচ্ছে। আর নিঃশ্বাস বন্ধ করে একের পর এক সবাই এসে এবার পার্লারে জড় হচ্ছে। পার্লারে সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সবাই মুখোমুখি বসে। কেউ ওপরে যেতে পাচ্ছে না। কেমন এক মুগ্ধতায় সবাই বসে রয়েছে মুখোমুখি। ঝাড়-লণ্ঠনে সব আলো জ্বলছে। দেয়ালের পুরানো পেন্টিঙ পর্যন্ত সজীব দেখাচ্ছে।

এবং মেয়েটা বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই। সে তার ঘরে খুব অল্প আলো জ্বেলে রেখেছে। একটা মোম জ্বাললে যতটা হয় ঠিক ততটা। সে সেই সিল্কের শাড়িটাই পরে আছে। ওর কাঁধ থেকে আচল খসে পড়েছে। ওর চুল উড়ছিল পাখার হাওয়ায়। আর ও ভীষণ ঘামছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ক্রমে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সে এবার বাজিয়ে গেল—একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে। মেষ পালকেরা ঘরে ফিরছে। গরু-বাছুরের ডাক ভেসে আসছে। বাতাসে নদীর জলে ঢেউ। কেউ যেন সেই জলে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে তার শব্দ। তারপর চুপচাপ বসে থাকলে যে এক নিরিবিলি ভাব থাকে তেমনি এক ভাব। কত অনায়াসে যে মেয়েটা এমনভাবে সামান্য কটা রিডে আশ্চর্য সব সিমফনি গড়ে যাচ্ছে।

এবং সব শেষে ওরা শুনছে ক্রমে বাজনা দ্রুত লয়ে উঠতে উঠতে ঝম-ঝম শব্দ। বুঝি যুবক-যুবতী সাঁতরে নদী পার হচ্ছে। এবং নরম

ঘাস মাড়িয়ে ছুটছে। তারপর বনের ভিতর আদম ইভের মত ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষে জ্ঞান বৃক্ষের ফল থেকে যা হয় এক আশ্চর্য মাদকতা, অথবা মুগ্ধতা এবং অপার বিস্ময়বোধ শরীর সম্পর্কে···কি যে ভাল লাগে, ভাল লাগার যেন শেষ থাকে না—অন্তহীন ঈশ্বরের অপার ইচ্ছা শরীরে খেলে বেড়ালে কেমন আবেগে বলার ইচ্ছা—তুমি আমায় দ্যাখো, সবকিছু দ্যাখো, আমাকে তোমার ভিতর নিঃশেষ করে দাও। এইভাবে সব কিছু নিঃশেষে হরণ করে নিলে মনে আছে টুকুন সুবলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। টুকুন কত সহজে সে-সবও বাজিয়ে যাচ্ছে!

তারপর এক সময় টুকুন পাশের টুলটাতে বসে পড়ল। এবং পিয়ানোর রিডে মাথা রেখে চোখ বুজে থাকল। তার এখন আর উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। দরজায় বাবা এসে দাঁড়িয়েছেন। ডাকছেন, টুকুন। এটা কি হচ্ছে! এত রাতে তুমি এমনভাবে বাজালে আমাদের ভয় লাগে। তুমি দরজা খোল।

ইন্দ্রও বলছে, টুকুন দরজা খোল।

টুকুনের মা বলল, এক অসুখ সেরে অন্য অসুখে মেয়েটা ভুগছে। আমার কি যে হবে!

—কি হবে আবার! টুকুনের বাবা ধমক দিতে গিয়েও ইন্দ্রকে দেখে কিছু বলতে পারলেন না।

—কিছু হবে না বলছ! মানুষ এভাবে কখনও পিয়ানো বাজাতে পারে?

—পারে না?

—টুকুন কতটুকু বাজনা শিখেছে! যে এতেই সে এমন একটা আশ্চর্য লয় তান শিখে ফেলবে।

—এটা তো মনের ব্যাপার। তুমি সব তাতেই এত ভয় পাও কেন বুঝি না।

না, ভয় পাব না, একটা ডাইন এসে আমার মেয়েটাকে কি করে ফেলল। বলে, দরজায় নিজের কপাল ঠুকতে থাকল।

টুকুন আর বসে থাকতে পারল না; দরজা খুলে বলল, তোমরা এখানে কেন? মার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা তুমি কি করছ!

—না এখানে থাকব না। এটা কি বাড়ি না ভূতের বাসা!

—পিয়ানো বাজালে ভূতের বাসা হয়।

মজুমদার সাহেব বাধা দিলেন কথায়। টুকুন মা লক্ষ্মী। তুমি এবার খেয়ে শুয়ে পড়। বাজাতে ইচ্ছা হয় সকালে উঠে বাজিও।

গীতা মাসি বলল, আমি সব গরম করে রেখেছি।

টুকুন আর কথা বাড়াল না। বাথরুমে ঢুকে সে সব খুলে ফেলল। শরীর কেন যে এত পবিত্র লাগছে। কেন যে এত হাল্কা লাগছে। শরীরে যা কিছু মুক্তাবিন্দু সব সে ধীরে ধীরে সাবানের ফেনায় তুলে ফেলল। সুবল এভাবে একটা ফুলের উপত্যকায় কিংবদন্তীর মানুষ হয়ে যাবে কখনও যেন টুকুন জানত না। ওর ফুলের গাড়িগুলোর টংলিং টংলিং শব্দ টুকুন এখনও যেন শুনতে পাচ্ছে। এবং ওর চুপচাপ থাকা, বড় লম্বা শরীর, কালো গভীর চোখ, ঢোলা পাঞ্জাবী সব কিছু আর সে ফুলের জগতে আছে বলেই ওর ভিতর এক অসাধারণ ব্যাক্তিত্ব যেন জেগে উঠেছে! সুবল বলেছে—যা কিছু এখানে দেখছ—আমার বলতে কিছু নেই। যারা কাজ করে তাদের। যা কিছু লাভ অলাভ তাদের। ওরা না থাকলে—এভাবে একটা ফুলের উপত্যকা গড়া যায় না।

টুকুন ভেবেছিল, এটা খুব সত্যি। এবং টুকুনের কাছে এটাই ভীষণ বিস্ময়ের ব্যাপার যে সে এভাবে সবকিছু কবে বিশ্বাস করতে শিখল।

সুবল বলেছিল—এটা একটা আমার অহঙ্কার টুকুন দিদিমণি—মানুষের ভালোর জন্য কতটা দূরে যাওয়া যায় দেখা।

এ-কথাটাও টুকুনের খুব ভাল লেগেছিল। এবং মনে হয়েছিল—একটা বিরাট অসুখের শিকার তার মা-বাবা। কখনও সে মা-বাবাকে শান্তিতে বসবাস করতে দেখেনি। ওর ইচ্ছা হয়েছিল বলতে, আমাদের বাড়িতে এমন একটা সুন্দর ফুলের উপত্যকা গড়তে পার না! কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কারণ সে তার মায়ের ভীষণ দুটো চোখ তখন সামনে ভাসতে দেখেছিল।

আর তখন টুকুনের মা এবং বাবা ইন্দ্রকে গাড়ি বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসছিল। মনে হল ঝি চাকর পাশে কেউ নেই দু পাশের ঘরগুলো ফাঁকা। ফরাসে বাবা কাজ করে তারা বারান্দায়—মেমসাব ঢুকে গেলেই ওরা সব এদিককার আলো নিভিয়ে দেবে। কেবল বড় একটা আলো জ্বলবে গাড়ি বারান্দায়। এবং নিয়নের আলো জ্বালিয়ে রাখা হবে লম্বা করিডোরে।

একটু ফাঁকা পেয়ে আর সবুর সইছে না, টুকুনের মা কঠিন গলায় ডাকল।—শোন।

মজুমদার সাব দাঁড়ালেন।

—কাল আমি ইন্দ্রের বাবাকে কথা দেব।

—কি কথা!

—আগামী আষাঢ়েই বিয়ে। আমি আর একদণ্ড নষ্ট করতে চাইছি না।

—সে তো ভাল কথা।

—কাল থেকে টুকুনের বাইরে বের হওয়া বারণ।

—আবার যদি পুরোনো অসুখটা দেখা দেয়।

—সে অনেক ভাল।

—মন খারাপ থাকলে যা হয়, পুরণো দুঃখ ফের ফিরে আসতে পারে।

—এটা হলে আমি বেঁচে যাই।

—মা হয়ে তুমি এমন কথা বলছ!

—আমি আমার মান সম্মানটা বুঝি। তুমি তোমার কারখানা কারখানা করে সেটা পর্যন্ত হারিয়েছ।

—আর কারখানা থাকছে না।

টুকুনের মার মুখ কেমন ছোট হয়ে গেল।

—সত্যি আর থাকছে না। আমি লকআউট করব ভাবছি। ওরা স্টে-ইন-স্ট্রাইক করছে। আমি লক-আউটের কথা ভাবছি। দরকার হলে ক্লোজার।

—কিন্তু এ-সব করলে তুমি খাবে কি, আমরা খাব কি!

—সে দেখা যাবে।

ওরা এভাবে কথা বলতে বলতে ওদের শোবার ঘরের দরজায় চলে এসেছে। দুজনের ঘর আলাদা। ওরা এক ঘরে শোয় না। ভিতরের দিকে একটা দরজা আছে—যা ইচ্ছা করলে দুজনেই দুদিক থেকে খুলে ফেলতে পারে। মজুমদার সাব স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, খুব ভাবনা হচ্ছে।

টুকুনের মা এখনও যুবতী—লম্বা, চুল কোমর পর্যন্ত এবং চোখে ভীষণ মায়া। আবার এই চোখ কখনও কখনও খুব খারাপ দেখায়। মনেই হয় না টুকুনের মার স্নেহ মমতা বলে পৃথিবীতে কিছু আছে। এবং যা হয়ে থাকে, দুঃখী মুখ করে রাখলে মায়াবী এক ছবি চারপাশে দেখা যায়। তিনি তাঁর স্ত্রীকে দরজাতেই বুকের কাছে টেনে নিলেন। তারপর যা হয় দরজা খোলার তর সয় না। ওরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে যায়। মজুমদার সাব নানাভাবে অভয় দেন—আমি তো আছি, আমার লাইসেন্স আছে। উদ্যম বিহনে পূরে কিবা মনোরথ। মাঝে মাঝে যেমন যেমন কবিতাটা আবৃত্তি করতে ভালবাসেন, তেমনি এটা আবৃত্তি করে স্ত্রীকে নরম বিছানায় কিছুক্ষণের জন্য উদাসীন করে রাখলেন।

এবং এই উদাসীনতার ফাঁকে শরীরের সব কিছুর ভিতর আছে এক অহমিকা, ঠিক ঠিক জায়গায় হাত দিলে তিনি তা ধরতে পারেন। এবং এভাবে তিনি বেশ কিছু সময় স্ত্রীর শরীরে পার্থিব সুখ-দুঃখ খুঁজে যখন ক্লান্ত, তখন মনে হল চারপাশে কেমন একটা দমবন্ধ ভাব। রামনাথ ওপাশের দরজায় বসে ঝিমোচ্ছে। তাকে ছেড়ে দিতে হবে। ছেড়ে দেবার আগে বললেন, আমার ঘরের সব জানালাগুলো খুলে দে তো।

দরজা জানালা খুলে দিলেও ভিতরের কষ্টটা যাচ্ছে না। তিনি টেবিল থেকে একটা গ্লাস তুলে জল খেলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। লম্বা সিল্কের স্লিপিং গাউনের ফাঁকে শরীরের সবকিছু দেখা যাচ্ছে। পেটে তিনি এই বয়সেও চর্বি জমতে দেননি। খুব মিতাহারি। এবং শরীরের প্রতি অধিক যত্নের দরুণ নকল দাঁত থাকলেও তাঁকে এখনও যুবা লাগে। খুব যুবা। তিনি অনায়াসে নিজেকে কমবয়সী বলে চালিয়ে যেতে পারেন। যৌবন ধরে রাখার কি প্রাণান্তকর ইচ্ছা। এবার তিনি প্রথম কেমন নিরালম্ব মানুষের মত শুয়ে পড়লেন। তিনি ছোট বয়সের কথা ভাবলেন। তাঁর ছোট বয়সে মা তাঁকে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি থাকবেন। পড়াশোনা করবেন। এবং বড় দুঃখের দিন—অনেক দূরে ছিল স্কুল। গ্রাম, মাঠ, কিছু ফলের বাগান পার হয়ে যেতে হত। টিফিনের পয়সা থাকত না। রাস্তায় শীতে অথবা বসন্তে পড়ত খিরাইর জমি, তিনি এবং অন্য সব ছেলেরা মিলে খিরাই চুরি করে স্কুলের টিফিন, অথবা বর্ষার দিনে ছিল শালুক আর শাপলা, গ্রীষ্মে নানারকম ফলপাকুড়—যেমন আম, জাম, জামরুল—এভাবে একটা সময় কেটে গেছে তাঁর। এখন কেন জানি মনে হয় বড় আরামের দিন ছিল সেগুলো। আত্মীয়াটি খুব নিগ্রহ করত তাঁকে। সে-সব এখন তাঁর মনেই হয় না। বরং কি যেন একটা জাঁতাকলে পড়ে সব সময় ভীতু

মানুষের মত মুখ করে রাখার স্বভাব এখন। ভালভাবে হাসতে পর্যন্ত ভুলে গেছেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় এ-থেকে নিষ্কৃতি পেতে। নিজেই একটা নিজের গোলকধাঁধা বানিয়ে এখন যে কি করবেন ভেবে 'পাচ্ছেন না। সেই অভিমন্যুর মত ভিতরে ঢোকার পথটা বুঝি কেবল জানা আছে। বাইরে বের হবার রাস্তা তাঁর জানা নেই।

তারপর গভীর রাতে ঘুম এলে তিনি একটা ভীষণ জড়বৎ মানুষের পৃথিবীতে কিছু অস্থির ছবি একের পর এক দেখে গেলেন। ছবিগুলো তাঁর চোখের ওপর লম্বা হাত-পাওয়ালা কংকাল সদৃশ চেহারায় নাচছে। কেউ হয়ত হাত-পা বাড়িয়ে কোমর দুলিয়ে নাচছে। এবং সুন্দর এক মেয়ের চেহারা, সে এসেছে তাদের ভিতর নাচবে বলে। কেমন বায়ুহীন, অন্নহীন জগতে সে এসেছে দেবীর মত। তারপর কি যে মোহে সেই সব লম্বা হাতপাওয়ালা মানুষের ভিতর সে মিশে গেলে দেখতে পেল, ওরও হাত-পা ক্রমে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। কেমন আগুনের মত ঝড়ো হাওয়ায় ওর সব মাংস খসে পড়ছে। এখানে এলে বুঝি কেউ সঠিক চেহারায় ফিরে যেতে পারবে না। সেও নাচছে কোমর দুলিয়ে, মাঝে মাঝে হাত এত বেশী লম্বা করে দিচ্ছে যে সে ইচ্ছা করলে আকাশের সব গ্রহ-নক্ষত্র পেড়ে আনতে পারে। এবং আকাশের সবকটা নক্ষত্র হেলেদুলে যেন এটা একটা খেলা, ওরা বেশ সুন্দর মেয়ে হয়ে যাচ্ছে কখনও এবং অন্নহীন, বায়ুহীন পৃথিবীতে ওরা আকাশের সব গ্রহ-নক্ষত্র ফুলের মত পেড়ে পৃথিবীকে শ্রীহীন করে দিচ্ছে। তিনি তাঁর স্ত্রীর মুখও সহসা এদের ভিতর দেখে ফেললেন।

স্ত্রীর মুখ দেখতে পেয়েই মনে হল স্বপ্নটা খুব কুৎসিত। তিনি আরও সুন্দর স্বপ্ন পছন্দ করেন। তবে কিভাবে যে সেই সুন্দর দেখা যায়। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল—এই বাড়িটা আরও বড় হয়ে যাক। গেটে টুপি পরা দারোয়ান থাকুক। অনেক দাসদাসী, কর্মচারী, পঁচিশ-ত্রিশটা কারখানার মালিক তিনি হতে চান। আজ কলকাতা, কাল

সানফ্রান্সিসকো এভাবে বিদেশিনীদের নিয়ে স্ট্যাচু অব লিবার্টির নীচে বসে থাকা। অথবা চোখের ওপর কেন যে সেই একশ আটতলা বাড়িটা ভেসে উঠছে না। অথচ স্বপ্নের ভিতর তিনি দেখলেন একটা কাচের বোয়েম। বোয়েমটা এক দুই করে অনেক তলা। এত ছোট বোয়েমে এত তলা থাকে কি করে! স্বপ্নের ভিতর গুনতে সময় লাগে না। সেই বোয়েমে তিনি বুঝতে পারলেন একশ আটতলাই আছে। এবং হাজার, দু' হাজার তারও বেশী হবে ফ্ল্যাট। লক্ষের ওপর মানুষের চিড়িয়াখানা। বোয়েমটা একটা দণ্ডের ওপর বসানো। কেমন কেবল চোখের ওপর ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। আর যা দেখা গেল আশ্চর্য পৃথিবীটা এই একটা বোয়েমের ভিতর আশ্রয় করেছে। এবং তিনি দেখতে পেলেন সেখানে পঞ্চানন দাসের স্ত্রী সুমতির গলায় দড়ি। এটা বোধহয় আত্মহত্যা। তিনি যেহেতু পঞ্চাননকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলেন যদিও এখন পঞ্চানন ইউনিয়ন করে লিডার বনে গেছে, তবু চাকরির সুবাদে তাকে তুই-তুকারি করতে বাধে না।

—এটা তোর বৌ?

—আজ্ঞে স্যার।

—আত্মহত্যা?

—আজ্ঞে···!

—কেন?

—ঠিক জানি না স্যার। দুপুরের শিফটে খেয়ে কারখানায় গেছি —বৌ সুন্দর করে রেঁধেবেড়ে খাইয়েছে। কারখানায় খবর পেলাম যে গলায় দড়ি দিয়েছে।

—নিশ্চয়ই বকেছিলি।

—না স্যার। ইদানীং আমি ওকে কিছু বলতাম না।

—আগে বলতিস।

—আগে কথায় কথার মারধোর করেছি। অভাব-অনটনে মাথা ঠিক থাকত না। তবে আমাদের খুব মিল ছিল।

—এখন।

—এখন তো আপনার দয়ায় সে-সবের কিছু নেই।

—তবে স্টে-ইন-স্ট্রাইক করেছিস কেন।

—হুকুম স্যার।

—কার হুকুম?

—ইউনিয়নের।

—কত মাইনেতে ঢুকেছিলি?

—ত্রিশ টাকা।

—এখন কত?

—তিনশ' টাকা।

—ক' বছরে?

—ছ' বছরে।

—প্রডাকসান কত বেড়েছে?

—কিছু না।

—কতটা করতে পারিস ইচ্ছা করলে?

—তা দ্বিগুণ। মন দিয়ে কাজ করলে আমরা স্যার কি না করতে পারি?

—মন দিতে কুণ্ঠা কেন?

—যখন হয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে।

—এভাবে বেশীদিন চলে না। আমি ক্লেজার করব।

—ক্লেজার?

—কিন্তু কি কথায় কি কথা এসে গেল। তোর বৌটা আত্মহত্যা কেন করল।

—স্যার বলেছি তো জানি না।

—ঠিক জানিস। তিনি এক ধমক লাগালেন। স্বপ্নে বোধহয় তিনি জানেন, ধমক লাগালে পঞ্চানন তেড়ে আসবে না। অথবা ঘেরাও-র ভয় দেখাতে পারবে না। আর বাছাধন তো বেশ আটকে গেছে কাচের বোয়েমে। এখান থেকে বের হবার আব উপায় নেই।

তিনি বললেন, সব জানিস। পুলিশের ভয়ে এখন মুখে কুলুপ দিয়েছিস।

পঞ্চানন চুপ করে থাকল। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। তারপব াস, পুলিশ নিয়ে গেলে মিনমিনে গলায় বলল, স্যাব পয়সা হলে ক্স্টিনন্টি করার বাসনা হয়।

—সেটা কাব?

—বৌর

—তোর হয় না?

—হয়। তবে কাজ করে সময় পাই না। কারখানাব কাজ, টউনিয়নেব কাজ করে ফিরতে বেশ রাত হত। বাড়ি ফিরলে সুমতি খুব সতীসাধ্বী মুখ করে রাখত। মুখ দেখলে কেউ তাকে অবিশ্বাস করতে পারবে না। অথচ কি আশ্চর্য দেখুন, তলে তলে সে বেশ একজন নাটকের লোককে ভালবেসে ফেলেছে। টের পেলে কত বললুম—তুই ভুল করছিস। তোর ছেলেপুলেদের কথা ভাব। তখন স্যার কি বলব, সুমতি কোন জবাব দিত না। চুপচাপ সংসারের কাজ করে যেত। যেন আমি মিথ্যা মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে বলছি। সতীসাধ্বী বলে ওর কিছু আসে যায় না।

এবং যখন ফের আত্মহত্যার কথায় এল মজুমদার সাব, তখন পঞ্চানন দাঁত বের করে হেসে দিল।—হ্যাঁ স্যার, এমন একটা করে ফেলেছি। এবং এভাবেই সংসারে টাকা-পয়সা বাড়তি ঝঞ্ঝাট বয়ে আনে। কে যেন এমন বলে যাচ্ছিল। পঞ্চাননের এটা সঠিক টাকা

রোজগার নয়। সে নানাভাবে ফাঁকি দিয়ে প্রাপ্যের ঢের বেশী আদায় করেছে। সংসারে এখন এসব টাকায় একটা বাড়তি খরচা তৈরি হয় এবং এভাবেই পাপ এসে সংসারে বাসা বাঁধে।

পঞ্চানন বলল, স্যার আমরা উদ্যমশীল হলে আমাদের এমন অবস্থা হত না।

খুব ভাল লাগল এমন কথা শুনতে। যাক লোকটার ক্রমে চৈতন্যোদয় হচ্ছে। এবং সেই যে লাঠির ওপর অথবা মনুমেন্টের মত একটা উঁচু লম্বা মঠের ওপর বোয়েমটা ঘুরছে এবং নাটক হচ্ছে প্রতি ঘরে, নাটকের কুশীলবদের চাউনি প্রেতাত্মার মত দেখাচ্ছে—ওরা সবাই হাড়গোড় বের করা মানুষ, মজুমদার সাব এসব দেখে ঢোক গিললেন। মনে হল বুকে কষ্ট হচ্ছে, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে অন্ধকারে দেখলেন, কেউ তাঁর ঘর থেকে সরে যাচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, জল।

তারপর যা হয় ডাকাডাকি, লোকজন উঠে এলে, সবারই মুখে এক কথা, কি করে এ-ঘরে কেউ ঢুকতে পারে। তিনি বলে চলেছেন, জানো আমার মনে হচ্ছিল কেউ আমার গলা টিপে ধরেছে।

এভাবে স্বপ্নের ভিতর একটা ভীষণ অবিশ্বাস দানা বেঁধে যায় মানুষের মনে। মজুমদার সাবকে সকাল বেলাতে কেমন যেন খুব বিমর্ষ দেখাতে থাকল। তিনি আর রাতে ঘুমোতে পারেননি। স্ত্রীকে বলেছেন ডেকে, সে যেন তাঁর পাশে শোয়। পাশে শুলেও ভয়টা কিছুতে গেল না। কেমন সারারাত চোখ বুজে পড়ে থাকলেন। লাইসেন্সের জন্য মনটা খুব উদ্বিগ্ন ছিল। এবং কারখানার লক-আউটের ব্যাপারেও একটা ভয়াবহ টেনসান যাচ্ছে। এসব মিলে তিনি রাতের ঘটনার কার্যকারণ মেলাতে গিয়ে বুঝতে পারলেন—হিসাব ঠিক মিলছে না। তাঁর ভয়টা ক্রমে আরও বেড়ে গেল। সকালে খবর এল, সত্যি গত রাতে গলায় দড়ি দিয়ে পঞ্চাননের বৌ আত্মহত্যা করেছে।

এবং এমন খবরেই মজুমদার সাবের আবার কেমন দম বন্ধ হবার উপক্রম। তিনি বুকে এবার ব্যথা অনুভব করলেন। আবার মনে হচ্ছে গলায় শ্বাসকষ্ট। ঠিক রাতের মত অবস্থা। ডাক্তার এসে বলল, আপনাকে এবার কেবল শুয়ে থাকতে হবে। বিছানা থেকে একদম উঠবেন না। নড়াচড়া একেবারে বারণ।

মজুমদার সাব বুঝতে পারলেন হার্টটা তাঁর একেবারে গেছে। তাঁর হার্টের যখন অসুখ, এবং সংসারে এত যে সব করছেন, কেন যে করছেন, বরং এখন টুকুনকে ডেকে বললে হয়, মা তুই পারবি না, তোর সেই ফুলের উপত্যকাতে নিয়ে যেতে। যেখানে মানুষেরা নিজের জন্য ভারি সুন্দর একটা ফুলের উপত্যকা তৈরি করছে। আমারও ইচ্ছা ছিল এমন। কিন্তু কিভাবে যে আমি একটা কাচের বোয়েমের ভেতরে বাস-করা মানুষ হয়ে গেলাম!

মজুমদার সাব বুঝতে পারছিলেন, ওপরে আবার কেউ নানারকম ঝংকার তুলে নানাভাবে আশ্চর্য সব সিমফনি গড়ে তুলছে। তাঁর ভীষণ ভাল লাগছিল শুনতে। মানুষেরা সব সময় সুন্দর সব সিমফনি গড়তে চায়। গড়ায় স্বপ্ন থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পারে না। কেন যে সে একটা অসুখে পড়ে যায়!

২১

সকাল বেলা যখন এমন অবস্থা, যখন টুকুন বাবার পাশে বসে আছে এবং টুকুনের মা ভীষণ বিশ্বস্ত মুখে কাজ কর্ম করে যাচ্ছে, তখন মনেই হল না, সংসারে স্বামী স্ত্রীতে এতটুকু অবিশ্বাস আছে। বরং অসুখটা যেন দুজনকে সহসা বারমুখী থেকে ঘরমুখী করে দিল। এবং এমন একটা অসুখ নিয়ে মজুমদার সাবকে চিরদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, টুকুনের মা চিরদিন এবার নীরবে মানুষটাকে সেবা শুশ্রূষার সুযোগ পাবে। এত বছর গেছে, এমন একটা সুযোগ যেন তার এই প্রথম। ফলে সে খুব যত্ন নিয়ে দেখা শোনা করে যাচ্ছে। যদিও ইতিমধ্যে দুজন নার্সের কথা উঠেছে, এবং ওদের নিয়োগের ব্যাপারে বাইরের ঘরে কথাবার্তা চলছে তখন টুকুনের মা ভাবছে—এসব নার্স-টার্স কি দরকার, সে নিজেই যখন আছে তখন অনর্থক, নিজের মানুষটাকে পরের হাতে ছেড়ে দেওয়া কেন! তারপরই মনে হল হাতের কাছে কাজের লোক থাকলে মন্দ হয় না। সুতরাং সকাল বেলাতে যে একটা জরুরী কথা ছিল টুকুনকে বলার, সেটা বুঝি আর বলা হল না। ইন্দ্রের বাবাকেও যে বলার ছিল কিছু, এখন এই অসময়ে আর কি হবে বলে, বরং তিনি ভাল হয়ে উঠুন, তারপর সব করা যাবে।

কিন্তু মজুমদার সাব কথাটা ভোলেন নি। তিনি দেখলেন খুব বিষণ্ন মুখে বসে আছে টুকুন। সকাল বেলাতে টুকুনের এলোমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে। নাকে মুখে এসে চুল উড়ে পড়ছে। এবং রাতে একেবারে মেয়েটার ঘুম হয়নি বোঝা যাচ্ছে। চোখ ভীষণ ভিতরে ঢুকে গেছে। হয়ত টুকুন ওর মার চেঁচামেচি থেকে টের পেয়েছে, এ-

বাড়ি থেকে তাকে আর একা বের হতে দেওয়া হবে না। এমন কি, গাড়িতে ড্রাইভার থাকবে। সে আর একা ইচ্ছামত ঘুরতে পারবে না। মেয়েটার জন্য ভীষণ কষ্ট হয় মজুমদার সাবের। অথচ কেন যে মেয়েটা এ-ভাবে একটা ফুলের উপত্যকায় হেঁটে যাবার আকর্ষণে পড়ে গেল। চার পাশে টুকুনের কত সুন্দর সুন্দর ছেলেরা আছে, কত বড় বড় পার্টিতে তিনি মেয়েকে নিয়ে গেছেন অথচ, একেবারে উদাসীন টুকুন। কিছুতেই টুকুন তার বন্য স্বভাব ছাড়তে পারছে না।

মজুমদার সাব বললেন, তুমি এত চুপচাপ কেন টুকুন?

টুকুন বোকার মত এক গাল হেসে দিল। অর্থাৎ বাবাকে সে অভয় দিতে চাইল যেন—কোথায়! আমি তো বেশ হৈ চৈ করে আছি বাবা।

মজুমদার সাব এবার হেসে বললেন, আমি খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠব টুকুন।

—তোমার কিচ্ছু হয়নি বাবা। ডাক্তার বাবু অনর্থক তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে।

ওমা, একি কথা! এ যে দেখছি টুকুন একেবারে সুবলের মত কথা বলছে।

টুকুন ফের বলল, তুমি বাজে দুশ্চিন্তা ছেড়ে দাও, দেখবে ভাল হয়ে যাবে।

এখানে যেন টুকুন কোথায় প্রায় ডাক্তারসুলভ কথা বলে ফেলল। সেতো এ-বাড়ির মেয়ে। সে টের পায় সংসারের জন্য বাবাকে অনেক পাপ কাজ করতে হয়। এমন একটি স্ট্যাটাসের ভিতর বাবা উঠে এসেছেন যে তার জন্য তিনি সারাটা দিন কি না করছেন। বাবা কোথায় কিভাবে কি করছেন সে জানে না, কিন্তু বাবার মুখ দেখে সে টের পায়, উদ্বিগ্ন চোখে মুখে বাবার এক অতীব ভয়। সব সময় যেন তিনি জীবনে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। সব কিছু ঠিকঠাক

রেখে যাবার জন্য বাবার এই সব পাপ কাজ, বাবাকে খুব সহসা প্রাণহীন করে দিল।

টুকুন বলল, বাবা তুমি একটু ভাল হয়ে ওঠো। ভাল হলে তোমাকে রোজ বিকেলে এক জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে গেলে তুমি নিরাময় হয়ে যাবে।

টুকুন 'ভাল হয়ে উঠবে' না বলে 'নিরাময়' কথাটা ব্যবহার করল। নিরাময় কথাটা বলতে তার কেন জানি এ-সময় ভাল লাগল।

অর্থাৎ একদিনেই টুকুনের আশ্চর্য বিশ্বাস জন্মে গেছে, মানুষ নিজেই পারে এক আশ্চর্য সুন্দর জগৎ তৈরি করতে—যেখানে মানুষ এতটুকু নিরাপত্তার অভাব বোধ করবে না। সেখানে সবাই সবার জন্য ভাববে। এবং এমন একটা জগৎ এ-ভাবে তৈরি হয়ে যাবে একদিন। অহেতুক ভয় থাকবে না। ভয় থেকে কোন অসুখ জন্মাবে না। বাবার অসুখটা সে বুঝতে পেরেছে, ভয় থেকে হয়েছে। সব সময় এক ভয়, যা কিছু আছে মানুষেরা লুটেপুটে নিয়ে যাবে।

আবার সে বলল, বাবা ওখানে গেলে সত্যি তুমি ভাল হয়ে যাবে।

টুকুনের মার যেন এতক্ষণে মনে পড়ল কথাটা। সে বলল, টুকুন তুমি বড় হয়েছ। এখন আর একা কোথাও যাবে না। বাড়ি থেকে বের হবে না।

টুকুন বুঝতে পারল মা তাকে সেই ফুলের উপত্যকায় যেতে বারণ করছে। কিন্তু সেই ফুলের উপত্যকার কথা মনে হলেই কেমন তার চোখ বুজে আসে। সে যদি যায়, মা ভীষণ অশান্তি করবে। এবং এই অশান্তি বাবার পক্ষে আরও ক্ষতিকারক। সে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা না বললে আমি আর কোথাও যাবো না।

সে বাবার জন্য এই সংসারে কোন অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় না।

এবার টুকুন উঠে ওপরে চলে গেল। সকালে মুখ ধুয়ে সে এক

গ্রাস ফলের রস খায়। ঘরে গিয়ে দেখল, গীতা মাসি সব ঠিক করে রেখেছে। ফলের রস খেতে তার ভীষণ বিস্বাদ লাগল। সে এখন এ বাড়িতে প্রায় বন্দী জীবন যাপন করবে কোথাও গেলেই মার ধারণা হবে সেই ফুলের উপত্যকায় সে চলে গেছে।

এ-ভাবে বাড়িতে সে কিছুদিন আটকা পড়ে গেল। হেমন্তের শেষাশেষি বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। কারখানা ক্লোজারের পর খুবই বাড়াবাড়ি হচ্ছিল ক'দিক, এখন বোধ হয় ওটা সামলে উঠছেন। ইউনিয়নের তরফের লোক এসে দেখা করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ডাক্তারের দোহাই পেড়ে ওঁর সেক্রেটারি তা ঠেকিয়ে রেখেছেন।

যেমন টুকুনকে নিয়ে বাবা মা একদিন সব পাহাড়ী জায়গায় শরীর ভালো করবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন, তেমনি টুকুন তার বাবাকে নিয়ে নানা জায়গায় ক'মাস থেকে এল। যেমন কিছুদিন ওরা ছিল নৈনিতালে দেরাদুনেও গেছে। অর্থাৎ, এ-ভাবে যাবতীয় পাহাড়ী জায়গায় আশ্রয় নিয়েও যখন দেখেছে বাবার শরীরে সম্পূর্ণ নিরাময়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তখন ফের ফিরে আসা।

মাঝে মাঝে টুকুন বাবার পায়ের কাছে বসে থাকত। বাবা বুঝতে পারতেন, টুকুন কেমন বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে ফের। বাবার রুগ্ন মুখে টুকুন তা ধরতে পারলেই হেসে দিত। বলত, বাবা আমি কত যে চেষ্টা করছি, চুপচাপ আগের মত শুয়ে থাকলে কেমন হয়, সেই আগের মত নিঃসাড় পড়ে থাকতে গিয়ে দেখেছি একেবারেই ভালো লাগে না শুয়ে থাকতে। তোমাকে বলিনি বাবা, বললে কষ্ট পাবে, ভেবেছি, কম খেয়ে, না খেয়ে শরীর দুর্বল করে ফেললেই আগের অসুখটা ফের আমাকে আশ্রয় করবে। কিন্তু বাবা তোমাকে কি বলব, একবেলা না খেলেই চোখে অন্ধকার দেখেছি। তখন গীতা মাসিই হেসে বাঁচে না।

একটু হেসে টুকুন আবার বলল, আমার আর অসুখের ভিতর ফিরে যাওয়া হবে না। এভাবে সারা মাস ঘরে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে

আমার অসুখের ভিতর ফিরে যাওয়া ভাল ছিল বাবা। তোমরা আমাকে আর সেখানে যেতে দাও না।

মজুমদার সাব বুঝতে পারেন টুকুন মায়ের উপর অভিমান করে এমন একটা অসুখের ভিতর ফের ফিরে যেতে চাইছে। তিনি বললেন, তুই ভারি বোকা মেয়ে। বিয়ে হলে দেখবি, এ-সব অভিমান আর থাকবে না।

টুকুন বলল, বাবা আমার বিয়ের জন্য তোমরা এত ভাবছ কেন। যাকে আমার পছন্দ নয়, তার সঙ্গে কেন তোমরা আমাকে জুড়ে দিতে চাইছ?

কেমন মনটা খারাপ হয়ে যায় এমন কথা শুনলে। কিন্তু মেয়ের জেদ। মজুমদার সাব চুপ করে থাকেন।

টুকুন বুঝতে পারে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। সে বলল, ঠিক আছে, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই হবে।

মজুমদার সাব সেই বিকেলেই বললেন, তুই যে বলেছিলি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি। সেখানে গেলে আমি ভাল হয়ে যাব।

—তুমি যাবে বাবা?

—যাবো। কিন্তু তোর মা যদি জানে!

—তবে তুমি জানো কোথায় নিয়ে যাব তোমাকে?

—জানব না!

—কি করে বুঝলে আমি তোমাকে আমাদের সেই ফুলের উপত্যকায় নিয়ে যাব?

—পৃথিবীতে মা তুই তো একটা জায়গার কথাই ঠিক জানিস।

—টুকুন কেমন মাথা নীচু করে রাখল।

—একটু যা মিথ্যে কথা বলতে হবে।

—কি মিথ্যে!

—বলবি, আমাকে নিয়ে তুই হাওয়া খেতে যাচ্ছিস মাঠে।

—বলব।

—বলবি আমরা গ্রাম মাঠ দেখে বেড়াচ্ছি।

—বলব।

—বলবি গ্রাম মাঠের ভিতর দিয়ে গেলে নির্মল বাতাস বুক ভরে নেওয়া যায়।

—বলব বাবা।

—আর বলবি ডাক্তারের পরামর্শ মত সব হচ্ছে।

—বলব।

ডাক্তার এলে মজুমদার সাব ফিস ফিস করে বললেন, এক ভাবে শুয়ে বসে থাকতে ভাল লাগছে না হে ডাক্তার। সকাল বিকেল গাড়িতে ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়। এই যেমন ধর, বেহালার ভিতর দিয়ে গিয়ে যদি ডায়মণ্ডহারবার রোডে পড়ি। অথবা ফুলবাগান হয়ে কাঁকুরগাছি পার হয়ে সোজা সল্ট লেক, লেক টাউন পিছনে ফেলে এরোড্রাম পার হয়ে বারাসাতের রাস্তায় চলে যাই।

—খুব ভাল। ঘুরে বেড়ান না। এতে যদি মন ভাল থাকে ক্ষতির তো কিছু দেখছি না।

—তুমি একবার তোমার বৌদিকে বুঝিয়ে বল। ও তো বিছানা থেকে উঠতেই দিতে চায় না।

ডাক্তার হেসে বলল, বলব।

—আমার টুকুন মা আছে, ভারি সুন্দর গাড়ি চালায়। কাজেই বুঝতে পারছ, আজে বাজে ড্রাইভিং হবে না।

ডাক্তার বলল, ঠিক আছে। আপনার এখন ক্ষিধে কেমন ?

—কিছু না। এখন মনে হয় ডাক্তার হাওয়া খেয়ে পেট যে ভরে প্রবাদটা একেবারে মিথ্যা না।

ডাক্তার কিছু ওষুধ পাল্টে দিল। টুকুনের মা এলে বলল, বৌদি, দাদার একটু বেড়ানো দরকার। বাড়িতে বসে থাকলে মন মেজাজ দুই

খারাপ হবার কথা। টুকুন ওঁকে নিয়ে সকাল বিকেল গ্রাম মাঠ দেখে এলে মনটা প্রফুল্ল থাকবে। দেখা গেছে অসুখ অনেক সময় এ-ভাবে সেরে যায়।

টুকুনের মা বলল, আমার সঙ্গে থাকা দরকার। ঝি চাকর দিয়ে কি সব হয়! টুকুন কি সব বোঝে।

মজুমদার সাব হেসে ফেললেন, তুমি সেই সেকেলে আছ। এখনকার মেয়েরা অনেক কম বয়সেই সব শিখে ফেলে। কি বল হে ডাক্তার? টুকুন তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে। সে না পারলে আর কে পারবে।

এভাবেই ঠিক হয়ে যায় টুকুন যাবে। আর যাবে মজুমদার সাব। সঙ্গে থাকবে পুরানো চাকর রামনাথ। ইন্দ্র ঘ্যান ঘ্যান করছিল—সেও যাবে। কিন্তু মজুমদার সাব সব জানেন বলে বললেন, ইন্দ্র তোমাদের ক্লাব এবার সেমিফাইনালে উঠেছে। সবটা তোমার কৃতিত্ব। ফাইনালে ওঠা চাই। আমাদের সঙ্গে বিকেল কাটিয়ে দিলে দেখবে—ঐ পর্যন্ত। এবার যে শীল্ড ঘরে তোলা চাই।

মজুমদার সাব এভাবে বেশ ম্যানেজ করে এক বিকেলে বের হয়ে পড়লেন।

ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর করে তিনি গাড়ি-বারান্দায় এলেন। টুকুন এবং রামনাথ দুপাশে দাঁড়ালে তিনি ওদের কাঁধে ভর করে সিঁড়ি ভাঙলেন! দুপাশে সব বাড়ির এবং অফিসের কিছু আমলা কর্মচারী, ফরাসের লোক, খাস খানসামা রামনাথ সবাই মিলে বড় কর্তা বিকেলে যে বের হচ্ছেন এবং মানুষটি অসুখে ভুগলে কি যেন একটা ভয়—এত বড়ো বাড়ির বৈভব আর থাকবে না, সামনে কৃত্রিম পাহাড়ের পাশে ছোট্ট হ্রদ, হ্রদে কিছু পাখপাখালি—এমন সৌখিন বাড়ি এ-তল্লাটে হয়, না অথচ এখন কেমন বাড়িটা ধীরে ধীরে শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে। দুবছরের ওপর কারখানা ক্লোজার, দু বছরের ওপর এ-ভাবে সাব বাড়িতে শুয়ে

আছেন, দু বছরের ওপর, কারখানার শ্রমিকেরা স্টেশনে স্টেশনে কৌটো ফুটো করে পয়সা মাগছে—এসব দৃশ্য সবার মনে পড়ে গেলে ভারি খারাপ লাগে।

গাড়িতে মজুমদার সাব সামনে বসেছেন। পাশে টুকুন। টুকুনের চুল স্যাম্পু করা। ঘাড় পর্যন্ত চুল পরিপাটি বিছানো। মনে হয় দেবদেবীর চুলের মত—কি কোমল আর মিহি, হাত দিলে যেন ছোঁয়া যায় অথবা চুল স্যাম্পু করা থাকলে আকাশের মত ভারি দেখায় মুখ। চুলের ভিতর আছে আশ্চর্য এক গন্ধ। টুকুন পরেছে হালকা চাঁপা রঙের শাড়ি। শাড়িতে লতাপাতা আঁকা এবং নানা রকমের বর্ণাঢ্য শোভা —এমন একটা শাড়ির সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এবং মজুমদার সাব বেশ লক্ষ্য করে বুঝেছেন, মেয়ের খুব পছন্দ আছে—কী রঙে ওকে মানায় সে যেন জানে। আশ্চর্য স্নিগ্ধ স্বভাবের মনে হচ্ছে টুকুনকে। এবং শাড়ির এমন রঙের সঙ্গে ওর শরীরের কোমল আভা অথবা বলা যায় লাবণ্য একেবারে মিলে মিশে গেছে। হালকা প্রসাধন পর্যন্ত। ঠোঁটে যে সামান্য রঙ তাও এত স্বাভাবিক যে মনেই হয় না টুকুন ঠোঁটে রঙ লাগিয়েছে। বরং এটুকু না লাগালেই ওকে যেন এই পোশাকের ভিতর সামান্য শ্রীহীন করে রাখত।

আর এ-ভাবে এক মেয়ে—বোধ হয় এটা হেমন্তকাল—বেশ গাড়ি ছুটিয়ে যাচ্ছে। সে দোকান থেকে ফুল আনার সময় সুবলের কিছু খোঁজ খবর রেখেছে। কারণ শহরের সব ফুলের দোকানগুলো বলে দিতে পারে সুবলের কথা, সুবলের ফুল একদিন এই শহরে না এলে সব অন্ধকার ছাখে, সেই সুবলের খোঁজ খবর সব তার কাছে থাকবে সে আর বেশি কি—এবং এ-ভাবে সেও তার খোঁজ খবর সুবলকে দিয়ে গেছে। সুবলের ঐটুকুই লাভ। সে টুকুন দিদিমণির চিঠি অতি যত্নে রেখে দিয়েছে। সে তার জন্য তপোবনের মত আলাদা একটা আশ্রম করে দিয়েছে। বুড়ো মানুষটা মারা গেছে গত শীতে।

কাঞ্চন ফুলের চারপাশে সবুজ ঘাসের কাঠা চারেকের মাঠ। সেখানে ঘাসের ছায়ায় কাঞ্চন ফুলের সৌরভে বুড়ো মানুষটা বেশ আছে। তার কবর শান বাঁধানো। কাঞ্চন ফুল দিন-রাত পাঁপড়ি ফেলছে সেখানে। বিকেলে যখন হাতে কোন কাজ থাকে না, সুবল সেই ঘাসের ভিতর কাঞ্চন গাছটার নীচে চুপচাপ বসে থাকে। এ-সব খবর টুকুন দিদিমণিকে সে তার লোক মারফত জানিয়েছে। সে চিঠি লিখতে আজকাল পারে। কিন্তু হাতের লেখা এত খারাপ যে দিদিমণিকে চিঠি লেখতে লজ্জা পায়। টুকুন দিদিমণির সঙ্গে কত দিন দেখা নেই—বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না, সে যেন বুঝতে পারে টুকুন দিদিমণি বাবান্দায় অথবা রেলিঙে কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারলেই ওর ভীষণ কষ্ট হয়—সব ফেলে চলে যেতে ইচ্ছা হ —কি এক আকর্ষণ শরীরে তার—কিন্তু টুকুন দিদিমণির অপমান ওর কাছে আরও কষ্টকর। এখন তো সে আর আগের মত পাঁচিল টপকে যেতে পারে না। সে কেমন যেন ক্রমে স্বভাবে শহরের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। গাড়িগুলো শহরে ফু নিয়ে যাচ্ছে—তাদের টংলিং টংলিং শব্দ কানে এলে চোখ বুজে পৃথিবীর যাবতীয় সুষমা সে শুষে নিতে পারে। এবং টুকুন দি দমণিব আশ্চর্য ভালবাসা সে তখন ভিতরে ভিতরে বড় বেশী অনুভব করতে পারে।

মজুমদার সাব বললেন, তোর সুবল বাওবাব গাছ দিয়ে কি করবে রে টুকুন?

টুকু এমন কথায় ভীষণ লজ্জা পেল। বলল, বাওবাব গাছের কথা তুমি কি করে জানলে?

—সে জেনেছি।

—ওটাতো বাবা একটা গল্পের গাছ।

—মানে!

—মানে ছোট্ট রাজপুত্রের একটা দেশ আছে। সেটা একটা ছোট্ট

গ্রহাণু। শিশুদের জন্য লেখা গল্প। সেখানে বাওবাব গাছের কথা আছে।

—তুই জানিস না, বাওবাব বলে সত্যিকারের গাছ আছে। জায়গায় জায়গায় নামটা পাল্টে যায়।

এখানে রাস্তাটা একটা বড় পুকুরের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে বলে টুকুনকে খুব ধীরে ধীরে টার্ণ নিতে হল। এখন হেমন্তকাল বলে বেশ শীত শীত ভাব। চারপাশে ধানের জমি। কাঁচা পাকা ধানের মাঠ। চাষীরা মাঠের আলে আলে দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করছে। কারণ বোঝাই যায়—ধান তোলার সময় হয়ে আসছে। খুব খুশী ওরা, ফসল ভাল, এবং এভাবে এই মাঠের সব জমি, চাষীদের মুখ, আকাশের নীলিমা এবং কিছু পাখীর কলরব টুকুনকে ভীষণভাবে আপ্লুত করছে। সে বাবার শেষ কথাটা ঠিক মন দিয়ে শুনতে পায় নি।

মজুমদার সাব ফের বলে যাচ্ছেন—আমি একটা বইয়ে পড়েছি, কেনিয়াতে কাণ্ডুবার জঙ্গলে এই গাছ আছে। ছবিতে যা দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছে ঠিক আমাদের দেশের বাবলা গাছের মত। আমার মনে হয় সুবল সেজন্য বাওবাব খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—আমি ঠিক জানি না বাবা। সুবলকে জিজ্ঞাসা করে দেখব।

—তোর মনে আছে যখন প্রথম সুবল গাড়িতে উঠে এসেছিল?

—মনে আছে বাবা।

—খুব হাসি পেত দেখলে। ওর পাখিটার খবর কিরে?

—সে ওটা ছেড়ে দিয়েছে বাবা।

তারপর ওরা সেই ফুলের উপত্যকাতে ধীরে ধীরে গাড়ি এগিয়ে নিল। বড় রাস্তা। তারপরই উঁচু নিচু মাঠ, চন্দনের গাছ, এবং নানারকম লতাগুল্মের বন। বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা নেমে গেছে, একটু বন থেকে বের হলেই সামনে এক বিস্ময়কর দেশ। নানা জায়গায় নানা ফুল। ওরা দূর থেকেই ফুলের গন্ধ পাচ্ছে। এত সব ফুলের

গন্ধ মিলে, যেমন গোলাপ, রজনী গন্ধা, গন্ধরাজ, চামেলি, চাঁপা, বেল ফুল এবং টগর, যুঁই—কত যে সব ফুল এবং ফুলের বাস—

মজুমদার সাব বললেন, টুকুন সুবল এখন একটা দেশের রাজা।

টুকুন বলল, না বাবা, সে রাজা নয়। সে বলে, সে এর কিছু নয়। যারা কাজ করে তারাই সব। এবং সে দেখেশুনে বেড়ায় বলে তার একটু থাকবার জায়গা ওরা দিয়েছে। ঐ যে দূরে দেখছ, উঁচু জায়গায় আশ্রমের মতো ঘর, ওখানে সুবল থাকে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না, টংলিং টংলিং শব্দ, দেখতে পাচ্ছ না, তুমি দেখতে পাবে না, ওপাশের রাস্তা দিয়ে একটা ফুলের গাড়ি চলে যাচ্ছে। তোমার কষ্ট হচ্ছে নাতো হাঁটতে? আমি তোমাকে ধরব?

মজুমদার সাবের এই প্রথম মনে হল তাঁর শরীর ভাল নেই। এ-ভাবে হেঁটে যাওয়া ঠিক না, কিন্তু আশ্চর্য, তার কষ্ট হচ্ছে না, তিনি বেশ হেঁটে যেতে পারছেন।

মজুমদার সাব বললেন, টুকুন আমি বেশ হেঁটে যেতে পারছি রে।

—আমি তোমাকে ধরব!

—কি বলছি!

—তুমি যদি পড়ে টড়ে যাও?

—সুবলটা কোথায়?

—এখন সূর্য অস্ত যাবার সময়। সে হয়তো যারা খাটে তাদের এখন আগামী কালের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছে। ওদের টাকা পয়সা, সে এখানে নতুন দেশ গড়েছে বাবা। মানুষের জন্য একটা ভালো আবাস তৈরি করেছে।

মজুমদার সাব হেঁটে যাচ্ছিলেন। যেন ভিতরে থাকে মানুষের এক দুর্জ্জয় ইচ্ছা, সেই শৈশব থেকে স্বপ্ন, বড় হওয়ার স্বপ্ন। মানুষের মতো মাথা উঁচু করে হেঁটে যাবার স্বপ্ন, সব তাঁর হয়েছে, অথচ কোথায় যেন তিনি মানুষের চিরটা কাল অনিষ্ট করে বেড়িয়েছেন।

সুবলের মত তার জীবনেও ছিল অসীম দুঃখ দারিদ্র—তিনি তা জয় করতে গিয়ে এটা কি করে ফেলেছেন! বড় হতে যাওয়ার মানে কেমন বদলে যাচ্ছে ক্রমশঃ। সুবলকে দেখে, সুবলের উপত্যকা দেখে তাঁব মনে হল, পৃথিবীতে এভাবে বড় হলে অনেক পাপ থেকে মানুষ বেঁচে যায়। তিনি কেমন এবার দ্রুত হাঁটতে থাকলেন। সেই কুটীরে ওঁর যাওয়া চাই। সেখানে গেলেই বুঝি তিনি আশ্চর্যভাবে ঠিক ঠিক নিরাময় হয়ে যাবেন।

২২

এ ভাবেই এখানে প্রতিদিন সূর্য ডোবে। ও-পাশের বনের ভিতর মনে হয়, সূর্য হারিয়ে যায়। কখনও হলুদ রঙ নিয়ে, কখনও বেগুনি অথবা নীল নীসিমাতে আগুন ছড়িয়ে সূর্য রোজ ও-পাশের কাটায় হারিয়ে যায়। বনের পাখিরা ডাকে। নদীতে বড় বড় গাছের ছায়া ধীরে ধীরে নেমে আসে এবং এ-ভাবে পৃথিবী ক্রমে অন্ধকার হয়ে ওঠে।

সুবল লোকজনদের বিদায় করে নিজের আশ্রমের মতো ঘরের বারান্দায় বসে থাকে। সে দেখতে পায় পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। গাছের ছায়া লম্বা হয়ে যাচ্ছে, নদীর জলে অন্ধকার নেমে আসছে। এ-সময়টাতে ওর এভাবে চুপচাপ নিরিবিলি বসে থাকতে ভাল লাগে। আর এ-সময় মনে হয় কেউ আসবে, ঠিক পালিয়ে চলে আসবে সে তাকে বেশি দিন না দেখে থাকতে পারে না। এমন একটা আশ্চর্য ফুলের উপত্যকা আর কোথাও নেই সে জানে। আর তখনই মনে হয়, দূরে ছায়াছবির মতো ভেসে উঠছে টুকুন দিদিমণি। এমন ফুলের উপত্যকা পেয়ে টুকুন দিদিমণি প্রায় যেন ভেসে ভেসে চলে আসছে। সে চোখ মুছে ফের উঠে দাঁড়াল। না, সে অলীক কিছু দেখছে না, ওর ভিতরটা কি যে করছে! টুকুন, হালকা বাদামী রঙের প্রায় ফুলের গাছগুলো মাড়িতে ছুটে আসছে। সঙ্গে কেউ আছে, বয়সী মানুষ, তিনিও যুবকের মতো হেঁটে আসছেন। সুবল বুঝতে পারছে না, টুকুনের সঙ্গে কে আসছে! তার বারান্দা ফুলের ডালপালায় ঢাকা। ওর ভিতর থেকেই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, টকুন দিদিমণি, আমি এখানে।

এখন হেমন্তের সময়। হেমন্তে ফুলের চাষ তেমন জমে না। মানুষজন যারা আছে, খেটে খেটে হয়রান, পামপে জল তুলে আনছে, নদী থেকে জল এনে অসময়ে সে যা চাষাবাদ করছে ফুলের, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না দূরে দূরে সব সাদা কোঠাবাড়ি, ছবির মতো উজ্জ্বল এক ছোট্ট ছিমছাম শহর যেন। পাকা রাস্তা চলে গেছে উপত্যকার ভিতর দিয়ে। নানা জায়গায় সব জলের ফোয়ারা এবং অসময়ে সব ফুলেরা ফুটে আছে। শীতে সে মাইলের পর মাইল গোলাপের চাষ করে থাকে, কে কত বড় গোলাপ ফোটাতে পারে— সুবলের কাছে কে কত বড় মানুষ তার দ্বারা প্রমাণ হবে। আমি এক মানুষ, আমার আছে এক বড় অহঙ্কার, ফুলের মতো ফুল দ্যাখো কি করে চাষাবাদ করে গড়ে তুলেছি। সুবলের মনে হল তখন, টুকুনের কেউ এসেছে সঙ্গে। ওরা, চাঁপা ফুলের যে সব সারি সারি গাছ আছে তার নীচ দিয়ে হাঁটছে। মেহেদী পাতার গাছ চারপাশে সবুজ হয়ে থাকে বলে কি যে সুন্দর লাগে সুবল যখন হেঁটে যায়। লম্বা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী, ঢোলা সাদা রঙের পাজামা আর ঘাসের চটি, সুবলকে তখন কেমন বনের দেবতা টেবতা মনে হয়।

সুবল কাঞ্চন গাছের নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। দুটো একটা কাঞ্চন ফুল এখনও ফুটছে। সাদা পাঁপড়ি বুড়োমানুষটার সমাধিতে পড়ছে। আর চারপাশে কি সবুজ ঘাস, ঘাসে এখন সব সাদা ফুল, সব ফুলগুলোই যেন বলছে, আমরা বুড়োমানুষটার হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব। ফুলগুলো দেখলে সুবলের এমনই মনে হয়। সে আর সেখান থেকে বেরতে পারে না।

সুবল কাঞ্চনের ডাল মুখের ওপর থেকে সরিয়ে ফেলতেই দেখল, ও আর কেউ নয়, টুকুনের বাবা। সে প্রথমে অবাক, তারপর কেমন অস্বস্তি, তারপর মনে হল বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়ার সামিল, বোধ হয় এক্ষুনি তিনি তাকে তাড়া করবেন, অথবা যেমন তিনি মানুষের সূর্য

বগলদাবা করে পালাচ্ছিলেন, এখানেও তিনি তেমন কিছু করে ফেলবেন। দূরে, নদীর পাড়ে তার দামী গাড়িটা। ডিমের মতো ঘাসের ওপর ভেসে আছে গাড়িটা। সূর্যাস্ত, বনের ছায়া, নদীর জল, সব মিলে সাদা রঙের গাড়িটাকে অতিকায় রাজহাঁসের ডিম ছাড়া ভাবতে পারছে না সুবল। টুকুনের বাবাকে দেখে সে সত্যি ঘাবড়ে গেছে। সে আর পালাতে পর্যন্ত পারল না। ফুলের উপত্যকায় সে একজন বনবাসী মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

অথচ তিনি কাছে এসে বললেন, বাওবাব গাছ এনেছি হে।

সুবল ভেবে পেল না এমন কথা কেন! বলল, বাওবাব গাছ!

—কেন টুকুন যে বলল, তোমার এমন সুন্দর ফুলের উপত্যকাতে একটা বাওবাব গাছ না থাকলে মানাচ্ছে না।

সুবল কেমন সহজ হয়ে গেল। ওর আর টুকুনের বাবাকে ভয় থাকল না। সে ভেবেছিল, আবার কি ঘটেছে, টুকুনকে নিয়ে কি অশান্তি দেখা দিয়েছে সংসারে যে, টুকুনের বাবা এখানে পর্যন্ত ছুটে এসেছেন! সে তো আর যায় না। টুকুনের মা ওর যাওয়া পছন্দ করেন না, এ-নিয়ে বড় অশান্তি গেছে, সে টুকুনকে যেহেতু টুকুন দিদিমণি ডাকে, সে-জন্য তার কোন অশান্তি ভাল লাগে না সে দেখল তখন টুকুনও কেমন সহজ হয়ে গেছে। পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। হাসতে হাসতে বলছে, তুমি আমাকে বলতে না, একটা বাওবাব গাছ পেলে এই উপত্যকাতে লাগিয়ে দিতে।

--কিন্তু সে তো রূপকথার গাছ। ছোট্ট রাজপুত্রের দেশে পাওয়া যায়।

টুকুনের বাবা বললেন, ছোট্ট রাজপুত্রের দেশে যা পাওয়া যায়, এখানে তা থাকবে না সে কি করে হয়!

সুবল বলল, আজ্ঞে তা ঠিক। আমার খুব ইচ্ছা—পেলে লাগাই। তবে রূপকথার গাছ তো. পাওয়া যায় না। যা কিছু ভাল, এই

ফুলগাছ, লতাপাতা সব এনে লাগাতে ইচ্ছা হয়। তবে গল্পের গাছ তো পাওয়া যায় না। টুকুন দিদিমণি জানে সব। ওটা একটা অন্য গ্রহের গল্প।

—এস। বলে তিনি সুবলের আশ্রমের মতো ঘরটার দিকে হাঁটতে থাকলেন। হাঁটতে হাঁটতেই বললেন, সব গ্রহের গল্পই আমরা বানিয়েছি। ছোট্ট রাজপুত্রের গ্রহটাতে একজনের মতো থাকার জায়গা আছে।

—তা আছে।

—ওর একটা ভেড়ার বাচ্চা আছে।

—তাও আছে।

—ওর গ্রহের সমুদ্র শুকিয়ে যাবে ভয়ে পাতায় ঢেকে রাখে।

—তা রাখে।

—আসলে আমরা চাই যে গ্রহেই মানুষ থাকুক, ঈশ্বর তার থাকা খাওয়ার নিরাপত্তা রাখবেন। রাজপুত্রেরও তা ছিল।

সুবল ভেবে পাচ্ছে না এমন সুন্দর সুন্দর কথা টুকুনের বাবা কি করে বলছেন। সে তো জানে টুকুনের বাবার খুব অসুখ। স্ট্রাইক, লক-আউট, ক্লোজার নানা রকমের হাঙ্গামায় মানুষটা হৃদরোগে ভুগছেন। অথচ এখানে একেবারে অন্য মানুষ। যদিও এই মানুষটা তার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেননি। টুকুনের জন্য ভীষণ মমতা তাঁর। টুকুন যা ভালবাসে, তিনিও তা ভালবাসেন। টুকুনের জন্য সুবল যখন ফুল নিয়ে যেত, দেয়াল টপকে, টুকুনের ঘরে পালিয়ে ফুল দিয়ে আসত, তখন সে জানত না ধরা পড়লে খুব সহজভাবে তিনি বলবেন, বড় বাড়িতে এ-ভাবে আসতে নেই। সদর দিয়ে আসবে। টুকুনের তো সময় থাকে না। রোববারে আসবে। বিকেলে সে তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারবে। রোববারের বিকেলে টুকুনের কোন কাজ থাকে না।

টুকুনের বাবা বললেন, এসে খুব ভাল লাগছে। এমন একটা ফুলের উপত্যকা কোথাও থাকতে পারে জানা ছিল না। আমি তো বেশ হেঁটে যাচ্ছি, হাত তুলে তিনি বললেন, ডাক্তারদের কথা আর শুনছি না। বেশ আছি হে। তা তুমি কেমন লাভ টাব কর!

—লাভ!

—এই ফুল বেচে! টুকুন বলল, তোমার নাকি লাখ টাকার ফুল বিক্রি হয় মাসে! তারও বেশি। এত টাকার ফুল বিক্রি করে খুব লাভ হওয়ার কথা।

—লাভ টাব বলে তো কিছু নেই।

—তবে কি আছে?

—যা আছে তাকে আরও বাড়ানো।

—সেটা কার জন্য?

—যারা কাজ করে, যারা এখানে থাকে খায়···

—তবে তুমি কে?

—আমিও কাজ করি।

—কিন্তু বুড়ো মানুষটা তোমাকে দানপত্র করেছে না।

—তা করেছে।

—তবে তুমি মালিক। তোমার এখানে লেবার আনরেস্ট নেই শুনেছি।

সুবল বুঝতে পারল, বিষয়ী মানুষ, তিনি বিষয় আশয় ছাড়া বোঝেন না। সে তাঁকে বলল, বসুন।

তিনি এমন বড় উপত্যকার বিচিত্র বর্ণের সব ফুল এবং মানুষেরা এখনও কেউ কেউ কাজ করছে দেখে কেমন অবাক। —এরা বুঝি ওভার-টাইম খাটছে।

সুবল বলল, না। কাজ বোধ হয় শেষ করে উঠতে পারেনি।

—তোমার ফুলের গাড়ি কখন যায়?

—ভোর রাতে।

—কতজন লোক এখানে কাজ করে?

—তা অনেক হবে তার হিসাবটা···

—তুমি কি হে। কোন হিসেবপত্র রাখ না।

—না, মানে কি জানেন সবাই কাজ করে না তো। সবাই

—ওরা কোথায় থাকে?

তিনি বললেন, এ-পাশের ছোট্ট একটা ছিমছাম শহরের মতো চোখে পড়ল ওখানে কারা থাকে?

—এরা থাকে

—এ-সব তুমি ওদের করে দিয়েছ।

—আমি করিনি। ওরা নিজেরাই করে নিয়েছে

তা হলে তোমার এখানে সত্যি গোলমাল হয় না।

সুবল হেসে বলল, কিসের গোলমাল?

—এই বোনাস নিয়ে, ইনক্রিমেণ্ট নিয়ে।

সুবল ভেবে অবাক হয়ে যায়, এ-সব কথা সে শোনেনি। যখন সবই ওদের, ওরা যৌথভাবে খেটে এমন একটা উপত্যকা বানিয়ে ফেলেছে, তখন কেন যে ওরা গোলমাল করবে, বুঝতে পারে না।

টুকুনের বাবা বললেন, সুবল তোমাকে আর চেনা যায় না। টুকুন তোর মনে আছে আমরা ট্রেনে আসছিলাম, তখন বিহার পূর্ণিয়া অঞ্চলে কি খরা। নীল রঙের বেতের চেয়ারে বসে তিনি কথা বলছিলেন। একটা নীল রঙের লণ্ঠন কেউ জ্বেলে দিয়ে গেছে। তিনি ফের বললেন তোমার পাখিটার কথা খুব মনে হয়।

সে অনেকদিন আগের কথা। ওরা তিনজনই মনে করতে পারে—কোথায় কবে এক প্রচণ্ড খরায় সব জ্বলে যাচ্ছিল, একদল তৃষ্ণার্ত লোক ট্রেন আটকে জল লুট করেছিল, এবং সুবল, সেও এসেছিল জল খেতে। জল খেতে এসে অবাক. এক মেয়ে কি সুন্দর, মোমের পুতুলের মতো

বাংকে শুয়ে আছে, উঠতে পারে না, কথা বলতে পারে না, কেবল চেয়ে থাকে, আর কি সুন্দর মুখ তার, দেখতে দেখতে সুবল অবাক হয়ে যায়। জল পান করতে হবে, অথবা সে তার তেষ্টার কথা ভুলে, কেমন ভেবে পায় না, কোথাও এমন সুন্দর মোমের মতো নরম চোখ অথবা কুচফলের মতো নাক থাকতে পারে। সে মেয়েটিকে তার জ্যাবের পাখির খেলা দেখিয়েছিল। সুবল, এক আশ্চর্য বালক, যাদুকরের সামিল তখন। টুকুনের বাবা দেখেছিলেন, টুকুন সুবলকে বাংকের নীচে লুকিয়ে রেখেছে, পুলিস এলে বলেছে না নেই, এ-কামরায় কেউ আসেনি। যে মেয়ের মরে যাবার কথা, যার কঠিন অসুখ, যে ক্রমে স্থবির হয়ে যাচ্ছে তার এমন স্বাভাবিক কথাবার্তা শুনে তিনি চোখ বড় করে ফেলেছিলেন। অথচ টুকুনের মা-র কি যে স্বভাব, কোথাকার এক নচ্ছার ছেলে উঠে এসেছে, তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি, চাল নেই, চুলো নেই, হয়তো মন্ত্র-টন্ত্রও জানে, মেয়েটাকে বশ করার তালে আছে, প্রায় জোরজার করে ব্যাণ্ডেলে গাড়ী এলে তিনি সুবলকে নামিয়ে দিয়েছিলেন।

অথচ সুবল মনে করতে পারে, এক হাসপাতালে আবার দেখা টুকুনের সঙ্গে। সে তার পাখিটাকে নিয়ে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে ডাব কেটে বিক্রি করত। সে ভেবেছিল, তখন শহরে এটাই সবচেয়ে ভাল কাজ। সে প্রায় নিজের মতো করে একটা জলছত্রও দিয়েছিল। আরও অনেক কাজ, এবং কাজের ভিতরই সে ফের হাসপাতালের জানালায় আবিষ্কার করেছিল টুকুন দিদিমণিকে। সে তখন প্রাণপণ, সেই জানালায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর নানা রকম আশ্চর্য গল্প, রূপকথার গল্প, যাদুকরের দেশে মুণ্ডমালার গল্প বলে টুকুন দিদিমণিকে সাহস দিত। বেঁচে থাকতে বলত। কারণ সে বিশ্বাস করতে পারত না, পৃথিবীতে সুন্দর মেয়েরা কখনও মরে যায়।

সুবলের এমন প্রাণপণ খেলা দেখে টুকুনেরও ভারি ছুটতে ইচ্ছা হত। টুকুন এই যে এখন বসে আছে, সুবল বসে রয়েছে সামনে,

বাবা পাশে, বাবা সন্দেশ দুধ খাচ্ছেন, সুবল চা খাচ্ছে, সে চা ডিম ভাজা খাচ্ছে, এরই ভিতর যেন এক আশ্চর্য সৌরভ সে পায় সুবলের শরীরে, সুবলের কথা মনে হলেই সেই সব পুরনো দিনের কথা মনে হয়—এবং সুবলই পৃথিবীতে একমাত্র বাওবাব গাছ খুঁজে আনতে পারে—তার বিশ্বাস হয়। সে ভাবতে থাকে, সুবল না থাকলে, সে বুঝতে পারত না, ছোট্ট রাজপুত্রের কোন গ্রহাণু থাকতে পারে, আর সেখানে আগ্নেয়গিরির মুখ ঢেকে রাখার জন্য বাওবাব গাছের পাতা লাগে।

তারপর আবও কি সব দিন গেছে টুকুনের। সুবল একবার এল ফুল নিয়ে। সব দামী দামী গোলাপ, তখন সুবলকে চেনা যেত না। সে পালিয়ে আসত, আব কি বোমাঞ্চ, সে এলেই মনে হত শরীরের যাবতীয় অসুখ কেমন সেরে গেছে। টুকুন তখন নাচতে পারত, সে জোরে পিয়ানোতে নানা বর্ণেব স্বব তুলতে পারত। যেন কবিতার মতো এক প্রাণ আছে সুবলেব চোখে মুখে, সুবল এলেই শরীরের সব কষ্ট এক মায়াবী সৌরভে মুছে যেত। ঘরের সাদা অথবা হলুদ রঙের দেয়ালে টুকুন মাঝে মাঝে তখন বনের দেবী হয়ে যেত।

এবং এ-ভাবে এক শাহান-সা মানুষ, সব অহঙ্কার মুছে আজ এখানে চলে এসেছেন। সুবলের ভারি ভাল লাগছে। তিনি বললেন, তোমার বুড়ো মনুষটা কোথায় থাকত?

—এ-ঘরেই।

—তোমাকে খুব ভালবসতেন তিনি?

টুকুন বলল, বাবাকে দেখাবে না। অর্থাৎ টুকুন বাবাকে সেই বুড়ো মানুষটার সমাধি দেখাতে চায়। কতদিন টুকুন পালিয়ে এসে সবুজ ঘাসে কাঞ্চনের ছায়ায় চুপচাপ বসে রয়েছে। কতদিন পালিয়ে এসে বেশ রাত করে ফিরেছে। টুকুনের মা শেষ দিকে নানাদিক ভেবে ওর বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরিবারের

মান-সম্মানের কথা ভেবে, তা ছাড়া টুকুনের এটা পাগলামি ছাড়া কি, কোথাকার এক ফুলয়ালা, যার চাল নেই চুলো নেই, শহরে এখন ফুল বিক্রি করে খায়, তেমন এক মানুষের সঙ্গে টুকুনের এ-সব ঘটনা বড় পীড়াদায়ক। তিনি টুকুনকে আর বের হতে দিতেন না।

আর বিকেলে কি মনে হয়েছিল টুকুনের বাবার, হঠাৎ এ-সব মনে হতেই বুঝি ভিতরে একটা গোলমাল দেখা দেয়। যা এতদিন সত্য জেনেছেন, সব মনে হয় অহমিকার কথা। সেই ফুলয়ালার কাছে যেতে মনে হয়। টুকুন নিশিদিন যায়, গল্প করতে ভালবাসে।—বাবা, সুবল তো তোমার মতো ভাবে না, সে তো তোমার মতো দুঃখ পায় না। সেখানে তো তোমার মানুষদের মতো মানুষরা কাজ করছে। নদী থেকে জল আনছে। লতাপাতা থেকে সার বানাচ্ছে চারপাশে নানা রকম পাম্প সেট, যখন যেখানে জল দরকার চলে যাচ্ছে। কারো নালিশ নেই, কারো তেমন ব্যক্তিগত উচ্চাশা নেই, বেশ তো আছে ওরা। সারা উপত্যকাময় কি সব সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে।

এবং এ-ভাবেই তিনি মেয়েকে নিয়ে এসেছেন এখানে। স্ত্রী জানেন না। মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। যেন দেখতে চান, যথার্থই পৃথিবীতে কোন ফুলের উপত্যকা গড়ে উঠতে পারে কি না। তিনি বললেন, চল, কাঞ্চন গাছগুলোর নীচে গিয়ে বসি।

সুবল বুঝতে পারল, তিনি সেই বুড়ো মানুষটার সমাধির পাশে বসে থাকতে চান। সুবল যেতে যেতে বলল, বুড়ো মানুষটার একমাত্র অহঙ্কার ছিল, কেউ ওর মতো ফুলের চাষ জানে না। ফুলের দালালরা ঠকিয়ে ফুল নিয়ে যেত, কিছু মনে করতেন না। কেবল বললেই হতো, মিঞাসাব আপনার ফুলের মতো ফুল আর কার আছে। তিনি তার পরিশ্রমের পয়সা পেতেন না। একটু থেমে বলল, ফুলের দালালী করতে এসে এখানে থেকে গেলাম। কেমন বুড়োমানুষটার জন্য মায়া

হল। এর কাজ করতে কষ্ট হলে কাজ করে দিতাম। বন থেকে পাতা এনে দিতাম। পাতা পুড়িয়ে তিনি জমির সার বানাতেন। তাঁর কাছে আশ্চর্য সব খবর জেনে নিলাম। তার ফুলের চাষ এত কেন ভাল, বনের কোন্ গাছ, কি পাতা কোন্ সময়ে পোড়ালে কোন্ ফুলের উপকারে আসে, পৃথিবীতে কেউ বোধ হয় ওঁর চেয়ে তা ভাল জানতেন না। তখন বুড়োমানুষটার আমি বাদে আর কেউ ছিল না।

বাবা বললেন, সুবল তোমার অহঙ্কার হয় না? এত বড় একটা ফুলের উপত্যকা তুমি গড়ে তুলেছ এখানে সব মানুষের জন্য রেখেছ সমান দায়িত্ব, বড় শহরে সকালে যার সারি সারি ফুলের গাড়ি, তোমার মনে হয় না, রাজার মতো বেঁচে আছ?

সে বলল, আজ্ঞে না। আমার তখন বুড়োমানুষটার কথা মনে হয়।

—কি বলেন তিনি?

ওরা সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে বসে রয়েছে। টুকুন এখন নানা বর্ণের ফুলের ভিতর ঘুরেফিরে কেমন মজা পেয়ে গেছে, সামান্য জ্যোৎস্নায় ওর ছুটতে পর্যন্ত ইচ্ছা করছে। তখন সুবল বলছে বুড়োমানুষটার কথা। সে বলল, তিনি বলতেন, আল্লা খুব সরল। তিনি চান পৃথিবীতে সরল এবং ভালমানুষরা সুখে থাকুক। তারপরই সুবল কেমন চুপ হয়ে যায়। একটু পরে থেমে থেমে সুবল বলল, তিনি বলতেন, সব লতাপাতার ভিতর, ফুলফলের ভিতর এবং সব গ্রহ-নক্ষত্র, অথবা এই যে সৌরলোক, যা কিছু আছে চারপাশে, সবার ভিতর তিনি আছেন। কোন উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন। তিনি রাজার রাজা। তিনি সবচেয়ে প্রাজ্ঞ। যা কিছু আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে—সব তাঁর। তিনি জানেন সব কিছু। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁর অন্তলোকের রহস্য। তিনিই জানেন একমাত্র কি আছে সামনে আর কি আছে পেছনে।

তাঁর আসন আকাশ আর পৃথিবীর ওপরে বিস্তৃত। আর এ-দুয়ের তিনি নিশিদিন রক্ষাকারী। তার জন্য তিনি ক্লান্ত বোধ করেন না।

সুবল কি দেখল এবার। সে দেখল টুকুন ঘাসের ভিতর কাঞ্চন ফুলের পাঁপড়ি সংগ্রহ করছে। কি সুন্দরভাবে উবু হয়ে বসেছে। কি মায়ায় ভরা মুখ। সে কিছুতেই বেশি আশা করতে পারে না। সে বলল বুড়োমানুষটার কথা মনে হলে নিজেকে কিছুই ভাবতে ভাল লাগে না। এমন কথা শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে কি না জানি না।

টুকুনের ভারি আশ্চর্য লাগে সেই সুবল, ফুটপাতে যে ঘুরে বেড়াত যার কোন ঠিকানা ছিল না, নিজের বলতে কিছু ছিল না, কি করে সেই মানুষ এমন সুন্দর একটা ফুলের উপত্যকা যা মাইলব্যাপী কি তারও বেশি হবে, কতদূর গেছে সে ঠিক জানে না, কিভাবে গড়ে তুলেছে।

সুবল ফের বলল, তিনি প্রায়ই মুসার কথা বলতেন। বলতেন বারোটি প্রস্রবণের কথা। লোকদের জন্য তিনি জল চাইলেন। মরুভূমিতে কোথায় জল। অথচ দৈববাণী, মুসা তার লাঠি দিয়ে বারোটা পাথরে বাড়ি মারলেন। জল উপছে উঠল। ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবণ। মুসা বললেন, জল পান করো মনুষ্যগণ। আল্লাহ যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও আর পান করো। অন্যায়কারী হয়ে দেশে অপবিত্র আচরণ করো না।

সামান্য জ্যোৎস্নায় টুকুন বুঝতে পারল, বাবার মুখ কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। আসলে কি সুবল বাবাকে অন্যায়কারী ভাবছে। অন্যায়কারী ভেবে গল্পটা বলছে! বাবাও কি ভেবে ফেলেছেন তিনি অন্যায়কারী। সংসারের জন্য তিনি অনেক অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। রাতে এ জন্য তিনি ঘুমোতে পারেন না। মনে হয় কেউ তাকে গলা টিপে মারতে আসছে।

তারপরই বাবার মুখ ফের কেমন সরল সহজ হয়ে যায়। তিনি

বলতে থাকেন তোমার এখন শুধু দেখছি একটি বাওবাব গাছ হলেই হয়ে যায়।

সুবল কেমন বোকার মতো বলে ফেলল হয়ে যায়।

টুকুন হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারছে না। কারণ সুবল বাবার কথা ঠিক ধরতে পারছে না।

আর এ-ভাবেই জীবনের কোন সুসময়ে কিছু ভাল কাজ করে ফেলতে ইচ্ছা হয়। টুকুন সুবলকে ভীষণ ভালবাসে। টুকুনের জন্য পৃথিবীর সব দামী অথবা মহার্ঘ যুবকেরা অপেক্ষা করছে। অথচ টুকুন সেই শৈশব থেকে এক পাখিয়ালার প্রেমে পাগল। মানুষের স্বভাবে কি যে থাকে! বাড়ির সবাই যখন ভেবেছে সাময়িক খেয়াল, তখন বাবা বুঝতে পারেন, টুকুন এমন একজন সৎমানুষকেই সারাজীবন ধরে চেয়েছে। সে এর চেয়ে বেশি কিছু চাইতে পারে না। তিনি তো দেখছেন যে-সব যুবকেরা টুকুনের পাশে ঘোরাফেরা করে, এই যেমন ইন্দ্র সে টুকুনকে না পেলে রূমপাকে বিয়ে করবে। ওতে ওর আসে যায় না। কিন্তু এই ফুলের উপত্যকাতে এসে বুঝতে পেরেছেন, সুবল পৃথিবীর চারপাশে নিরন্তর খুঁজে যাবে একটি বাওবাব গাছ। না পেলে সে একা একা হেঁটে যাবে। কারণ ওর চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, গল্পের গাছটা ওর খুব দরকার। গল্পের গাছটা এই উপত্যকাতে না লাগাতে পারলে ওর ভারি দুঃখ থেকে যাবে। সারাদিন পরিশ্রমের পর মানুষের এমন একটি গাছের ছায়া দরকার। আজীবন তিনিও তা চেয়েছেন। সঠিক গাছের ছায়া পেলে হয়তো তিনি এমন অন্যায়কারী হয়ে যেতেন না।

এবং এ-ভাবেই টুকুন এখন প্রায় সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, সুবলের পাশে হাঁটতে পারলে পৃথিবীতে সে আর কিছু চায় না এবং ভেবে ফেলেছে, সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গ্রহাণুর মতো এটা সুবলের গ্রহাণু এখানে মানুষের কোন কষ্ট নেই, এখানে মানুষেরা খেটে খায়, পরিশ্রমের

বিনিময়ে বাঁচে। সুবলকে খুব বড় মনে হয় তখন। আর রাগ হলে ভাবে ভীষণ অহঙ্কারী।

বাবা বললেন বুঝলে হে সুবল, দেখেশুনে মনে হল, খুবই দরকার বাওবাব গাছের।

সুবল বোকার মতো যেই বললে খুবই দরকার। তখন টুকুন ফিস ফিস করে বলল, এই কি যা-তা বলছ।

তিনি গাড়ীর কাছে গিয়ে বললেন, বাড়ীতে আছে। বড হচ্ছে। যখন সময় হবে নিয়ে আসবে। বুঝতে পারছি, গাছটা না হলে তোমার এমন সুন্দর ফুলের উপত্যকা সত্যি শ্রী-হীন হয়ে থাকবে। মনে হয় তোমার এই উপত্যকাতে বাওবাব গাছ লাগিয়ে দিতে পারলেই আমার ঘুম আসবে। আমি ভাল হয়ে যাব।

———